# স্মৃতিকথা : বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল

# স্মৃতিকথা : বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল

শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান



স্মৃতিকথা ॥ বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল ॥ শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
প্রকাশকাল ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মুদ্রণ সংখ্যা ॥ ৩০০
প্রকাশক ॥ আলোকায়ন, ৩৫ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৭১১২৪০৪৪৭
পরিবেশক ॥ কাজী ল’ চেম্বার, ব্যারিস্টার বাড়ি, জামালপুর, ফোন : ০১৯২৮৪৭৮৩০২
মুদ্রণ ॥ হেরা প্রিন্টার্স
প্রচ্ছদ ॥ মাসরুর ফেরদৌস
মূল্য ॥ ৪০০.০০ (চারশত) টাকা

Smritikatha : Burdwan Housa Kazi Nazrul. Shah Mohammad Moniruzzaman, Published by Aalokayan, 35 Bangla Bazar (1st Floor), Dhaka 1100. First Published : February 2025, Price: Tk. 400.00, US. $ 12

ISBN 000-0000-00-0000-0

উৎসর্গ

ঢাকা কলেজের ছাত্র-অন্তঃপ্রাণ প্রিন্সিপাল প্রফেসর এ কে এম ইলিয়াস
এবং
মেডিসিনের দিকপাল চিকিৎসক প্রফেসর ডা. মো. জাকির হোসেনকে
শ্রদ্ধাস্পদেষু

# ভূমিকা

বঙ্গভঙ্গের সময়ে নির্মিত 'বর্ধমান হাউস' যা আজকের বাংলা একাডেমি। বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুলের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় রয়েছে। বর্ধমান হাউস তথা বাংলা একাডেমির সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম জড়িয়ে আছেন গভীর একাত্মতায়। বর্ধমান হাউসের সঙ্গে কবির মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কাজী নজরুলের চিঠিপত্রে ও ব্যক্তিগত আলাপনে এবং লেখায় কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরোক্ষভাবে বর্ধমান হাউসের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।

কাজী নজরুল তাঁর কবিতা ও গানের মধ্য দিয়ে অবিভক্ত বাংলায় গণজাগরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯২৬, ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে তাঁর মতো জনপ্রিয় কবি আর কেউ ছিলেন না। তিনি তখন সারা বাংলায় জনপ্রিয় কবি-তারকা। তিনি প্রকৃত অর্থেই বাংলা ভাষাভাষী কবি, বাংলাদেশের কবি।

ব্রিটিশ আমলে যে কজন বরেণ্য ব্যক্তি বর্ধমান হাউসে অতিথি হয়ে থেকেছেন কাজী নজরুল তাদের মধ্যে অন্যতম। কবি নজরুল বর্ধমান হাউসের প্রাঙ্গণ, বট-বহেরাগাছ তলা ও পুকুর পাড়ে বসে গান গাইতেন, বাঁশি বাজাতেন। ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত কাজী নজরুল তাঁর তারুণ্যের উদ্দাম দিনগুলোতে বর্ধমান হাউসে কয়েকবার এসেছিলেন। বর্ধমান হাউসে থাকার সুবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা পার্ক ও পুরান ঢাকাকে ঘিরে কবির অনেক স্মৃতি রয়েছে যা তাঁর কবিতা, গানে ফুটে উঠেছে। 'চক্রবাক' (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থ ও 'শিউলিমালা' (১৯৩১) গল্পগ্রন্থে কবি যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা বর্ধমান হাউসে অবস্থানকালেরই প্রতিচ্ছবি।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের সম্মেলনে এসে কাজী নজরুল ঢাকার প্রগতিশীল ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিতি হয়ে উঠেন। আবুল ফজল, আবদুল কাদির, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, কাজী মোতাহার হোসেন, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, ফজিলাতুন্নেসা প্রমুখ সাহিত্য কর্মীদের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। কাজী নজরুলের আদর্শের সঙ্গে মুসলিম সাহিত্য সমাজের আদর্শের মিল ছিল।

বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুলের স্মৃতির এই অনালোচিত বিষয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু লেখা প্রকাশিত হলেও স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি। সেই ভাবনা থেকে এই বইয়ের সূত্রপাত। এ গ্রন্থের প্রাথমিক লেখা *বাংলা একাডেমি বার্তা* সংখ্যা



০৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুলের স্মৃতি সংক্রান্ত কবির সমসাময়িক কালে সুহৃদ, বন্ধুদের লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়েছে। যাঁদের লেখার অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়েছে তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

কাজী নজরুলের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউস থেকে বাংলা একাডেমি এক বিরাট ইতিহাস। এই ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের স্বাধিকার আন্দোলনের চেতনা, একুশের রক্তস্নাত দ্রোহ, একুশের সাফল্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়গাথা। কালের পরিক্রমায় বর্ধমান হাউসকে কেন্দ্র করে বাংলা একাডেমি, অমর একুশে বইমেলা ও একুশের অনুষ্ঠানমালা, নজরুল মঞ্চ, রবীন্দ্র চত্বর প্রভৃতি। বর্ধমান হাউসের প্রাঙ্গণে একটি পুকুর আছে এবং এই পুকুরের সাথে কাজী নজরুলের স্মৃতি জড়িত। এই পুকুরটির পানিতে কবির ঘ্রাণ রয়েছে। এ পুকুরে কাজী নজরুল সাঁতার কাটতেন, গোসল করতেন, মাঝে মাঝে পুকুর পাড়ে বসে বাঁশিও বাজাতেন। সঙ্গত কারণে বাংলাদেশের ইতিহাস বাস্তবতার পটভূমিতে বর্ধমান হাউস ও কাজী নজরুল প্রত্যয় দুটি অবিচ্ছেদ্য। বর্ধমান হাউস কাজী নজরুল চর্চার একটি অংশ।

এ গ্রন্থের বানান সমন্বয় করেছেন বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা আবু মোঃ ইকবাল ও অঙ্গসজ্জা করেছেন আশরাফুজ্জামান এবং কম্পোজ করেছেন মো. সফিকুল ইসলাম ও মো. শরীফ হোসেন। তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার স্ত্রী শারমিন মাশা তাঁকেও বিশেষ ধন্যবাদ জানাই, তাঁর সার্বক্ষণিক তাগাদায় আমার পক্ষে এ বইটি প্রণয়ন করা সম্ভব হলো। 'স্মৃতিকথা : বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল' নিয়ে এ ধরনের গ্রন্থ সম্ভবত এই প্রথম। আকারে ক্ষুদ্র হলেও এ গ্রন্থটি পাঠ করে যদি কোনো পাঠক বিন্দুমাত্র উপকৃত হন তবে আমার এ শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
খাশিমারা, মেলান্দহ
জামালপুর
পৌষ ১৭, ১৪৩১
ফেব্রুয়ারি ১, ২০২৫

## সূ চি প ত্র

বাংলা একাডেমির ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউসে ‘নজরুল স্মৃতিকক্ষ’ ১১
বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি : একটি সাধারণ আলোচনা ১৫
বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল ইসলামের আগমন ২৮
প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুলের অবস্থানের বর্ণনা ৩২
কাজী মোতাহার হোসেন ৩২
প্রতিভা বসু ৪১
যোবায়দা মির্যা ৬০
বুদ্ধদেব বসু ৬৮
কাজী নজরুলের চিঠিপত্রে বর্ধমান হাউসের প্রসঙ্গ ৭১
মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলন সম্পর্কে সমকালীন পত্রপত্রিকার সংবাদ ১০৮
কাজী নজরুলের ‘চল্ চল্ চল্’ গান প্রসঙ্গে ১১৪
বাংলা একাডেমি ও কাজী নজরুল ১১৬
বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুলের বই : একটি সাধারণ মূল্যায়ন ১২০
ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও কাজী নজরুল : একটি বন্ধুত্বের নেপথ্যে ১২৬
পরিশিষ্ট ১ : কাজী নজরুল ইসলাম : নতুনের গান ১৩১
পরিশিষ্ট ২ : ফজিলাতুন্নেসা এম.এ. : নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ ১৩৩
পরিশিষ্ট ৩ : কাজী নজরুল ইসলাম : খোশ আমদেদ ১৩৮
পরিশিষ্ট ৪ : শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র : সাহিত্যে শুচিতা ১৩৯
পরিশিষ্ট ৫ : ফজিলাতুন্নেসাকে লিখিত পত্র ও সমকালে কাজী নজরুলের আলোকচিত্র ১৪৭

# বাংলা একাডেমির ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউসে 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ'

যে জাতি অতীত স্মৃতি স্মরণ করে না, সে জাতি ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে না। কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতির ধারক-বাহক বাংলা একাডেমি। বাংলা একাডেমির সঙ্গে জাতীয় কবি নজরুল জড়িয়ে আছেন নিবিড় একাত্মতায়। নজরুলের স্মৃতিবিজড়িত একাডেমির ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউস। নজরুলের স্মৃতিবাহী বর্ধমান হাউসে 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা একাডেমি কবি নজরুলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। এছাড়া একাডেমি কর্তৃক ১২ খণ্ডে সমাপ্য 'নজরুল রচনাবলী' এবং তাঁর উপর প্রণীত প্রায় শতাধিক নজরুল-বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ, নজরুল জন্মজয়ন্তী, মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও নজরুল মঞ্চ স্থাপনের মাধ্যমে বাংলা একাডেমি কাজী নজরুলকে চিরস্মরণীয় করে রাখার প্রয়াস পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের প্রায় সর্বক্ষেত্রে কাজী নজরুলের দৃপ্ত পদচারণা। নজরুলকে ছাড়া বাংলা সাহিত্য-সংগীতকে কল্পনা করা যায় না। কাজী নজরুলের লেখায় বাঙালি জাতিসত্তার বিভিন্ন উপাদান মূর্ত হয়ে উঠেছে। নজরুলের কথা বলতে গেলে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার কথা বলতে হয়। যে স্বাধীনতা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহিদ, দু লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোতে কাজী নজরুলের কবিতা ও গান জাতিকে বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। তাই বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন, কাজী নজরুল ইসলাম এবং বাংলা একাডেমি এই প্রত্যয়গুলো একই ইতিহাসের ওতপ্রোত অংশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নজরুলের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করে যথার্থই বলেছিলেন, "নজরুল বাংলার বিদ্রোহী আত্মা ও বাঙালি স্বাধীন ঐতিহাসিক সত্তার রূপকার।" (মুহম্মদ নূরুল হুদা : ১)

একটি মহৎ ঐতিহাসিক স্মৃতিবাহী ঘটনা হঠাৎ কখনো জাতির জীবনে যুগান্তকারী সম্ভাবনা নিয়ে আসে। বাঙালি জাতির ইতিহাসে বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসে নজরুলের আগমন বাঙালি জাতির জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কাজী নজরুল ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে (১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মাঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল[১] মিলনায়তনে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র[২] দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনের আমন্ত্রণ পেয়ে ঢাকায় আসেন। উল্লেখ্য, সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনও উদ্বোধন করেছিলেন নজরুল।



সাহিত্য সমাজ নজরুলকে বিপুল সম্মান জানিয়েছিল, নজরুলও তাঁদের গভীর শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় বরণ করে নিয়েছিলেন। নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) ছিলেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন এবং সাহিত্য সমাজের মুখপত্র *শিখা* পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের সম্পাদক। দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধনের জন্য নজরুল নতুনের গান (চল্ চল্ চল্) শীর্ষক গানটি রচনা করেছিলেন। এই গানটি গেয়ে নজরুল এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। গানটিতে নজরুল মুক্তির জয়গান গেয়েছেন। এ গানটি সমকালীন *শিখা* পত্রিকা ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তৎকালীন ছাত্র বুদ্ধদেব বসু এবং অজিত দত্ত সম্পাদিত *প্রগতি* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সাহিত্য সমাজের সম্মেলনে এসে নজরুল প্রথমে উঠেছিলেন আবুল হুসেনের (১৮৯৬-১৯৩৮) বাসায়। সম্মেলন শেষে নজরুলকে কাজী মোতাহার হোসেনের আতিথ্যে বর্ধমান হাউসের দোতলার একটি কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

উল্লেখ্য, এ সময় কাজী মোতাহার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউস টিউটর ছিলেন। বর্ধমান হাউস তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের একটি ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সে হিসেবে কাজী মোতাহার হোসেন বর্ধমান হাউসের দোতলায় সপরিবারে বসবাস করতেন। এ সফরে বর্ধমান হাউসে নজরুল অনেক দিন ছিলেন। নজরুল বর্ধমান হাউসের চত্বরে ও পুকুর পাড়ে বসে গান গাইতেন, বাঁশিও বাজাতেন। বর্ধমান হাউসে নজরুল রেখে গেছেন অনেক স্মৃতি ও সৃষ্টির স্বাক্ষর। এসব তথ্যাদি নজরুলের রচিত বিভিন্ন লেখা, চিঠিপত্র এবং সমসাময়িক কালে তাঁর বন্ধু, প্রিয়জন ও ভক্তদের স্মৃতিকথায় রয়েছে। নজরুল ১৯২৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা ত্যাগ করেন। এ প্রসঙ্গে নজরুল গবেষক রফিকুল ইসলাম লিখেছেন :

> ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন তখন সাহিত্য সমাজের সম্পাদক। ... ঢাকায় এবারের সফরে নজরুল 'এ বাসি বাসরে আসিলে গো ছলিতে', 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরাণ প্রিয়া', 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী' প্রভৃতি গজল গান রচনা করেন যার প্রথম দুটি 'প্রগতি'তে ছাপা হয়েছিল। ঢাকায় এবারের সফরে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল অনেক বিদগ্ধজনের সঙ্গে যাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, তাঁর গুণবতী কন্যা উমা মৈত্র (নোটন), অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, কৃতি ছাত্র ও সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু এবং রানু সোম (প্রতিভা বসু), গণিত বিভাগের এম. এ. ক্লাসের ছাত্রী প্রমুখ। (রফিকুল, ২০১৮: ৮৫)

এ সফরে ঢাকায় নজরুলের সঙ্গে বহু বিদ্বৎজনের ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্ক হয়। রানু সোম (প্রতিভা বসু), ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র[৩]-এর কন্যা উমা মৈত্র (নোটন), ফজিলাতুন্নেসা এবং তাঁর ছোট বোন শফিকুন্নেসা প্রমুখের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। রানু সোম (প্রতিভা বসু) ও উমা মৈত্র (নোটন)'র সঙ্গে নজরুলের সংগীতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। নজরুল তাঁদের

গান শেখাতেন। একদিন রানু সোমকে গান শিখিয়ে নজরুল বনগ্রাম থেকে রাত্রির অন্ধকারে বর্ধমান হাউসে ফেরার পথে কতিপয় গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে এসে নজরুলের সাহিত্যকর্মে ব্যাপক ছাপ পড়েছিল। বিশেষ করে তাঁর 'শিউলিমালা' গল্পে ও 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে। 'বুদ্ধদেব বসু নজরুলের এ সফরের মনোরম বর্ণনা করেছেন 'কালের পুতুল' (১৯৫৮) গ্রন্থে।' (রফিকুল, ২০১৮ : ৩৬৩)

বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুলের এই ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ১৯৭৮ সালের ২৯শে আগস্ট নজরুলের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসে নজরুলের স্মৃতির স্মরণে বর্ধমান হাউসের দোতলার একটি কক্ষ 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' নামকরণ করা হয়। স্মৃতিকক্ষটি উদ্বোধন করেছিলেন জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন। তিনি দর্শকদের মন্তব্য খাতায় লিখেছিলেন :

> আজ ২৯/৮/৭৮ তারিখে নজরুল স্মৃতিকক্ষ উদ্বোধন করা হলো। এটা আমার পক্ষে অতিশয় সুখের দিন; অবশ্য সে আমার নিজের গুণে নয়, নজরুল যে আমার সমসাময়িক কালের বন্ধু ছিলেন।

এ সম্পর্কে আলোকচিত্র শিল্পী নাসির আলী মামুন 'নজরুল ও তাঁর বন্ধু' শিরোনামে একটি নিবন্ধে লিখেছেন :

> ১৯৭৮ সালের ২৯শে আগস্ট নজরুলের মৃত্যুবার্ষিকীকে উপলক্ষ্য করে বাংলা একাডেমি ব্যতিক্রমী এবং ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ওই দিন ছিল বর্ধমান হাউসের দোতলায় পশ্চিম দিকে 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি করা হয় জাতীয় অধ্যাপক ড. মোতাহার হোসেনকে।

পরবর্তীকালে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ২০০১ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক থাকাকালীন বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল যেখানে আড্ডা দিতেন সেখানে একটি কক্ষ নজরুল স্মৃতিসংগ্রহ নিয়ে 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' চালু করেন। কিন্তু কিছুকাল চালু থাকার পরে কয়েক বছর স্মৃতিকক্ষটি বন্ধ থাকায় এর গুরুত্ব ও কার্যক্রম হারাতে বসেছিল। বাংলা একাডেমির তদানীন্তন মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজীর ঐকান্তিক আগ্রহে ও এই গ্রন্থকার এ কাজে যুক্ত থেকে জাতীয় কবি নজরুলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানার্থে 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' পুনরায় সংস্কারপূর্বক দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শন-উপযোগী করে চালু করেন। এ লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নজরুলের স্মৃতিসংগ্রহের কাজ অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিন অফিস সময়ে নজরুল স্মৃতিকক্ষে সংরক্ষিত নজরুল স্মৃতিসংগ্রহ, নজরুল রচনাবলী এবং তাঁর উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও অন্যান্য স্মারক গবেষক-দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শন করা হচ্ছে।

কাজী নজরুল চিরকালের আমাদের প্রেরণার উৎস। এই অনুপ্রেরণা তাঁর কালে যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল, আজও সমানভাবে আছে এবং ভবিষ্যতেও প্রাসঙ্গিকতা



থাকবে। বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুলের আগমন একাডেমির ইতিহাসে অনন্য ঘটনা। কাজী নজরুল বর্ধমান হাউসে কিছুদিন ছিলেন–এ কারণে বাংলা একাডেমি ধন্য হয়েছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এজন্য কাজী নজরুল স্মৃতি নিয়ে বাংলা একাডেমি চিরকাল অহংকারবোধ করবে। আজ মুক্তচিন্তা থমকে যাচ্ছে। এজন্য কাজী নজরুলের জীবন ও সৃষ্টিকর্মকে জানা এবং চর্চা করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে নজরুল স্মৃতিকক্ষ সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

## তথ্যনির্দেশ

১. *যুগ-কবি নজরুল গ্রন্থে* আবদুল কাদির মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রথম বার্ষিক ও দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে কাজী নজরুলের সফর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তরুণ কবি আবদুল কাদির সেই সময় সাহিত্য সমাজের একজন কর্মী ছিলেন। ১৯২১ সালের ১লা জুলাই স্থাপিত মুসলিম হল ১৯২৯ সালের ২২শে আগস্ট নবাব বাহাদুর স্যার সলিমুল্লাহ নামানুসারে রাখা হয়। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র কর্মকাণ্ডে সূতিকাগার ছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হল।

২. 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে বড় একটি কক্ষে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রগতিশীল শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্য সমাজের মটো ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' তাঁদের সাহিত্য আন্দোলন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন নামে পরিচিত। 'শিখা' নামক সাময়িকী পত্র ছিল সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র।

৩. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সংকলিত ও সম্পাদিত *শিখা সমগ্র গ্রন্থে* এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য রয়েছে।

৪. আবুল হুসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক এবং তৎকালীন মুসলিম হলের হাউজ টিউটর ছিলেন। তিনি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য এবং সাহিত্য সমাজের প্রথম কার্যনির্বাহী সংসদের পরিচালনা ও '*শিখা*'র সম্পাদক ছিলেন।

৫. কাজী নজরুল তাঁকে 'চোখের চাতক' গ্রন্থ উৎসর্গ করেন।

৬. কাজী নজরুল তাঁকে 'চক্রবাক' গ্রন্থ উৎসর্গ করেন।

৭. বর্ধমান হাউসে অবস্থানকালে কাজী নজরুলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ফজিলাতুন্নেসার সাথে পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা। মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে ফজিলাতুন্নেসা 'নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। ১৯২৮ সালে বর্মণ হাউস থেকে প্রকাশিত 'সঞ্চিতা' কাজী নজরুল তাঁকে উৎসর্গ করেন।

## রচনাপঞ্জি


আবদুল কাদির (১৯৮৬), যুগ-কবি নজরুল, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম [সম্পা.] (২০০৩), শিখা সমগ্র, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রফিকুল ইসলাম (২০১৯), নজরুলের বাংলাদেশ-আগমনের শতবর্ষ, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

রফিকুল ইসলাম (২০১৮), নজরুল-পর্যালোচনা, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

রফিকুল ইসলাম (২০১৮), নজরুল জীবনী, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

মুহম্মদ নূরুল হুদা [সম্পা.] (২০০০), নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

# বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি
# একটি সাধারণ আলোচনা

বাংলা একাডেমির সঙ্গে কবি নজরুল জড়িয়ে আছেন গভীর একাত্মতায়। কাজী নজরুল বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসে বরেণ্য আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে একাধিকবার এসেছিলেন। তারুণ্যদীপ্ত কাজী নজরুলের খ্যাতি তখন সারা ভারতবর্ষে। কবি নজরুলের বর্ধমান হাউসে আগমন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ও তৎপর্যময় ঘটনা। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসেও কাজী নজরুলের ভূমিকা অবিভাজ্য ও অনিবার্য। কাজী নজরুলের লেখায় বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জাতিসত্তার বিভিন্ন উপাদান মূর্ত হয়ে উঠেছে। কাজী নজরুলের কথা বলতে গেলে এদেশের স্বাধীনতার কথা বলতে হয়। যে স্বাধীনতা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহিদ, দু লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমযোদ্ধাদের বিনিময়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে কাজী নজরুলের কবিতা ও গান যুদ্ধাস্ত্রের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। কবি নজরুলের লেখা 'পূর্ণ অভিনন্দন' কবিতাটির থেকে আহরিত 'জয় বাংলা' প্রত্যয়টি ছিল আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অবিনাশী স্লোগান। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোতে কাজী নজরুলের কবিতা ও গান জাতিকে বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। কাজী নজরুলের লেখা 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি', 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর', 'নম নম বাংলাদেশ মম', 'চল্ চল্ চল্' প্রভৃতি গান ও 'পূর্ববঙ্গ'সহ অনেক কবিতা এদেশের মুক্তি সংগ্রামসহ যেকোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে আমাদেরকে নবজাগরণের প্রেরণা দিচ্ছে। এদেশের প্রতিটি আন্দোলনে-সংগ্রামে কাজী নজরুল ইসলামের গান ও কবিতা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এ কারণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠন ও কাজী নজরুল ইসলাম এই প্রত্যয়গুলো একই ইতিহাসের ওতপ্রোত অংশ। এজন্যই বারবার উচ্চারিত হয় যে, কাজী নজরুল বাংলার বিদ্রোহী আত্মা ও বাঙালি স্বাধীন ঐতিহাসিক সত্তার রূপকার।

বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুলের অবস্থানের এই ঐতিহাসিক ঘটনা শুধু কবি নজরুলের জীবনেই নয়, তাঁর পরবর্তীকালের সাহিত্যকর্মে বিশেষ করে তাঁর কবিতা, গল্প ও চিঠিপত্রে যেমন ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল; তেমনি প্রভাব পড়েছিল বাংলাদেশের শিল্পসাহিত্য ও সমকালীন সমাজ-চেতনায়। কবি নজরুল ঢাকার



'শিখা'গোষ্ঠীর আমন্ত্রণে বর্ধমান হাউসে এসেছিলেন। সেই সময় তিনি স্থবির মুসলমান সমাজে প্রজ্বলিত মশাল হাতে দিয়ে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন যা এখনো সারা দেশময় জ্বলছে। সঙ্গত কারণে বাংলাদেশের ইতিহাস বাস্তবতার পটভূমিতে বর্ধমান হাউস ও কবি কাজী নজরুল অবিচ্ছেদ্য প্রত্যয়। এই প্রত্যয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক জাগরণ ও স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীকালে আমরা আরও দেখতে পাই বর্ধমান হাউসকে কেন্দ্র করেই মহান একুশের রক্তস্নাত দ্রোহ এবং পরবর্তীকালে বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি–এই প্রত্যয়গুলো যেন অভিন্নসূত্রে গ্রথিত। বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের সঙ্গে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ একাডেমির বর্ধমান হাউসে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নজরুল স্মৃতিকক্ষ এবং একাডেমি চত্বরে নজরুল মঞ্চ ও অন্যান্য স্মারক। আলোচ্য প্রবন্ধে বিষয়টির ওপর বিস্তৃতভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুলের স্মৃতি ও অন্যান্য স্মারকের তথ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপন করে এই লেখাটি সম্পন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছি।

বাংলা একাডেমি কাজী নজরুলের অনন্য স্মৃতির ধারক ও বাহক। উল্লেখ্য, কাজী নজরুলের স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ একাডেমির বর্ধমান হাউসে ১৯৭৮ সালের ২৯শে আগস্ট 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' এবং ২০০৩ সালের ২৫শে জুন একাডেমির প্রাঙ্গণে 'নজরুল চত্বর' ও 'নজরুল মঞ্চ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৭৬ সাল থেকে আজ অবধি একাডেমির সম্মুখস্থ সড়কের নাম কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ এবং বাংলা একাডেমির প্রধান ও একমাত্র কার্যালয় এই সড়কেই অবস্থিত। বাংলা একাডেম কাজী নজরুলের জন্মদিন ও মৃত্যুবার্ষিকী অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে আসছে। বাংলা একাডেমিতে কাজী নজরুল জয়ন্তী জাতীয়ভাবে পালন করা হয়। বাংলা একাডেমি ১৯৬১ সালের ২৫শে মে সপ্তাহব্যাপী কাজী নজরুল-জয়ন্তী উৎসব আয়োজন করেছিল। এই আয়োজনে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিদ্রোহী কবির প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ, সম্পাদিত পত্রিকা, এগুলোর প্রথম সংস্করণ, নিজের লেখা পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, কবির বিভিন্ন বয়সের আলোকচিত্র, কবি ও তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রদর্শন করা হয়েছিল। সেই থেকে শুরু করে একাডেমিতে প্রতি বছর কাজী নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হয়ে আসছে। কাজী নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কোনো বিশেষজ্ঞ বা পণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা কাজী নজরুল বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ করা হয়। এছাড়া কয়েক বছর ধরে বাংলা একাডেমি 'নজরুল পুরস্কার' প্রদান করে আসছে।

বাংলা একাডেমি কাজী নজরুল-বিষয়ক গ্রন্থের প্রকাশের অন্যতম কৃতিত্বের দাবিদার। বর্তমানে একাডেমি থেকে দ্বাদশ খণ্ডের 'নজরুল-রচনাবলী' নজরুল

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ছাড়াও নজরুল-সংগীত সংকলন গ্রন্থ, নজরুল-বিষয়ক অনেক গবেষণা-গ্রন্থ, সাহিত্য-সমালোচনামূলক গ্রন্থ, নজরুল-কাব্যের অনুবাদ-গ্রন্থ এমনকি নজরুল-সংগীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় দেড় শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। মূলত একাডেমি থেকেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নজরুল-চর্চার ব্যাপকতররূপে শুরু হয়। এক্ষেত্রে কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) পথিকৃৎ ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (সেন্ট্রাল বোর্ড ফর ডেভেলপমেন্ট অব বেঙ্গলি)-এর উদ্যোগে এবং প্রখ্যাত নজরুল গবেষক আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'নজরুল-রচনাবলী' প্রকাশনার ব্যবস্থা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যুগোপযোগী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ ছিল। পাকিস্তান আমলে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র ৩টি খণ্ড (১ম খণ্ড, ১৯৬৬; ২য় খণ্ড, ১৯৬৭, ৩য় খণ্ড, ১৯৭০) প্রকাশিত হয়।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমির সঙ্গে 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয়। আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে ৩টি খণ্ড এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমি থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই নজরুল-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড (১৯৭৭), ৫ম খণ্ড প্রথমার্ধ (জুন ১৯৮৪), দ্বিতীয়ার্ধ (ডিসেম্বর ১৯৮৪) মোট এই ৫টি খণ্ড তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই ৫টি খণ্ড প্রকাশিত না হলে নজরুল-চর্চা ও গবেষণার ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতো। মোট কথা এ পাঁচ খণ্ড প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রাথমিকভাবে সমগ্র কাজী নজরুল-রচনা সংকলন সম্পূর্ণ হয়। অতঃপর দীর্ঘ বছর কাজী নজরুলের রচনাবলি মুদ্রিত না হওয়ায় বাংলা একাডেমি পূর্ণাঙ্গভাবে 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে দশ বছর পরে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমি 'নজরুল-রচনাবলী'র নতুন সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে নয়জনের একটি সম্পাদনা-পরিষদকে অর্পণ করেন। ১৯৯৩ সালে তাঁদের সম্পাদনায় 'নজরুল-রচনাবলী'র সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ৪টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই ৪টি খণ্ড একাধিকবার পুনর্মুদ্রণ হয়।

পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমি ২০০৫ সালের অক্টোবরে নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ করে। এই উপলক্ষ্যে নজরুল বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ছয় সদস্যের সম্পাদনা পরিষদ গঠিত হয়। এই সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি রফিকুল ইসলামের তত্ত্বাবধান ও দিঙ্‌নির্দেশনায় কাজী নজরুলের রচনাবলির এ সংস্করণ ২০০৬ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে বারোটি খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী' প্রকাশিত হয়। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী' বারোটি খণ্ড যা নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ নামে পরিচিত সেটি এখনো চলছে এবং পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১২টি খণ্ডে সমাপ্য কাজী



নজরুল ইসলাম রচিত 'নজরুল রচনাবলী' ছাড়াও এ পর্যন্ত একাডেমি থেকে প্রায় নজরুল-বিষয়ক দেড় শতাধিক গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রতি কবি নজরুলের গভীর ভালোবাসা ছিল। এজন্য বারবার উচ্চারিত হয় বাংলাদেশ ও কবি নজরুল এ প্রত্যয়দুটি পরস্পরের পরিপূরক ও অবিচ্ছেদ্য। কবি নজরুলের সৃষ্টিকর্মে বাংলাদেশ অপরিসীম ভূমিকা রেখেছে। তিনি বাংলার নানা স্থানে কখনো ভক্তদের কাছে, কখনো সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে, কখনো সম্মেলন, কখনো অতিথি, কখনো গায়ক, কখনো বক্তা, কবি, আবৃত্তিকার হিসেবে, আবার কখনো রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে গিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় কবি নজরুল ঢাকায় আসেন এবং বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। কবি নজরুলের ঢাকায় অবস্থানের সময় এদেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ খুবই প্রতিকূল ছিল। সে সময় সারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসহ উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অস্থিতিশীল। অসহযোগ-সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর বেঙ্গল প্যাক্টের ব্যর্থতা ও সাম্পদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি বিষয় কবি নজরুলকে ভাবিয়ে তুলেছিল। কবি নজরুল সব সময় স্বপ্ন দেখতেন স্বাধীন বাংলাদেশের। পরবর্তীকালে তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেয়।

কবি নজরুল কালের প্রয়োজনেই বর্ধমান হাউসে এসেছিলেন। বর্ধমান হাউসের দোতলায় তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেনের আতিথ্যে কিছুদিন থেকেছেন। কবি নজরুল বর্ধমান হাউসের চত্বরে ও পুকুর পাড়ে বসে গান গাইতেন, বাঁশিও বাজাতেন। বর্ধমান হাউসে তিনি রেখে গেছেন অনেক স্মৃতি ও সৃষ্টির স্বাক্ষর। এসব তথ্যাদি কবি নজরুলের রচিত বিভিন্ন রচনা, চিঠিপত্র এবং সমসাময়িককালে তাঁর বন্ধু, প্রিয়জন ও ভক্তদের স্মৃতিকথায় রয়েছে। কালের পরিক্রমায় বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং কাজী নজরুল ইসলাম এখানে অবস্থান করার ফলে দেশ-কাল বাস্তবতার পটভূমিতে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং প্রাসঙ্গিকতা মূল্যবান। বর্ধমান হাউসে কবি নজরুলের অবস্থান সম্পর্কে নজরুল-বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ, নজরুল জীবনী ও স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থে অনেকেই লিখেছেন।

২

এ প্রসঙ্গে বর্ধমান হাউস সম্পর্কে দুটি কথা বলা প্রয়োজন। বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউস ঢাকার ঐতিহাসিক ভবনগুলোর মধ্যে অন্যতম। উপমহাদেশের রাজনীতি, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ নানা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এ ভবনের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা

লাভ করে। ফলে ঢাকা শহরকে রাজধানীর কেন্দ্রীয় অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নির্মাণ করা হয় অনেকগুলো সরকারি বাড়ি ও ভবন–বর্ধমান হাউস তার একটি। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে ঢাকা প্রাদেশিক সরকারের রাজধানীর মর্যাদা হারায়। ফলে ইংরেজ সরকার পূর্ব বাংলার প্রভাবশালী নেতাদের অসন্তুষ্টি দূর করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং গভর্নরের তিন সদস্যের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরের সভা বছরে একবার ঢাকায় করার ব্যবস্থাগ্রহণ করে। ইংরেজ সরকারের ওই তিন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর হলেন বর্ধমানের মহারাজা স্যার বিজয়চাঁদ মাহতাব (১৮৮১-১৯৪১), অনারেবল শামসুল হুদা এবং ইংরেজ সদস্য মি. হুইলার। বর্ধমানের মহারাজা স্যার বিজয়চাঁদ মাহতাব ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য হিসেবে ঢাকায় অবস্থানকালে বাংলা একাডেমির মূল ঐতিহ্যবাহী ভবনে বাস করতেন বলেই ভবনটির নামকরণ করা হয় বর্ধমান হাউস।

বর্ধমান হাউস বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অনন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ ভবনে কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি ছাড়াও দেশ-বিদেশের অসংখ্য বরেণ্যজনের স্মৃতি জড়িত রয়েছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, কাজী মোতাহার হোসেনসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও উপমহাদেশের কয়েকজন রাজনীতিবিদ এ ভবনে বাস করেছেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অনেকে এ ভবনে অতিথি হয়েছেন। নানা সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এ ভবনে অবস্থান করেছে। জ্ঞানতাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, সৈয়দ আলী আহসান, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, কবীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, ড. মযহারুল ইসলামসহ বহু খ্যাতিমান পণ্ডিত এ ভবনে গবেষণা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও দাপ্তরিক কাজ করেছেন।

অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪) এ ভবনে বাস করতেন। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন (১৮৯৩-১৯৭৪) এ ভবনে বাস করতেন। এ ভবনেই ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর ভাষা আন্দোলন (১৯৫২) সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরে এ চুক্তি তিনি ভঙ্গ করেন। ১৯৫৪ সালের পর থেকে এ ভবনে ঢাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো এবং এ সময় আর্ট কাউন্সিলের কার্যালয় খোলা হয়। ১৯৫৪ সালে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ এ ভবনে কয়েক মাস বাস করেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা ও তথ্য বিভাগের কার্যালয়ও এ ভবনে ছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে গুলি চালানোকালে বর্ধমান হাউসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থাকায় এ ভবনের প্রতি জনরোষ পতিত হয় এবং এ ভবনকে



বাংলা ভাষার গবেষণাগারে রূপান্তরিত করার দাবি প্রবল হতে থাকে। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে হক-ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত হয় রাজনৈতিক মোর্চা যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবি সংলিত নির্বাচনি ইশতেহারের ১৬ দফায় অঙ্গীকার করা হয় ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগার করা হবে। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বরে বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমির উদ্বোধনের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন ঘটে এবং ৮ই ডিসেম্বর এ ভবনের একটি অংশে বাংলা একাডেমির কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৮ সালে সমগ্র ভবন বাংলা একাডেমির অধিকারে আসে। ১৯৬২ সালে বর্ধমান হাউসের ত্রিতল নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর কামান নিক্ষেপ করলে এ ভবনের সংস্কৃতি বিভাগ ও ফোকলোর সংগ্রহশালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একাডেমির বর্ধমান হাউসে স্থাপিত মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য '৭১' সেই স্মৃতি বহন করছে।

৩

ব্রিটিশ আমলে পূর্ব বাংলা বর্তমানে বাংলাদেশ ছিল উপেক্ষিত, অবহেলিত, শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর, অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত-শোষিত এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ। কবি নজরুল প্রথম ১৯১৪ সালে সপ্তম শ্রেণির ছাত্ররূপে আগমনের পর হতে বহুবার এদেশে এসে তাঁর অনলবর্ষী ভাষণ, জাগরণমূলক কবিতা ও গানের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে জাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি পশ্চাদপদ পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এনেছিলেন এক ভিন্নতর জাগরণ, প্রেরণা, সম্প্রীতি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। কাজী নজরুল বাংলাদেশের খুব প্রিয় মানুষ। এরই ধারাবাহিকতায় একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি ১৯২৬ সালের জুন মাসের শেষে ঢাকায় আসেন। এ সময় তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী হেমন্তকুমার সরকার এমএ, এমএলসি তাঁর সঙ্গী ছিলেন। কবি নজরুল ঢাকায় স্বরাজ্য দলের মনোনীত বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ডা. শ্রী মোহিনী মোহন দাশের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাসা ছিল ঢাকা কোর্ট সংলগ্ন। (আবদুল কাদির : ৯৪)

কবি নজরুলের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবনের এটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ সময় তিনি তদানীন্তন ঢাকা বিভাগ থেকে (ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ময়মনসিংহ) পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। সমকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ পরিষদে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে দুইটি আসন ছিল। সম্পত্তি হিসাবের ভিত্তিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল আঠারো হাজারের কিছু ওপরে। নির্বাচনে বরিশালের মুহম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, টাঙ্গাইলের জমিদার

আবদুল হালিম গজনবী, ঢাকা নবাব বাড়ির আবদুল করিম এবং কাজী নজরুল ইসলাম ও মফিজউদ্দিন আহমদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু সীমিত সংখ্যক ভোটারের ভোটের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে তিনি পূর্ববঙ্গের জাঁদরেল মুসলমান জমিদারদের সঙ্গে পেরে উঠেননি। মুহম্মদ ইসমাইল চৌধুরী ও আবদুল হালিম গজনবী নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তবে এই নির্বাচন উপলক্ষ্যে কবি নজরুলকে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক সফর করতে হয়েছিল–বিশেষত তদানীন্তন ঢাকা বিভাগে।

কাজী নজরুল নির্বাচন প্রচার কাজের সময় কয়েকবার ঢাকায় আসেন। এ সময় এদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ভালো ছিল না। সারা দেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস কর্মীসংঘের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের তৎপরতায় দেশবন্ধু সি আর দাশের হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট বাতিল হয়েছে। নির্বাচন প্রচার কাজ চালাতে গিয়ে কাজী নজরুল বারবার উগ্র ও গোঁড়া মুসলমানদের মুখোমুখি হতে হয়েছে, কাজী নজরুল তাঁর ইসলামি কবিতা ও গান শোনিয়ে তাঁদের শান্ত করার চেষ্টা করেছেন। এজন্য কবি প্রগতিপন্থি তরুণদের এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

১৯২৬ সালে কবি নজরুলের ঢাকায় আসার খবর পেয়ে ঢাকার কয়েকজন উদীয়মান সাহিত্যিক আবদুল কাদির, মোহাম্মদ কাসেম এবং আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন প্রমুখ কবি নজরুলের সঙ্গে দেখা করেন। কবি নজরুল মুসলিম সাহিত্য সমাজের খবর আগেই শুনেছিলেন। তাঁদের নিকট ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের হিন্দু মুসলিম সমন্বয় শীর্ষক যুক্তিবাদী-প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের খবর শুনে আনন্দিত হন এবং তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। (আবদুল কাদির : ৯৫)

এর কিছুদিন পর কাজী নজরুল আবার ঢাকা আসেন। এবার তিনি ৫২ বেচারাম দেউড়ির হযরত সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ ইউসুফ কাদেরি (র.)-এর বাড়ির মসজিদ সংলগ্ন দালানের একটি কক্ষে উঠেন এবং নির্বাচনি প্রচার কাজে জয়দেবপুরসহ অন্যান্য স্থানে যান।

কাজী নজরুলের ঢাকায় নির্বাচনি সফর এই আলোচনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্ধমান হাউসে কবি নজরুলের উঠার সম্ভাবনা তৈরির অন্যতম একটি অনুষঙ্গ। কারণ ঐ সময় তিনি বর্ধমান হাউসে না উঠলেও পরবর্তীকালে উঠার সম্ভাবনার পথ করে দেয়।

কবি নজরুল ১৯২৬ সালের ২৭শে জুন রবিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে সাহিত্য সমাজের[২] আহুত চতুর্থ বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে নজরুল একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন এবং কান্ডারি হুঁশিয়ার, আমরা ছাত্রদল, কিষানের গান প্রভৃতি জাগরণমূলক কয়েকটি কবিতা ও গান গেয়ে সকলকে আনন্দ দেন।



৪

এ প্রসঙ্গে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে কিছু বলা যাক। ১৯২২ সালে মুসলমান লেখকদের সংঘবদ্ধ করে সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির জন্ম হয়। এই সাহিত্য সমিতির প্রেরণা থেকেই বিভিন্ন জেলায় সাহিত্যচর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এরই অনুবৃত্তিক্রমে ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রগতিশীল শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এ প্রতিষ্ঠানটি হয় ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল কক্ষে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রথম কার্যনির্বাহী সংসদের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক আবুল হুসেন, মুসলিম হলের ছাত্র এএফএম আবদুল হক, ঢাকা কলেজের ছাত্র আবদুল কাদির প্রমুখের ওপর। নেপথ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করতেন ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ ও যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদীর।

এই সাহিত্য সমাজের মটো ছিল–"জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" তাঁদের সাহিত্য আন্দোলন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন নামে পরিচিত। শিখা[৩] নামক সাময়িকী পত্র ছিল এ সমাজের বার্ষিক মুখপত্র। এ সাময়িকীটি ছিল স্বল্পায়ু, পাঠক সংখ্যা ছিল সীমিত। এ সাময়িকীতে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর সাথে সমমনা যাঁরা, সাধারণত তাঁরাই ছিলেন পাঠকগোষ্ঠী। তবে বিরোধী মতাদর্শের যাঁরা তাঁরাও কেউ কেউ এ সাময়িকীটি পাঠ করতেন। মোট কথা বিশেষ আদর্শ প্রচারের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে শিখা সাময়িকীর প্রকাশনা। তৎকালীন বাংলার রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। এর প্রভাব দেখে সে সময় বাংলার শিক্ষিত মুসলিম সমাজ বিস্মিত হয়েছিল। সাহিত্য সমাজের আয়ুষ্কাল ছিল দশ বছর। আর শিখা বেরিয়েছিল ৫টি সংখ্যা (১৯২৬-১৯৩১)। 'শিখা' সাময়িকীতে একটি ছবি সন্নিবেশ করা ছিল–এ নিয়ে কেউ কেউ আপত্তি করেছিলেন। পরে তা ব্যাখ্যাসহকারে সাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া হলে আর সমস্যা হয়নি।

এ ব্যাখ্যাটি হলো ছবির বাম দিকে মরুভূমির উপর কয়েকটি খেজুর গাছ, এটা হলো মুসলিম জ্ঞান ও সভ্যতার জন্মভূমি। জ্ঞান ও সভ্যতার আগুন প্রথমে কিছু কিছু ক্ষীণভাবে ছিল, মুসলিম গৌরবের দিনে অতি উজ্জ্বল ও ব্যাপকভাবে জ্বলে উঠেছিল। অবশেষে তা নিভু নিভু অবস্থায় অনেকদিন ধরে অন্ধকারে ধুঁয়া বের হচ্ছিল। অতি আধুনিককালে এই ধুঁয়ার অগ্রভাবে এক অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে, এর দ্বারা ইসলামের নব জাগরণ সূচিত হচ্ছে। ছবির ডান দিকে মসজিদের ছবি দ্বারা পূর্বের জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল বোঝানো হয়েছে, তা এখন অন্ধকারে পূর্ণ। এই

অন্ধকারের মধ্যে একখানা কুরআন শরিফ বন্ধ অবস্থায় রয়েছে যা খুলিবার লোক নাই আর মসজিদের চারদিকে জঞ্জাল-আবর্জনা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ইসলামের নব প্রজ্বলিত 'শিখা'য় আবার অন্ধকার স্থান আলোকিত হবে এবং জঞ্জাল আবর্জনা পুড়ে গিয়ে কুরআন ও মসজিদের সত্যরূপ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাবে।

সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠান করা সহজ ব্যাপার ছিল না। এরকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলনে কবি নজরুলকে আমন্ত্রণ করে ঢাকায় নিয়ে আসা খুব কঠিন ছিল। বর্ধমান হাউসে অবস্থান করে সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে নজরুলের অংগ্রহণ করাও ছিল রীতিমতো দুঃসাহসের ব্যাপার। ঢাকা যেখানে মসজিদের শহর, সর্দার শাসিত বায়ান্ন বাজার তেপান্ন গলির মহল্লানির্ভর শহর ঢাকা, শীর্ষে ঢাকার নবাব পরিবার। সবকিছু মিলিয়ে বলা যায় রক্ষণশীলতার দুর্ভেদ্য দুর্গ হলো তৎকালীন ঢাকা।

৫

১৯২৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি রবিবার মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল মিলনায়তনে। পূর্বাপর ধারাবাহিকতায় এ সম্মেলন উদ্বোধনের জন্য কাজী নজরুল ঢাকার আমন্ত্রণ পেয়ে উচ্ছ্বসিত হন। মুসলিম সাহিত্য-সমাজের আমন্ত্রণ যেন কবির কাছে শীতের পর বসন্তের আগমন বার্তা। তাই কবি সাহিত্য-সমাজের সম্পাদক আবুল হুসেনকে কৃষ্ণনগর থেকে ১০-২-১৯২৭ তারিখে লিখেন :

> প্রিয় আবুল হুসেন সাহেব। আপনার আমন্ত্রণলিপি নব-ফাল্গুনের দখিন হাওয়ার মতই খুশ্খবরী নিয়ে এসেছে।... (শাহাবুদ্দীন আহমদ : ৪৭)

কাজী নজরুল ঢাকায় উঠেছিলেন আবুল হুসেনের[৪] বাসায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগ সংলগ্ন)। সম্মেলন উপলক্ষ্যে কাজী নজরুল তাঁর সদ্য রচিত 'খোশ্ আমদেদ' গানটি গেয়ে বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন নজরুল বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন :

> 'আজ আমি এই মজলিসে আমার আনন্দ বার্ত্তা ঘোষণা করছি। বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়েছে। আজ আমি দেখছি এখানে মুসলমানের নূতন অভিযান শুরু হয়েছে। আমি এই বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করে বেড়াব।'

(মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : ১৭৯)

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে কাজী নজরুলের বক্তৃতাটি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। দুদিনব্যাপী এ সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশিষ্টজনেরা প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাঠ



করেন এবং শিল্পীরা সংগীত পরিবেশ করেন। প্রবন্ধকারদের মধ্যে ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, মোহাম্মদ কাসেম, কাজী আনোয়ারুল কাদির, শামসুল হুদা, আবুল হুসেন প্রমুখ। ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের বিবরণী সমাজের মুখপত্র বার্ষিক 'শিখা'য় ছাপা হয়েছিল।

প্রথম বর্ষের অনুবৃত্তিক্রমে পরের বছর ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে (১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মাঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল মিলনায়তনে মুসলিম সাহিত্য সমাজের সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনও উদ্বোধন করতে ঢাকায় আসেন কাজী নজরুল ইসলাম। এ প্রসঙ্গে কাজী নজরুল গবেষক রফিকুল ইসলাম লিখেছেন :

> ১৯২৮ খিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন তখন সাহিত্য সমাজের সম্পাদক। ... ঢাকায় এবারের সফরে নজরুল 'এ বাসি বাসরে আসিলে গো ছলিতে', 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরাণ প্রিয়া', 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী' প্রভৃতি গজল গান রচনা করেন যার প্রথম দুটি 'প্রগতি'তে ছাপা হয়েছিল। ঢাকায় এবারের সফরে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল অনেক বিদগ্ধজনের সঙ্গে যাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, তাঁর গুণবতী কন্যা উমা মৈত্র (নোটন), অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, কৃতী ছাত্র ও সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু এবং রানু সোম (প্রতিভা বসু), গণিত বিভাগের এম.এ. ক্লাসের ছাত্রী ফজিলাতুন্নেসা প্রমুখ। (রফিকুল ইসলাম : ৮৫)

দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে নর্থ বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র সমিতি ও মুন্সীগঞ্জ ছাত্র সমিতির পক্ষে ডেলিগেট এসেছিলেন। কাজী মোতাহার হোসেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের সম্পাদক ছিলেন। কবি নজরুল নতুনের গান (চল্ চল্ চল্) গানটি গেয়ে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এবারের যাত্রায় কবি নজরুল প্রথমে উঠেছিলেন আবুল হুসেনের বাসায়। পরে অধিবেশন শেষে কবি নজরুলকে কাজী মোতাহার হোসেনের আতিথ্যে বর্ধমান হাউসের দোতলার একটি কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

এ সময় কাজী মোতাহার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউস টিউটর ছিলেন। বর্ধমান হাউস তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের একটি ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সে হিসেবে কাজী মোতাহার হোসেন বর্ধমান হাউসের দোতলায় সপরিবারে বসবাস করতেন। এ সফরে বর্ধমান হাউসে কবি নজরুল অনেক দিন ছিলেন। হোস্ট অফিসারের ন্যায় আবদুল কাদির কবি নজরুলের খোঁজখবর ও দেখাশোনার দায়িত্ব পান। আবদুল কাদির ছিলেন তখন ঢাকা কলেজের আইএ ক্লাসের ছাত্র।

কবি নজরুল আবদুল কাদিরকে খুব স্নেহ করতেন। পরবর্তীকালে কবি নজরুল তাঁর বিবাহের ঘটকালি করেছিলেন এবং মুজফ্ফর আহমদের কন্যা আফিফা খাতুনের সঙ্গে আবদুল কাদিরের বিবাহ (১৯৩৫) সম্পন্ন করে দেন।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে ঢাকায় কাজী নজরুলের সঙ্গে বহু বিদ্বৎজনের ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্ক হয়। রানু সোম (প্রতিভা বসু)[৫], ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র[৬]-এর কন্যা উমা মৈত্র (নোটন), ফজিলাতুন্নেসা[৭] এবং তাঁর ছোট বোন শফিকুন্নেসা প্রমুখের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। রানু সোম (প্রতিভা বসু) ও উমা মৈত্র (নোটন) সঙ্গে নজরুলের সংগীতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। নজরুল তাঁদের গান শেখাতেন। একদিন রানু সোমকে গান শিখিয়ে নজরুল বনগ্রাম থেকে রাত্রির অন্ধকারে বর্ধমান হাউসে ফেরার পথে কতিপয় গুন্ডা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে এসে নজরুলের সাহিত্যকর্মে ব্যাপক ছাপ পড়েছিল। বিশেষ করে তাঁর 'শিউলিমালা' গল্পে ও 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে। 'বুদ্ধদেব বসু নজরুলের এ সফরের মনোরমভাবে বর্ণনা করেছেন 'কালের পুতুল' (১৯৫৮) গ্রন্থে ।' (রফিকুল ইসলাম, ২০১৮: ৩৬৩)

এ দ্বিতীয় বর্ষে পঠিত প্রবন্ধগুলোর প্রথমটি হচ্ছে 'আদেশের নিগ্রহ' শিরোনামে আবুল হুসেনের প্রবন্ধটি ছিল অসাধারণ। প্রবন্ধটির কিছু অংশ এরকম :

> ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস, ইহাই ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। কিন্তু এই বিশ্বাস শুধু মুখে থাকিলে চলবে না।–অন্তরের বিশ্বাসই প্রকৃত জিনিস। ধর্ম্ম প্রচারকগণ যে অনুশাসন দেন, তাহার উদ্দেশ্য মানব জাতির উন্নতি। বস্তুত, মানব জাতির হিতই ধর্মের লক্ষ্য। ধর্ম্মের সহিত মানব প্রকৃতির মূলতঃ কোন বিরোধ থাকিলে সে ধর্ম্মকে লোকে চিরকাল শ্রদ্ধা করিতে পারে না। এ জন্য যুগে যুগে পৃথিবীর নব নব প্রয়োজন বা সমস্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মেরই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মুসলমানেরা ইসলামকে যেভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে, তাহাতে যথেষ্ট অন্ধ-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় মোটেই পাওয়া যায় না।

এছাড়া অপরাপর প্রবন্ধগুলো হলো 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ' শিরোনামে কাজী মোতাহার হোসেন, 'মুক্তির আদর্শ বনাম আদেশের নিগ্রহ' শিরোনামে মৌলভী আবদুর রশীদ, 'পল্লীসঙ্গীতে লীলাবাদ' শিরোনামে তরুণ কবি আবদুল কাদির, 'বাঙ্গালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ' শিরোনামে আবুল হুসেন প্রমুখ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধগুলোর ওপর আলোচনা করেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ। সম্মেলনের প্রবন্ধগুলো নিয়েও সমসাময়িককালে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছিল। (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : ১৬২-৬৬)



এ প্রসঙ্গে মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র বার্ষিক 'শিখা'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রকাশিত লেখার বিষয়গুলো লক্ষ করি। প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখাটি ছিল কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা 'খোশ আমদেদ'। দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম লেখাটি কাজী নজরুলের 'নতুনের গান'। এছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধগুলো যেমন–কাজী আবদুল ওদুদের 'বাংলার জাগরণ', কাজী মোতাহার হোসেনের 'মানব মনের ক্রমবিকাশ', আতাউর রহমানের মোসলেম ভারতে শিক্ষাচর্চা, আনোয়ারুল কাদিরের 'ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ', সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদের 'বাংলার পীর পূজা', আবদুল মঈন চৌধুরীর 'স্থাপত্য-চর্চায় মুসলমান', ফজিলাতুন্নেসার 'নারীজীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ' সমকালীন প্রেক্ষাপটে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র বার্ষিক 'শিখা'র দ্বিতীয় বর্ষ সংখ্যার সম্পাদক।

মুসলিম সমাজ-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে নজরুলের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয় ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, প্রতিভা বসু (রানু), উমা মৈত্র (নোটন), মিস ফজিলাতুন্নেসা প্রমুখের সঙ্গে।

আমাদের দুর্ভাগ্য জাতিগতভাবে আমরা ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন নই। এজন্য নজরুলসহ বহু গুণিজনের সারা বাংলাদেশে স্মৃতিবিজড়িত স্থান সম্পর্কে জানি না এবং সংরক্ষণ করার চেষ্টা করি না। কবি নজরুলের কর্মময় জীবনে নানা ঘটনা-উপঘটনা রয়েছে। ঢাকায় নজরুল স্মৃতির অন্যতম স্থান হলো বর্ধমান হাউস। বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল রেখে গেছেন অনেক স্মৃতি ও সৃষ্টির স্বাক্ষর। সেসব তথ্যাদি কবি নজরুলের রচনা, চিঠিপত্র এবং ভক্তদের স্মৃতিকথাসহ নানা মাধ্যমে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঢাকার সঙ্গে কবি নজরুলের জীবন, সৃষ্টিকর্ম ও মৃত্যুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। কাজী নজরুলের সৃষ্টিকর্মে বাংলাদেশ অপরিসীম ভূমিকা পালন করেছিল। কবি নজরুল সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পসাহিত্য-সংগীতে বহুমাত্রিকতা যুক্ত করেছেন। সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজী নজরুল চর্চা করা আবশ্যক।

## তথ্যনির্দেশ

১. যুগ-কবি নজরুল গ্রন্থে আবদুল কাদির মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রথম বার্ষিক ও দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে নজরুলের সফর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তরুণ কবি আবদুল কাদির সে সময় সাহিত্য সমাজের একজন কর্মী ছিলেন। ১৯২১ সালের ১লা জুলাই স্থাপিত মুসলিম হল ১৯২৯ সালের ২২শে আগস্ট নবাব বাহাদুর স্যার সলিমুল্লাহর নামানুসারে রাখা হয়। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র কর্মকাণ্ডের সূতিকাগার ছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হল।

২. 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল কক্ষে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র সভাপতিত্বে ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

কয়েকজন প্রগতিশীল শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্য সমাজের মটো ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' তাঁদের সাহিত্য আন্দোলন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন নামে পরিচিত। 'শিখা' নামক সাময়িকী পত্র ছিল সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র।

৩. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সংকলিত ও সম্পাদিত 'শিখা সমগ্র' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য রয়েছে।

৪. আবুল হুসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক এবং তৎকালীন মুসলিম হলের হাউজ টিউটর ছিলেন। তিনি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য এবং সাহিত্য সমাজের প্রথম কার্যনির্বাহী সংসদের পরিচালনা ও 'শিখা'র সম্পাদক ছিলেন।

৫. কাজী নজরুল তাঁকে 'চোখের চাতক' গ্রন্থ উৎসর্গ করেন।

৬. কাজী নজরুল তাঁকে 'চক্রবাক' গ্রন্থ উৎসর্গ করেন।

৭. বর্ধমান হাউসে অবস্থানকালে নজরুলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ফজিলাতুন্নেসার সাথে পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা। মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে ফজিলাতুন্নেসা 'নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। ১৯২৮ সালে বর্মণ হাউস থেকে প্রকাশিত 'সঞ্চিতা' নজরুল তাঁকে উৎসর্গ করেন।

## রচনাপঞ্জি

শাহাবুদ্দীন আহমদ (১৯৯৫), নজরুলের পত্রাবলী, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

আবদুল কাদির (১৯৮৬), যুগ-কবি নজরুল, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম [সম্পা.] (২০০৩), শিখা সমগ্র, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রফিকুল ইসলাম (২০১৯), নজরুলের বাংলাদেশ-আগমনের শতবর্ষ, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

রফিকুল ইসলাম (২০১৮), নজরুল-পর্যালোচনা, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।



# বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল ইসলামের আগমন

বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুলের আগমন তাঁর জীবনের ঘটনাবহুল অধ্যায়গুলোর অন্যতম। কাজী নজরুলের জীবন ও কর্মের আলোচনায় নানাভাবেই বর্ধমান হাউসের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কবি নজরুলের লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্রে বর্ধমান হাউসের প্রসঙ্গ এসেছে। এসব পত্রে তাঁর দ্রোহী রূপ, ভাবুক মন ও প্রেমিক রূপ ফুটে উঠেছে। এছাড়া 'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থ ও 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে বর্ধমান হাউসে অবস্থানকালীন নানা ঘটনার ছাপ রয়েছে। তাই বর্ধমান হাউসের সঙ্গে কাজী নজরুল জড়িয়ে রয়েছেন গভীর একাত্মতায়। অপরদিকে বর্ধমান হাউসের সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ইতিহাসের নানা বাঁক পরিবর্তনের একটি পর্যায়ে বর্ধমান হাউসে এদেশের বাংলা ভাষার সর্বোচ্চ গবেষণাগার বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা একাডেমির সঙ্গে কবি নজরুলের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

১৯০৫ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের আমলে ইতিহাসখ্যাত প্রথম বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হয়। এ সময় অবিভক্ত বাংলা প্রদেশ থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করে এ তিনটি বিভাগের সঙ্গে আসামকে যুক্ত করে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামে নতুন একটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়, তার রাজধানী হয় ঢাকা। এর ফলে নতুন প্রদেশের রাজধানীর জন্য পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, বর্ধমান হাউস, কার্জন হলসহ বেশ কয়েকটি সুরম্য অট্টালিকা তৈরি করা হয়। বাংলা প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯১১ সালে এ আন্দোলনের চাপে বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা রদ করা হয়। ১৯১২ সালের পর ঢাকায় আর রাজধানী শহর থাকে না। দ্বিখণ্ডিত বাংলা আবার অবিভক্ত বাংলারূপে ফিরে যায়। এতে পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হলেন। ইংরেজ সরকার পূর্ব বাংলার জনসাধারণের সান্ত্বনার জন্য ঢাকাকে অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের দ্বিতীয় রাজধানী শহররূপে আখ্যায়িত করে। বাংলার গভর্নরের শাসন-পরিষদের অধিবেশন বছরে একবার আয়োজনের মাধ্যমে ঢাকা শহরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অবিভক্ত বাংলার গভর্নরের শাসন-পরিষদের ৩ সদস্যের অন্যতম সদস্য ছিলেন বর্ধমানের রাজা স্যার বিজয় চাঁদ মাহতাব। তিনি শীতকালে কিছুদিনের জন্য ঢাকায় এসে আলোচ্য সরকারি ভবনে থাকতেন বলে ভবনটি

বর্ধমান হাউসরূপে পরিচিতি লাভ করে। বর্ধমানের রাজা ঢাকায় এলে তাঁর সঙ্গে মন্ত্রীরা এবং কিছু কিছু রাজ-কর্মচারী ও ঢাকায় অবস্থান করতেন। তাঁরা রদ হওয়া নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকাতে সৃষ্ট বিভিন্ন সুরম্য অট্টালিকায় অবস্থান করেন।

১৯২১ সালের ১লা জুলাই রমনা এলাকার কার্জন হলের সীমানার চারদিকে নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বর্ধমান হাউস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে পড়ে। তখন বর্ধমান হাউস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাসভবন ও শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

১৯২৬ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন বর্ধমান হাউসে বাস করতেন। সেই সময় কয়েকবার কাজী নজরুল কিছুদিন অবস্থান করে কাজী মোতাহার হোসেনের অতিথি হিসেবে এ ভবনে ছিলেন।

১৯৪৭ সালের পূর্বকালে কিছু সময় সরকারের উচ্চ পর্যায়ের অতিথিরা বর্ধমান হাউসে অবস্থান করেন। তখন বর্ধমান হাউস উচ্চ পর্যায়ের অতিথিশালার পাশাপাশি এ ভবনে সরকারি বেসরকারি সংস্থার বিভিন্ন কার্যালয় ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে কার্জন হলে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব-বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর (তখন Cheif Minister-কে প্রধানমন্ত্রী বলা হতো) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন থেকে বর্ধমান হাউস হয় তাঁর সরকারি বাসভবন। এই ভবনে ১৯৪৮ সালে তাঁর সঙ্গে ভাষা-আন্দোলনের ছাত্রনেতাদের এক চুক্তি সম্পাদিত হয়, পরে তিনি এ চুক্তি ভঙ্গ করেন। ১৯৪৮ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর তিনি পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ত্যাগ করে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন।

অতঃপর নুরুল আমিন পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রীকে তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হতো) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন থেকে বর্ধমান হাউস হয় তার সরকারি বাসভবন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের বিরোধিতা করেন এবং তাঁরই সময়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র-জনতার মিছিলের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে চারজন শহিদ হন। পূর্ব বাংলার ছাত্র ও জনতার দাবি অনুযায়ী ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে যুক্তফ্রন্ট তাঁদের ২১ দফা নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির ১৬ দফায় অঙ্গীকার করেছিলেন যে বর্ধমান হাউসে বাংলা ভাষার গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমির উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন হয়। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর নিকট পরাজিত হলে বর্ধমান হাউস থেকে তিনি চলে যাওয়ার পর ২১ দফা প্রতিশ্রুতির ১৬ দফা অনুযায়ী ছাত্ররা এ ভবনে কিছুকাল থেকেছিলেন।



১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের আয়োজনে ঢাকায় ২৩-২৬শে এপ্রিল সাহিত্য-সম্মেলন হয়েছিল। এ সম্মেলন উপলক্ষ্যে বর্ধমান হাউসের নিচের তলার পূর্ব দিকের তিনটি কক্ষে পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এটি ছিল পূর্ব বাংলার প্রথম পুস্তকপ্রদর্শনী। ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দিয়ে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের ৯২ক ধারার বলে গভর্নরের শাসন প্রবর্তিত হয়। সরকার বর্ধমান হাউসের আংশিক আর্ট কাউন্সিলকে দেন। সেই সময় বর্ধমান হাউসে পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলের আয়োজনে আন্তর্জাতিক নৃত্য-সম্মেলন হয়। উক্ত নৃত্য-সম্মেলনে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ আমন্ত্রিত হয়ে বর্ধমান হাউসে এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ৮৮ বছর। এ সময় তিনি আর্ট কাউন্সিলের অতিথিরূপে বর্ধমান হাউসে প্রায় দুই মাস অবস্থান করেছিলেন।

১৯৫৫ সালের ২৬শে নভেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হলে পরের মাসে ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুতরাং বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা এক বিশাল ইতিহাস। বলা যায়, বর্ধমান হাউসের ইতিহাস মানে বাংলাদেশের ইতিহাস। এই ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায় কাজী নজরুলের আগমন।

ব্রিটিশ আমলে কাজী নজরুল বর্ধমান হাউসে কয়েকবার এসেছিলেন। ১৯২৮ সালে একবার এসে তিনি বর্ধমান হাউসে অনেক দিন অবস্থান করেছিলেন। কাজী নজরুল ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে (১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মাঘ) মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনের আমন্ত্রণ পেয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। উক্ত সাহিত্য সমাজের প্রথম সম্মেলনও তিনিই উদ্বোধন করেছিলেন। কাজী নজরুল দ্বিতীয় বার্ষিকী সম্মেলন 'চল্ চল্ চল্' গানটি গেয়ে তিনি উদ্বোধন করেন। এ সম্মেলনটি হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাঙ্গণে। তখন এই হলটিকে শুধু মুসলিম হল বলা হতো। মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের সম্পাদক ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। তিনি তখন মুসলিম হলের হাউস টিউটর হিসেবে বর্ধমান হাউসে বসবাস করতেন। কাজী নজরুল ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি কবি কাজী নজরুলের থাকার ব্যবস্থা হয় কাজী মোতাহার হোসেনের অতিথি হিসেবে বর্ধমান হাউসে। এ সম্বন্ধে কাজী নজরুলের স্নেহধন্য, বিশিষ্ট কাজী নজরুল গবেষক আবদুল কাদির লিখেছেন :

> ...দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন নজরুল তাঁর 'চল্ চল্ চল্' গানটি গেয়ে। ... সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁর থাকার জায়গা করে দেওয়া হয় বর্ধমান হাউসেরই একটি কক্ষে; সেখানে তিনি অনেক দিন অবস্থান করেছিলেন।

শাহাবুদ্দীন আহমদ (সম্পা.) কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, জানুয়ারি ১৯৮৯, ঢাকা, পৃ. ৫০।

বর্ধমান হাউস থেকে তিনি ঢাকার বিভিন্ন বিদ্বৎজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। তন্মধ্যে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। বর্তমান পুরাতন হাইকোর্ট ভবন ছিল সে সময় ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষের বাসভবন। কাজী নজরুল তাঁর বাসভবনে যেতেন। তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতেন। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের একমাত্র কন্যা উমা মৈত্রকে (নোটন) কাজী নজরুল গান শেখাতেন। কাজী নজরুল প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্যেন বোসের বাসায় যেতেন। তাঁর বাসা ছিল বর্তমান জাতীয় প্রেসক্লাব। সেখানেও কবি নজরুল গানের আড্ডা দিতেন। সত্যেন বোস সংগীতপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। এছাড়া বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সংগঠক, মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপাত্র 'শিখা' পত্রিকার সম্পাদক, সমকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল হুসেনের বাসায়ও কাজী নজরুল যেতেন। তখন তাঁর বাসা ছিল বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের পুরাতন বিল্ডিং।

কাজী নজরুল বর্ধমান হাউসে অবস্থান করে ওয়ারিতে রানু সোমের (প্রতিভা বসু) বাসায় যেতেন। তাঁকেও গান শেখাতেন। বর্ধমান হাউসে অবস্থানকালে কাজী নজরুলের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে পরিচয় হয়। ফজিলাতুন্নেসা মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের একটি অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। ফজিলাতুন্নেসাকে কাজী নজরুল খুব ভালোবাসতেন। তাঁর বাসা দেওয়ান বাজারে যেতেন। তাঁর ছোট বোন শফিকুন্নেসাকে কাজী নজরুল গান শেখাতেন।

বর্ধমান হাউসে অবস্থানকালে কবির জীবনে এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। কাজী নজরুল একদিন বনগায় রানু সোমকে গানের প্রশিক্ষণ শেষে রাতে বর্ধমান হাউসে ফিরছিলেন। পথে একদল গুন্ডা লাঠিসোটা নিয়ে কাজী নজরুলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু কাজী নজরুলও সহজে ছেড়ে দেননি। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর হাবিলদার। তিনি বেতের মুঠোঅলা একটা লাঠি কেড়ে নিয়ে তাদেরকে দু-এক ঘা কষে লাগিয়ে দৌড়ে আসেন বর্ধমান হাউসে। তখন তাঁর জামাকাপড় ছেঁড়া, হাতে-পিঠে আহত হওয়ার চিহ্ন ছিল। এ নিয়ে সমকালে সাপ্তাহিক 'সওগাতে' সংবাদ ছাপা হয়েছিল।

নানা ঘটনার, নানা স্মৃতি নিয়ে কবি ঢাকা থেকে কলকাতায় যান। কলকাতা থেকে বর্ধমান হাউসের ঠিকানায় বেশ কটি পত্র লিখেন। সুতরাং বর্ধমান হাউসের সঙ্গে কাজী নজরুল জড়িয়ে আছেন গভীর একাত্মতায়।



## প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুলের অবস্থানের বর্ণনা

কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান হাউসে অবস্থানের তাঁর অনেক সুহৃদ, বন্ধু ও সহকর্মীরা বিচ্ছিন্নভাবে স্মৃতিচারণ করেছেন। এঁদের সঙ্গে কাজী নজরুলের ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ ছিল। এসবের কালানুক্রমিক স্মৃতি সঠিকভাবে গ্রন্থনা করা কঠিন কাজ। এখানে অনেক গ্রন্থ পাঠ করে কাজী নজরুলের বর্ধমান হাউসে অবস্থানের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু তুলে ধরা হলো।

## কাজী মোতাহার হোসেন

কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) ছিলেন কাজী নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব। বর্ধমান হাউসের ঠিকানায় তাঁর সঙ্গে কাজী নজরুলের বেশ কয়েকটি পত্র যোগাযোগ হয়েছে। তিনি কাজী নজরুলের প্রিয় মোতাহার। কাজী মোতাহার হোসেনের পরিবারের সাথে কাজী নজরুল নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে কাজী মোতাহার হোসেনের জবানিতেই তার বক্তব্য :

> ১৯২৮ সালে সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মিলনীতে তিনি আবার আমন্ত্রিত হন–তাঁর উদ্দীপনামূলক সংগীত ও বক্তৃতা দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য। এই সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত মার্চ-সংগীতটি গেয়েছিলেন–যার শুরুটা হল এমনি :
>
> চল্ চল্ চল্
> ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
> নিম্নে উতলা ধরণী-তল
> অরুণ প্রাতের তরুণ-দল
> চল্‌রে চল্‌রে চল্
>
> এগিয়ে চলার এই আগ্রহদ্দীপক আহ্বান বাঙালির গোটা ইতিহাসকে পুনর্জাগরণের মন্ত্রে উদ্বোধিত করে তুলেছিল। সভাশেষে কবির নিকট আমন্ত্রণ এলো বুড়িগঙ্গাতীরের জমিদার রূপবাবুর বিশাল অট্টালিকা থেকে, পুরোনো হাইকোর্টের অঙ্গনে অবস্থিত অধ্যক্ষ

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের গৃহ থেকে এবং আরও বহু বুদ্ধিজীবী কৃষ্টিমান নাগরিকদের কাছ থেকে, বিশেষ করে কবির কল্লোল-গোষ্ঠীর বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে, যাঁদের মধ্যে প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

এই সময় নজরুল ইসলাম বর্ধমান হাউসের (বর্তমান বাংলা একাডেমি) নীচের তলায় আমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতেন। আমি সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের হাউস টিউটর হিসাবে তখন ওখানে বাস করছিলাম। এই সব নিমন্ত্রণে অধিকাংশ সময়েই আমি নজরুলের সঙ্গে যেতাম এবং তাঁর গান ও কথাবার্তা উপভোগ করতাম।

রূপবাবুর বাড়ীতে তিনি অনেকগুলি গান গেয়েছিলেন কারণ ঐ সময় ঢাকার সকল অভিজাত ব্যক্তিই সেখানে জমা হয়েছিলেন। গানটি হলো :

বসিয়া নদীকূলে এলোচুলে কে উদাসিনী।
কে এলে পথ ভুলে এ অকূলে বন-হরিণী।
কলসে জল ভরিয়া চায় করুণায় কুলবধূরা।
কেঁদে যায় ফুলে ফুলে পদমূলে সাঁঝ-তটিনী
হারালি গোধূলি-লগনে, কবি কোন নদী কিনারে,
এ কি সেই স্বপ্ন চাঁদ পেতেছে ফাঁদ প্রিয়ার সঙ্গিনী।

বুড়িগঙ্গার বাড়ীতে ঐ গান প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এক আশ্চর্য সঙ্গতির সৃষ্টি করেছিল। আরও যে একটি গান তিনি গেয়েছিলেন সেটি হলো :

জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত।
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত জনমত-মথিত বাপী
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ঐ আগত

এটা তাঁর কাব্যের একটি প্রধানতম বিষয় যা নজরুল ইসলামকে কাব্যরাজ্যের রাজসিংহাসনে বসিয়েছিল।

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র একজন ভালো কবি ছিলেন। তিনি অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর সনেট ও গান লিখেছিলেন। খুব ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারতেন তিনি। তাঁর স্ত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন গ্রাজুয়েট ছাড়াও একজন চিত্রশিল্পী ও পিয়ানো-বাজিয়ে ছিলেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা কুমারী উমা মৈত্র ওরফে নোটন সেতার ও পিয়ানোর একজন শিক্ষার্থী ছিলেন। সে সময় তিনি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এসসি. পরীক্ষায় পাশ করে বেরিয়ে এসেছেন এবং দাবা খেলায় মোটামুটি শিক্ষালাভ করেছেন। কিন্তু কোন রহস্যজনক কারণে জানি না তাঁকে বি.এসসি. পড়তে দেওয়া হয়নি, অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ঠিক উল্টোদিকে অবস্থিত) ছিল কলেজ রোড নামক প্রধান সড়কের অপর পাশে।

প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় এবং প্রফেসর সত্যেন বসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ) এই পরিবারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। দিলীপ রায় ঘনঘন



কলকাতা থেকে ঢাকাতে আসতেন এবং নোটনকে শুধু ব্রহ্মসংগীতই নয় তাঁর নিজের লেখা এক ধরনের উচ্চাঙ্গ রাগসংগীতও শেখাতেন। মৈত্র পরিবারটি ছিল সবদিক দিয়ে উদার; এবং তাঁদের কাছে হিন্দু-মুসলমান বলে কোন কথা ছিল না। উভয় সম্প্রদায়ের সুধীজনেরা তাঁদের বন্ধু ছিলেন। যেমন উদাহরণতঃ প্রফেসর সত্যেন বসু (একজন হিন্দু), অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন (একজন মুসলমান), প্রফেসর বঙ্কিমদাস ব্যানার্জি (অঙ্কের প্রফেসর, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ চালু হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বদলী হয়ে তিনি সেখানে যান) এবং শহরের অনেক গুণীজ্ঞানীজন অধ্যক্ষ মৈত্রের বাড়ীতে উদার অভ্যর্থনা পেতেন। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও খেলাধূলা ও সঙ্গীতের প্রতি অধ্যক্ষ মৈত্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল। আমিও সময়সময় হাইকোর্টের অন্তর্গত অধ্যক্ষের পারিবারিক লনে আমার প্রফেসর বঙ্কিম বাবু, তাঁর ছেলে অজিত, অন্য একজন প্রফেসর সুরেন ঘোষ (পদার্থবিদ্যা) এবং তাঁর দুই ছেলে ডাকু ও টুকুর সঙ্গে টেনিস খেলতাম। দিলীপ রায় দাবা খেলতে ভালবাসতেন এবং তিনিও আমার একজন দাবা খেলার বন্ধুতে পরিণত হন। আমি নোটনকে দাবা খেলা শিখিয়েছিলাম। দিলীপ রায়ও নোটনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দাবা খেলতেন। বিখ্যাত ওস্তাদ হায়দার খান নোটনকে তিন-চার বছর ধরে উচ্চাঙ্গসংগীত শেখান। নোটন তাঁর সঙ্গে কণ্ঠসংগীত গাইতেন এবং সাথে সাথে সেতারও বাজাতেন। তাঁর মাতাপিতা এই কুমারী কন্যাটিকে কতটা স্বাধীন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন উপরের বর্ণনাটি তারই মোটামুটি খসড়া।

১৯২৮ সালে নজরুল যখন ঢাকায় আসেন মৈত্র তাঁর গান শোনেন। একজন উঁচুদরের সংগীতজ্ঞ হিসেবে তিনি বুঝতে পারেন যে, নজরুলের গানের একটা পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের বিভিন্ন অলঙ্কার মীড়, গমক, বুঁদ, মূর্ছনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনিব্যঞ্জনা সেতারে এবং কণ্ঠসঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে নোটনকে সাহায্য করতে তিনি নিয়মিত নজরুলকে তাঁর বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানান। নোটন সেতার বাজাতেন অপূর্ব সুরের দ্যোতনা ফুটিয়ে এবং নজরুল অর্গানের রিডে সুনিপুণ আঙুলের মৃদু স্পর্শে সূক্ষ্মতম সুরের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে–নোটনের পক্ষে সেতারে যা ফোটানো সম্ভব হত না–কণ্ঠ মিলিয়ে গান করতেন, আর মিস্টার ও মিসেস মৈত্র সেই অপূর্ব সঙ্গীতের শিল্পসুষমার মাধুর্য তন্ময়চিত্তে উপভোগ করতেন। নজরুল যতদিন ঢাকায় ছিলেন তিনি নিয়মিত প্রতিদিন প্রায় দুঘণ্টা করে মানোরম সংগীত চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন। নজরুল জানতেন দিলীপকুমারও নোটনকে তাঁর নিজস্ব ডঙে বাংলা গানের কায়দা-কানুন শিখিয়েছেন। ঐসব গান ছিল খানিকটা টপ্পার ধাঁচে লেখা বিশেষ ধরনের ঠুংরী-পিঝাকাটোর নোটের গিটকিরির কিংবা “প্যাসেজ”-এর দ্রুত লয়সম্পন্ন। দিলীপকুমারকে ডিঙিয়ে যাওয়ার সংকল্প করেন নজরুল এবং সিদ্ধিও লাভ করেন। ভারতীয় সঙ্গীতের এই দুই সুপরিচিত সংগীত শিল্পী সংগীতাঙ্গনে সংগীত শিক্ষাদানের কৌশলে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতেন। বিশেষ করে শিক্ষার্থীটি যদি হতেন প্রিয়দর্শিনী। কুমারী মৈত্র নিঃসন্দেহে ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী এবং অভিজাত মহিলা। স্বভাবে তিনি ছিলেন তিনি খুবই শান্তশিষ্ট এবং ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের চোখে কাব্যপ্রেরণাদায়ী আনন্দের নির্ঝরিণী–নজরুল তাঁর গানগুলিকে যে গভীর আবেগ মূর্ত করে তুলতেন তারই পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর “চক্রবাক” কাব্যের ‘গানের আড়াল’ কবিতায়–

তোমার কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান-
এইটুকু শুধু রবে পরিচয়? আর সব অবসান?

অন্তরতলে অন্তরতর যে-ব্যথা লুকিয়ে রয়,
গানের আড়ালে পাও নাই তার কোনদিন পরিচয়?
হয়তো কেবলি গাহিয়াছি গান, হয়ত কাহিনি কথা,
গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস, মিছে তার আকুলতা?
হৃদয়ে কখন জাগিল জোয়ার, তাহারি প্রতিধ্বনি
কণ্ঠের তটে উঠেছে আমার অহরহ রণরণি,-
উপকূলে বসে শুনেছ সে-সুর, বোঝ নাই তার মনে?
বেঁধেনি হৃদয়ে সে-সুর, দুলেছে দুল হয়ে শুধু কানে?
হার ভেবে নাহি পাই-
যে-চাঁদ জাগালো সাগরে জোয়ার, সেই চাঁদই শোনে নাই
সাগরের সেই ফুলে ফুলে কাঁদা কূলে কূলে নিশিদিন?
সুরের আড়ালে মূর্ছনা কাঁদে, শোনে নাই তাহা বীণ?

কিন্তু নোটনের কাছ থেকে কোন রকম সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নি। তাঁর মুখের কাছে আকুতির বিন্দুমাত্র চিহ্ন ফুটে ওঠেনি কখনো। যেন দা ভিঞ্চির মোনালিসার মত যিনি ছিলেন সকল ধরা-ছোঁয়ার বাইরের এক মূর্তিমতী রহস্য। কারও কারও হয়ত মনে হতে পারে উল্লিখিত কবিতাটি প্রতিভা সোম ওরফে রানুকে উপলক্ষ করে লেখা : কিন্তু আমার আদৌ-সন্দেহ নেই যে কবি তাঁর কাব্যপ্রেরণাদাত্রীর পরিচয়টিকে যথাসাধ্য গোপন করার চেষ্টা করেছেন। কেবল নোটনের ছিল অন্যের বেলায় ততটা ছিল না। কেননা অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিশতে কবির স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশি।

রানুর সঙ্গে পরিচয়ের ভূমিকা-স্বরূপ শুধু এইটুকু বলতে পারি : বেনুকা সেন নাম্নী টিকাটুলীর এক কুমারীর সংগীতশিক্ষার ভার নিয়েছিলেন দিলীপ রায়, গ্রামোফোন রেকর্ডে অতুলপ্রসাদ সেন লিখিত 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' গানটি গেয়ে তখন রেণুকা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তিনি দিলীপের শিক্ষকতার গুণে এই দুর্লভ খ্যাতিলাভ করেন। এই সময় 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক রসিক সজনীকান্ত দাস দিলীপ ও রেণুকার সম্বন্ধের বিকৃত রূপ দান করে দিলীপের নাম দিলেন "কানুরে"। নজরুল তাঁর শিষ্যা রানুকে দিয়ে রেণুকার চেয়েও সুন্দরভাবে তাঁর স্বরচিত গান রেকর্ড করার সংকল্প করেন। কারণ এমনিতেই রানুর কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত সুরেলা, চড়া পর্দাতেও তাঁর গান খুবই মিষ্টি শোনাত। রানুর বাবা, মা, অধ্যক্ষ সুরেন মৈত্র, প্রফেসর সত্যেন বোস আমাদের বাসায় প্রায় আসা যাওয়া করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য প্রফেসর সত্যেন বোস কেবল একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন না, একজন সুদক্ষ বেহেলা বাদকও ছিলেন।

যা হোক, গল্পে ফিরে আসা যাক, নজরুলের সংগীতভাণ্ডারে সুরের রাগরাগিণীর যত গভীর সূক্ষ্ম কলা-কৌশল ছিল রানুর কণ্ঠে তা তুলে দিতে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। এই উপযুক্ত শিক্ষার্থিনীটি তাঁর সকল বিখ্যাত গানকে সে সময় আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষ করে রানুর কণ্ঠে নিম্নলিখিত গজলটি (মিশ্র ভৈরবী ও আশবরি) অপূর্ব দ্যোতনায় রূপলাভ করত :

কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে।
সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে কুসুমবাগের গুল্‌বদনে।
*          *          *
সহসা জাগি আধেক রাতে শুনি সে বাঁশী বাজে হিয়াতে।



বাহু-সিথানে কেন কে জানে কাঁদে গো পিয়া বাঁশীর সনে।
বৃথাই গাঁথি কথার মালা লুকাস কবি বুকের জ্বালা।
কাঁদে নিরালা বনশীওয়ালা তোরি উতালা বিরহী মনে

তাঁর কণ্ঠে পিলুতে (কাহার্বা দাদরা) গাওয়া আরেকটি নজরুল-গীতি উল্লেখযোগ্য :

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা-সনে রহিল আঁকা,
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা
আগে মন করলে চুরি মর্মে শেষে হানলে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা
চকোরী দেখলে চাঁদে দূর হতে সই আজো কাঁদে,
আজো বাদলে ঝুলন ঝোলে তেমনি জলে চরে বলাকা
বকুলের তলায় দোদুল কাজলা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী কাঁখে গাগরী চরণ ভারি কোমর বাঁকা
তরুরা রিক্ত পাতা আসলো লো তাই ফুল-বারতা,
ফুলের গলে ঝরেছে বলে ভরেছে ফলে বিটপী-শাখা
ডালে তোর হানলে আঘাত দিস রে কবি ফুল-সওগাত,
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে বনে কি দুলে ফুল-পতাকা

এমন অবস্থায় 'শনিবারের চিঠি'র রসিক সম্পাদক সজনীকান্ত কেমন করে আর নীরব থাকেন? এই যে দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই–গভীর মনোযোগের সঙ্গে নজরুল প্রতিদিন রানুকে সঙ্গীতের পাঠ দিয়ে চলেছেন, এতে সজনীর মত ব্যক্তির পক্ষে স্থির থাকা কেমন করে সম্ভবপর? একি দিলীপ-রেণুকার সম্পর্কের চেয়ে আরও গায়ে জ্বালা ধরানোর মত মারাত্মক ব্যাপার নয়? এমনি জল্পনা-কল্পনায় উত্তেজিত হয়ে নজরুলকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি উপযুক্ত রকমের একটি প্যারোডি লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। যে-গানটির প্যারোডি লেখা হয় উপরে তার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে–"কে বিদেশী বন–উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে"। সজনীকান্তের প্যারোডিটি এখানে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কিন্তু প্যারোডিটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিণতির ফল শীগগির পাওয়া গেল।

একদিন রাত্রি ১১টা পর্যন্ত আমাদের অতিথি নজরুল ইসলামের জন্য আমরা বর্ধমান হাউসে অপেক্ষা করছিলাম। আরও আধঘণ্টা খানেক পর আমরা সিঁড়িতে দ্রুত মনুষ্য পদধ্বনি শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম নজরুল ইসলাম তাঁর ঘরে ঢুকছেন–হাতে তাঁর একটি নতুন লাঠি, গায়ের কুর্তায় রক্তের দাগ এবং শরীরে লাঠির আঘাতের চিহ্ন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর এবং কোনরকমে ক্ষতস্থানে পট্টি আনিয়ে লাগানোর পর তার কাছ থেকে নিম্নোক্ত ঘটনা শোনা গেল :

সোম মশায়ের বাড়ি থেকে আমি কেবল বেরিয়ে এসে পথে নেমেছি এমন সময় কয়েকজনের একটি যুবকের দল ছড়ি ও লাঠি নিয়ে হঠাৎ আমাকে চারদিক থেকে আক্রমণ করলো। প্রথমটা আমি হকচকিয়ে গেলাম কিন্তু পর মুহূর্তেই একজনের হাত থেকে ওই বেতের ছড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে কেমন করে আঘাত ফিরিয়ে দিতে হয় তা একটু তাদের বুঝিয়ে দিলাম। আমার কাছাকাছি যে দুতিন জন ছিল ঐ হায়দরী ঘায়ের আঘাতটা খেয়ে সেখানেই ঘুরে পড়ল। অবস্থা বেগতিক দেখে এবং কাছের নবাবপুর স্ট্রীটের পাহারাদার পুলিশের আগমন ভয়ে তারা সব দ্রুত পালিয়ে গেল।

ঘটনাটা ঘটেছিল বনগ্রাম লেনে। এই গলির উপরেই ছিল সোম মশায়ের বাড়ি। স্থানীয় হিন্দু-যুবকেরা সজনীকান্তের প্যারোডিটি সম্ভবত পড়েছিল। এতে তাদের মনে সন্দেহ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। তারা একটা কেলেঙ্কারীর কথা আঁচ করে তার একটা বিহিত করার চেষ্টা করেছিল। রানু হিন্দুর মেয়ে আর নজরুল মুসলমানের ছেলে। সুতরাং অনেক হিন্দু-রক্ত এই সম্পর্কটিকে একেবারে সহ্য করতে পারছিল না। এ যেন ছিল তাদের পৌরুষের উপর আঘাত।

যাহোক ঐ গল্পের ঐখানেই শেষ। এর দুএকদিন পরে নজরুল আমাকে তাঁর সেই ঐতিহাসিক ছড়িটা উপহার দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। আট-'ন বছর যাবৎ ছড়িটা আমার কাছেই ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাঁচী থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত লোহার ডাগা নামক এক জায়গায় আমার ঢাকা কলেজের সহপাঠী রুক্মিণীর বাড়িতে এক সাপ মারতে গিয়ে ছড়িটি ভেঙে যায়। ঘরের মেঝেতে শুয়ে আমরা দুই বন্ধু ঘুমাচ্ছিলাম এমন সময় সাপটি আমাদের দুজনের উপর দিয়ে চলে যায়। রুক্মিণী আমাকে জাগিয়ে দিয়েছিল; ঝক ঝকে মেঝের উপর শুয়ে থাকা সাপটিকে মারা আমার পক্ষে তেমন কঠিন হয়নি।

যতদূর মনে পড়ে ১৯২৮ সালে নজরুলের দ্বিতীয়বার ঢাকা আগমনের কুমারী ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে পরিচয় নিয়ে একই ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। ফজিলাতুন্নেসা অসামান্য সুন্দরীও ছিলেন না অথবা বীণানিন্দিত মঞ্জুভাষিণীও ছিলেন না। ছিলেন অঙ্কের এম. এ. এবং একজন উঁচুদরের বাক্পটু মেয়ে। তিনি আমার বান্ধবী ছিলেন এবং আমার কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন যে কবি একজন সৌখিন হস্তরেখাবিদ। আমাকে তিনি কবির কাছে তাঁর হাতের রেখা দেখাবার জন্যে অনুরোধ করেন। যথারীতি একদিন কবিকে নিয়ে হাসিনা মঞ্জিলের কাছে দেওয়ান বাজার রাস্তার উল্টোদিকে অবস্থিত ফজিলাতুন্নেসার গৃহে আমি উপনীত হই। প্রায় আধঘণ্টা ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কবি ফজিলাতুন্নেসার হাতে মস্তিষ্করেখা, জীবনরেখা, অন্বয়রেখা, সংলগ্ন ক্ষুদ্র রেখাসমূহ এবং সেইসঙ্গে ক্রস, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ সমন্বিত অন্যান্য মাউন্ট, শুক্র, শনি, রবি, বুধ, মঙ্গল ও চন্দ্রের অবস্থানগুলো নিরীক্ষণ করলেন।

কিন্তু এগুলোর সম্বন্ধ-সূত্রের ফলাফল নির্ণয় করতে ব্যর্থ হলেন। তিনি একজন জ্যোতিষীর মত সূর্য-চন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত তারকার অবস্থান টুকে নিলেন এবং রাত্রিতে তিনি বিশদভাবে এটা নিয়ে পরীক্ষা করলেন বলে জানালেন। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা ফিরেও এলাম। রাত্রে খাবার পর প্রতিদিনকার অভ্যাসমত আমরা শুতে গেলাম। তখন রাত প্রায় এগারোটা হবে। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর হওয়ার আগে জেগে উঠে দেখলাম নজরুল নেই। বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলাম নজরুল কোথায় যেতে পারে। সকালে নাস্তার সময় তিনি ফিরে এলেন এবং তাঁর অমনভাবে অদৃশ্য হওয়ার কারণ বললেন :

রাত্রে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্নে দেখলাম একজন জ্যোতির্ময়ী নারী তাকে অনুসরণ করার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু জেগে উঠে সেই দেবীর পরিবর্তে একটি অস্পষ্ট হলুদ আলোর রশ্মি দেখলাম। আলোটা আমাকে যেন ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে, আমার সামনে সামনে এগিয়ে চলছিল। আমি বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে কিছুটা অভিভূত হয়ে সেই আলোকরেখার অনুসরণ করছিলাম। মিস ফজিলাতুন্নেসার গৃহের কাছে না পৌঁছান



পর্যন্ত আলোটা আমার সামনে চলছিল। তাঁর বাড়ির কাছে পৌঁছতেই আলোটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি দেখলাম একটি ঘরের মধ্যে তখনো একটি মোমের বাতি জ্বলছে। রাস্তার ধারের জানালার কাছে সম্ভবতঃ পথিকের পায়ের শব্দ শুনে গৃহকর্ত্রী এগিয়ে এসে ঘরের প্রবেশ-দরোজা খুলে নিলেন এবং মিস ফজিলাতুন্নেসার শয়ন-ঘরের দিকে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। ফজিলাতুন্নেসা তাঁর ঘরের দরোজা খুলে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। কুমারী নেসা তাঁর শয্যার উপর গিয়ে বসলেন আর আমি তাঁর সামনে একটি চেয়ারে বসে তাঁর কাছে প্রেম যাচন করলাম; তিনি দৃঢ়ভাবে আমার প্রণয় নিবেদন অগ্রাহ্য করলেন।

এই হচ্ছে সামগ্রিক ঘটনা–একে মানসচক্ষে নিয়ে আসা কিংবা এর রহস্যোদ্ঘাটন করা অত্যন্ত কঠিন। সূর্য ওঠার পর কোথায় ছিলেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : ঐ ঘটনার পর নিরতিশয় ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ি; তাই ভোর বেলা রমনা লেকের ধারে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছিলাম।

এটা অবশ্য একটা যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। কেননা নজরুল রমনার লেক ভালবাসতেন এবং লেকের ধারে সাপের আস্তানা আছে জেনেও সেখানে ভ্রমণ করতে যাওয়া তাঁর পক্ষে আদৌ অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আরও একটি বিস্ময়ের ব্যাপার তখনো আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঐদিন দুপুরে লক্ষ্য করলাম ফজিলতের গলার লম্বা মটর-মালার হারটা ছিঁড়ে দুখান হয়ে গিয়েছে। পরে সেটা সোনারুর দোকান থেকে সারিয়ে আনতে হয়েছিল। অত্যন্ত কাছ থেকে জোরাজুরি ছাড়া এমন একটা কাণ্ড কেমন করে ঘটতে পারে আমার পক্ষে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। নজরুল ইসলাম আমার কাছে ও ফজিলাতুন্নেসার কাছে যেসব দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন তা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় এমন অঘটন কিছু ঘটেছিল যাতে ফজিলতের হৃদয় তিনি জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ঐসব চিঠিপত্র নজরুলের হৃদয়ের গভীর হাহাকার ব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের সত্যতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এক্ষেত্রে নোটনের ব্যাপারে যেমনটি ঘটেছিল ফজিলতের ব্যাপারেও ঠিক তাই-ই ঘটেছিল।

কুমারী ফজিলাতুন্নেসার বিলাত গমন উপলক্ষে নজরুল 'বর্ষা-বিদায়' নামক একটি কবিতা লিখেন। তাঁর বিখ্যাত প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। কিন্তু কবিতাটি এমন নৈর্ব্যক্তিকভাবে লেখা যে অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে তা ব্যঙ্গার্থ কিংবা রূপকের রহস্যভেদ করা কঠিন। তাঁরা শুধু দেখবেন প্রকৃতি কিভাবে বর্ষা ঋতু থেকে শীত ঋতুতে রূপ পরিবর্তন করছে। অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে তিনি তাঁর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে চেতনাশ্রিত কল্পনায় এমনভাবে জারিত করে নিয়েছিলেন যা থেকে তিনি মুক্তোর মত এমন কতকগুলো কবিতা রচনা করেন যা তাঁর অনুভূতিকে বিশ্বচারিত্র্য দান করেছে। অসাধারণ ক্ষমতাবান কবি ছাড়া বক্তব্য বিষয়কে এমন অনিন্দ্যসুন্দর রূপকের আড়ালে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি কবিতাটির নির্বাচিত কয়েকটি পঙ্ক্তি এখানে তুলে দিলাম :

ওগো বাদলের পরী!
যাবে কোন দূরে ঘাটে বাঁধা তব কেতকী পাতার তরী!
ওগো ও ক্ষণিকা পুব অভিসার ফুরাল কি আজি তব?
শহিল ভাদরে পড়িয়াছে মনে কোন দেশ অভিনব?

তোমার কপোল-পরশ না পেয়ে পাণ্ডুর কেয়া-রেণু,
তোমারে স্মরিয়া ভাদরের ভরা নদীতটে কাঁদে বেণু।
ওগো ও কাজল মেয়ে-
উদাস আকাশ ছল ছল চোখে তব মুখে আছে চেয়ে।
কাশফুল সম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেঘে
তোমার তরীর উড়িতেছে পাল উদাস বাতাস লেগে।
ওগো ও জলের দেশের কন্যা! তব ও বিদায় পথে
কাননে কাননে কদম কেশর ঝরিছে প্রভাত হতে।
তুমি চলে যাবে দূরে-
ভাদরের নদী দু'কূল ছাপায়ে কাঁদে ছল ছল সুরে!
যাবে যবে দূর হিমগিরি শিরে, ওগো বাদরের পরী
ব্যথা করে বুক উঠিবে না কভু সেথা কাহাকেও স্মরি?
সেথা নাই জল, কঠিন তুষার নির্মম শুভ্রতা,-
কে জানে কী ভালো বিধূর ব্যথা-না মধুর পবিত্রতা।
সেথা রবে তুমি ধেয়ানমগ্না তাপসিনী অচপল,
তোমায় আশায় কাঁদিবে ধরায় তেমনি "ফটিক-জল"।

বাদলের পরীর সঙ্গে আর একটি কবিতার যে অনেকখানি মিল আছে সে কথাটি আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এই কবিতাটিও ফজিলাতুন্নেসার বিলাত গমন উপলক্ষে রচিত। কবিতাটি এমনি :

জাগিল "পারুল" কি গো "সাতভাই চম্পা" ডাকে।
উদিলে চন্দ্রলেখা বাদলের মেঘের ফাঁকে!
চলিলে সাগর ঘুরে
অলকার মায়ার পুরে,
ফোটে ফুল নিত্য যেথায়
আঁধারের বাতায়নে চাহে আজ লক্ষ তারা,
জাগিছে বন্দিনীরা টুটে ঐ বন্ধকারা!
থেকো না স্বর্গে ভুলে–
এ পারের মর্ত্য কূলে
ভিড়ায়ো সোনার তরী
আবার এই নদীর বাঁকে।।

এই কবিতাটিতে নজরুল তাঁর মনের ভাব গোপন করেননি, ফজিলাতুন্নেসাকে ফিরে আসার জন্য সরাসরি আবেদন করেছেন। কিন্তু আরও একটি কবিতায় এবং 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক'-এর অনেকগুলি কবিতায় কবি তাঁর অন্তরের গভীর অনুভূতিকে বিভিন্ন অলঙ্কার ও রূপকের আড়ালে ব্যক্ত করেছেন। ফজিলতের প্রতি নজরুলের অনুভূতির তীব্রতা দু'তিন বছরের সময়-সীমায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। সমান্তরাল আর একটি স্তবকে



লক্ষ্য করা যায় কবি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত প্রেমকে সুন্দরতর আর এক জগতে খুঁজে ফিরছেন যেখানে প্রেমে কোন নৈরাশ্য নেই, কোন বেদনা নেই। প্রেমের জন্য নারীর কাছ থেকে তিনি চেয়েছিলেন পূর্ণ আত্মসমর্পণ কিন্তু কোথাও তিনি তা পাননি। ফলে ধীরে ধীরে তিনি খোদা-প্রেমের দিকে ঝুঁকে পড়লেন :

পরজনমে দেখা হবে প্রিয়।
ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও।
এ জনমে যাহা বলা হল না,
আমি বলিব না, তুমিও বলো না।
জানাইলে প্রেম করিও ছলনা,
যদি আসি ফিরে, বেদনা দিও।
হেথায় নিমেষে স্বপন ফুরায়,
রাতের কুসুম প্রাতে ঝরে যায়,
ভালো না বাসিতে হৃদয় শুকায়,
বিষ-জ্বালা ভরা হেথা অমিয়।
হেথা হিয়া ওঠে বিরহে আকুলি',
মিলনে হারাই দু'দিনেতে ভুলি',
হৃদয়ে যথায় প্রেম না শুকায়-
সেই অমরায় মোরে স্মরিও।

স্পষ্টতঃই, প্রেমের এই বিশ্বাসহীনতা ও ক্ষণস্থায়িত্বের অভিজ্ঞতা কবিকে পার্থিব প্রেমের প্রতি নিরাসক্ত করে তুলেছিল। তাই তিনি অমর এক প্রেমের জগতে আত্মার শান্তি খুঁজে ফিরছিলেন; যেখানে প্রেম কখনো বিচ্ছেদের জ্বালায় কলুষিত হয়ে ওঠে না শাশ্বত মিলনের আনন্দই যেখানে সদা প্রবাহিত।

ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আমার বন্ধু নজরুল : তাঁর গান, উদ্ধৃত : ফরিদপুরে নজরুল, মফিজ ইমাম মিলন (সম্পা.) ঝিঙেফুল, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১২-২১

কাজী মোতাহার হোসেন অধ্যাপনা করতেন। তিনি কাজী নজরুলের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। তাঁকে লেখা কাজী নজরুলের কয়েকটি পত্রে বর্ধমান হাউসের দিনগুলো উঠে এসেছে। বর্ধমান হাউসে অবস্থানকালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কাজী নজরুলের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর অন্তরের আবেগ উজাড় করে লিখেছেন। উল্লেখ্য, কাজী মোতাহার, ফজিলাতুন্নেসাও কবি নজরুলকে এ সময়কালে পত্র লিখতেন। এই পত্রগুলো কাজী নজরুল পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনের বাস্তবতায় ধ্বংস করেছেন কিংবা সংরক্ষণ করেননি।

# প্রতিভা বসু

খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৬) ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের সরাসরি সংগীতের ছাত্রী। কাজী নজরুল তাঁর গানের বই 'চোখের চাতক' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬) তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন "কল্যাণীয়া বীণাকণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু"। পারিবারিক পরিচয়ে প্রতিভা বসু কবি বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম রানু সোম। সংগীত শিল্পী হিসেবে তিনি সমকালে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর একাধিক গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল। মাত্র এগারো বছর বয়সে গ্রামোফোন ডিস্কে তার গানের রেকর্ড বেরিয়েছিল। তিনি ছোটবেলা থেকে কিন্নরকণ্ঠী ছিলেন। 'জীবনের জলছবি' নামক তাঁর সুবিখ্যাত স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ রয়েছে। এ গ্রন্থের অনেকটা জুড়ে আছে বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিময় প্রসঙ্গ। এ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি পেশ করতে হবে। এ গ্রন্থে তিনি বর্ধমান হাউসে বিদ্রোহী কবির অবস্থান এবং ঢাকার সেই সময়ের পরিচিত বন্ধুদের অন্তরঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> সেই সময়ে যে তিনটি যুবক সারা বাংলার গর্ব বলে আলোড়ন তুলে ফেলেছিল তার মধ্যে একজন সুভাষচন্দ্র বসু, একজন নজরুল ইসলাম, আর একজন দিলীপকুমার রায়। এই তিনজনের নাম সকলের মুখে মুখে, ঘরে ঘরে আমার আগ্রহ দেখে বাবা বললেন, 'আমি খবর নেবো কীভাবে গান শোনার সুযোগ ঘটতে পারে। নিশ্চয়ই নানা জায়গায় গানের আসর বসবে, কোথাও না কোথাও শোনা যাবে।' কিন্তু বাবা যা খবর আনলেন তা মোটেও আশাপ্রদ নয়। প্রথম গানের জলসা বসছে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে। সে বাড়ি আমাদের অনধিগম্য। ঢাকার 'এলিট'রা সব যাবেন সেখানে। বলতে গেলে সেই আসর সারা পাড়ার সব অধ্যাপকদের জন্যই হচ্ছে। আর যাঁরা আমন্ত্রিত তাঁরা জজ ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার। সুতরাং এখানে আমাদের কোনো আশা নেই। দ্বিতীয় আসর কোনো-এক জমিদার বাড়িতে। তাদেরও আমরা চিনি না। তবে শোনা গেছে খুব শিগগিরই নদীর ধারে মুকুল সিনেমায় পাবলিকের জন্য গান হবে। বাবা বললেন, তখনই আমাদের নিয়ে যাবেন সেখানে। তা মন্দ নয়। যেখানেই হোক গান শুনতে পেলেই হলো, দেখতেও চাই। এসব মানুষকে দেখাও তো কম কথা নয়! মন শান্ত করেই ছিলাম। অশান্ত হলাম সত্যেন বসুর নিজে লেখা একটি চিঠি পেয়ে। বাবাকে লিখেছেন, 'আপনি সপরিবারে এলে খুশি হবো'। উনি কতোটা খুশি হয়েছিলেন জানি না, আমরা যে কতো খুশি হয়েছিলাম, কতো সম্মানিতবোধ করেছিলাম তার কোনো বর্ণনা নেই। ঢাকা শহরে সত্যেন বসু একটা কিংবদন্তী। তাঁর প্রতিভা বিষয়ে কতো মানুষের কতো শ্রদ্ধা উদ্বেলিত। তাঁর বাড়িতে যাব, তাঁকেও দেখব এর চেয়ে আনন্দ আর কী বেশি হতে পারে? অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রায় বিশ্বাসই হচ্ছিল না। নিমন্ত্রণ সেই সন্ধ্যাতেই, ঠিক ঠিক সময়েই আমরা ঘোড়ার গাড়ি করে গেলাম সেখানে। প্রথমে বাগানে আর বাড়ি দেখে মোহিত হলাম। পরে সত্যেন বসু আর দিলীপ রায়কে দেখে চোখ সার্থক করলাম। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং সেখানেই প্রথম বিখ্যাত আর একজন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঘোষকেও দেখি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন এই সব রত্ন নিয়ে সমৃদ্ধ ছিল। বাংলা ভাষায় সংগীত সুধা বলে একটা শব্দ আছে। দিলীপ রায়ের গান ছিল এই শব্দের আভিধানিক বিকল্প। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল শ্রবণ কোনো পার্থিব জগতের সুধারসে আপ্লুত নয়, যার নাম স্বর্গসুধা সেই সুধাই দিলীপ রায়ের কণ্ঠস্বরের মহিমায় মর্মস্থানে গিয়ে প্রবিষ্ট হচ্ছে। অভিভূত হয়ে সেই সুধাপান করেই জীবন ধন্য করলাম। আসর ভাঙতে বেশ রাত হলো। সকলের সঙ্গে যখন আমরাও উঠে আসছিলাম, সত্যেন বসু বললেন, 'বোসো, বোসো, এবার আমাদের ঘরোয়া আসর হবে।' ঘরোয়া আসর মানে আমরা ভেবেছিলাম, দিলীপ রায় ঘরোয়াভাবে আরো গান গাইবেন। তা নয়, হারমোনিয়মটি তিনি স্বয়ং আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'তোমার গান শুনব না? পালালেই হলো?'
>
> রেকর্ডের কল্যাণে দিলীপ রায় আমার নাম শুনেছিলেন কিন্তু সত্যেন বসু আমার এমনি গানও শুনেছেন। অবশিষ্ট দু-একজন অধ্যাপক যাঁরা সপরিবারে তখন উপস্থিত তাঁরাও তাই। তাঁরা শুনেছেন কোনো উপলক্ষে আমি তখন একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে গান করেছিলাম। সেই উপস্থিত মাননীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁদের নাম আমার হৃদয়ে এখনো স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত তাঁদের একজন ডক্টর সিন্হা ও তাঁর পত্নী মিসেস হেমনলিনী সিন্হা, আর একজন ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং তাঁর পত্নী মিসেস মৈত্র এবং কন্যা নোটন মৈত্র। এই পরিবারদ্বয়ের সঙ্গে একটা সময়ে আমার জীবন একসূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। এঁরা আমাকে সন্তানতুল্য ভালোবাসতেন। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা নোটন মৈত্র তার অসামান্য রূপের জন্য বিখ্যাত ছিল। বয়সে আমার চাইতে অনেকটা বড় থাকলেও আমরা অচিরেই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম। নোটনদি আমার কাছে ঠুংরি শিখতে আসত, পরে আমি আমার ওস্তাদ প্রফেসর গোল মহম্মদ খাঁকে তারও ওস্তাদ করে দিয়েছিলাম। সত্যি বলতে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ির জলসা আমার জীবনের এক পরম উদঘাটন। আমি স্বর্গে প্রবিষ্ট হয়েছিলাম। এইসব মানুষের সঙ্গ আমাকে যে কতো উঁচুতে উত্তীর্ণ করল, কত পরিণত করে ফেললো তার সীমা নেই। আমি বাংলা গান খুব বেশি জানতাম না, যা-ও দু-চারখানা–রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ জানতাম তা-ও ভুল সুরে। দিলীপদা আমার বাংলা গানের গুরু হলেন। প্রতিদিন সকালে সেই রমনা থেকে বনগ্রামে আমাদের বাড়ি চলে আসতেন, বেশিরভাগ দিন হেঁটেই আসতেন, যাবার সময় ঘোড়ার গাড়ি ডেকে দিতাম আমরা। মধ্যে মধ্যে বেশি বেলা হলে খেয়ে যেতেন। মা কতরকম রান্না করতেন সেদিন। দিলীপদার পছন্দ ছিল মাছপাতুরি, খেতে খেতে বলতেন, 'কক্ষনো এরকম জিনিস আর খাইনি। আমাদের বাড়িতে এ রান্নাটা জানে না।' আরও একটা কথা বলতেন, "আমার জন্য অত কিছু করবেন না, ডাল-ভাত খেলেও সেই খাবার আমার রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, তাই আমার যথেষ্ট।' বলতেন, কিন্তু নতুন নতুন পদ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। খেয়ে সমানে তারিফ করতেন। সেই তারিফটাই ছিল রাঁধুনির পুরস্কার। আমার মায়ের মুখ তৃপ্তিতে ভরে যেতে।

যে কোনো মানুষের যে কোনো গুণ দেখলেই তারিফ করা ছিল দিলীপদার চরিত্রের আসল বৈশিষ্ট্য। আমি খুব তাড়াতাড়ি গান তুলতে পারতাম, কথাগুলো সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ হয়ে যেত, তা নিয়ে কী প্রশংসা। বাচ্চা বয়েস থেকে হারমোনিয়ম বাজিয়ে বাজিয়ে আঙুল সচল হয়ে গিয়েছিল, এ নিয়েও দিলীপদা মুগ্ধ। এই মুগ্ধতা আমার উত্তরণ। এই মুগ্ধতাই আমাকে হারমোনিয়ম বাজাতে এতো উদ্বুদ্ধ করেছিল যে আমার আঙুলের তলায় সাদা-কালো রীডগুলো যেন বাতাসের মতো খেলা করত। তাদের নিয়ে আমি যা খুশি করতাম। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঝড়ের বেগে চলে যেতাম ঝড়ের বেগে ফিরে আসতাম। আমার ওস্তাদজি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন। প্রচণ্ড দ্রুত একটা তান দিয়ে বলতেন, 'পারবে এর সঙ্গে লড়তে? আমি বলতাম, পারব।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠকাবার জন্য তৎক্ষণাৎ লম্বা একটা কঠিন রাগের কঠিন পর্দার তান। ছাড়তেন। গলা যেন বিদ্যুৎ। আমিও প্রায় উপুড় হয়ে পড়ে সর্বশক্তি দিয়ে সেই তানের সঙ্গে মোকাবিলা করতাম। ওস্তাদজি বলতেন, 'সাব্বাস! জিতা রহ বেটি, জিতা রহ।'

দিলীপদার কাছে আমি অনেক গান শিখেছিলাম। তাঁর নিজের গান, দ্বিজেন্দ্রলালের গান, অতুলপ্রসাদের গান, এসব তো ছিলই। সবচেয়ে বেশি ছিল নজরুল ইসলামের গান। আমার গলাকে তিনি নানাভাবে খেলাতে শিক্ষা দিলেন। কখনো আস্তে, কখনো জোরে, কখনো মাঝামাঝি। কেমন করে কতটা গড়িয়ে মীড় দিলে লোকের মনে গিয়ে দাগ কাটে, কীভাবে গমক দিলে হৃদয় জেগে ওঠে, গানের ভাষাটাকে কেমন করে অর্থবহ করে তুলতে হয়, সব শিক্ষাই আমার তাঁর কাছে। ঐ মার্জিত শিক্ষিত পরিপূর্ণ যুবকটির কাছে আমার শুধু গানের শিক্ষাই হয়নি, কালচার শব্দের অর্থটাও আমি তাঁকে দেখেই 'প্রথম' জেনেছিলাম। মাঝে মাঝে সত্যেন বসুর বাড়িতেও গান শেখানোর আসরটা বসাতেন তিনি। সত্যেনদাই এই পরামর্শটা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তুমি তো তোমায় বাবার সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ কর শুনেছি, তা ভ্রমণ করতে করতে এখানে চলে এসো, এখানেই প্রাতরাশ হবে একসঙ্গে, দিলীপ এখানেই গান শেখাবে, তারপর বাড়ি ফিরে যাবে।

সে কথাই শিরোধার্য করে মধ্যে মধ্যেই চলে যেতাম সত্যেনদার বাড়ি। তখন সত্যেনদার স্ত্রী সেখানে ছিলেন না। সত্যেনদার মা ছিলেন আর বোন মন্টু ছিল। সত্যেনদার মা খুব আদর করতেন আমাকে। খাওয়ার বিষয়ে আমার অনীহা দেখে এটা-ওটা করে খাওয়াতেন। আমার বাবাকে বলতেন, 'আপনার মেয়ে বড় রোগা, খেতে চায় না, কদিন আমার কাছে এখানে রেখে দিন, দেখবেন আমি মোটা করে দেব।'

এরকমই একদিন গিয়েছি, বোধ হয় কোনো ছুটির দিন ছিল, প্রাতঃভ্রমণ নয়, একটু বেলাতেই গিয়েছি। বেলা মানে আটটা। আমি আর বাবাও গেট দিয়ে ঢুকছি, দেখলাম দিলীপদাও একটি সদ্যযুবকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গেটের কাছে এসেছেন।

যুবকটিকে বিদায় দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'কী রকম কবি কবি চেহারা করে ফেলেছে দেখেছ?

আমি বললাম, কে? দিলীপদা বললেন, দেখলে না? তোমার পাশ দিয়েই তো বেরুলো। চেন না?

'না তো।'



'বলছ কী! ঢাকার মেয়ে আর ঢাকার সবচেয়ে সেরা ছেলেটিকেই চেন না? বুদ্ধদেব বসুর নাম শুনেছ তো? না কি তা-ও জান না? 'ওমা, এই নাকি বুদ্ধদেব বসু? আমি একেবারে সচকিত। এর আগে দ্যাখোনি কোনোদিন? আলাপ নেই?

"ঠিক আছে আমি একদিন আলাপ করিয়ে দেব। দুর্দান্ত ছেলে।

উৎফুল্ল হলাম। আমি জানতাম পুরানো পল্টনে একটা টিনের ঘরে বুদ্ধদেব বসু থাকে প্রচণ্ড আড্ডা হয় সেখানে। আড্ডার সদস্য– পরিমল রায়, অমলেন্দু বসু, মন্মথ ঘোষ, অনিল ভট্টাচার্য, অজিত দত্ত, সুকুমার বসু ইত্যাদি, এঁরা সকলেই বিশেষ, তখন বিশেষ ছিলেন পরবর্তী জীবনেও বিশেষ। এই বিশেষ দলটি ঢাকার যুবক-যুবতীদের কাছে আলোচনার বিষয়। 'একখানা হাত' কবিতাটি লিখে বুদ্ধদেব আমাদের মনে অনেক রোমাঞ্চ জুগিয়েছেন, রমাকে আমন্ত্রণ পড়ে সকলেরই 'রমা হবার সাধ হয়েছে। অজিত দত্ত আর বুদ্ধদেবের সম্পাদনায় প্রগতি বেরুচ্ছে তখন। বুদ্ধদেবের দেব আর অজিত দত্তর দত্ত মিলিয়ে দেবদত্তের নামে অনেক লেখা বেরুচ্ছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা পুরানো পল্টনের মাঠে বেড়াতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুর আড্ডাখানা এবং বাসস্থান টিনের ঘরটাও দেখে এসেছি, উঁকিঝুঁকিও মেরেছি। সেই বুদ্ধদেব বসুকে দেখেও দেখলাম না সেটা যতো দুঃখ তার চেয়ে অনেক বেশি সুখ হলো দিলীপদা তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন জেনে।

সময় খুব অদ্ভুত ব্যাপার। কখনো পাঁচ মিনিট সময়কেও পাঁচ বছরের মতো দীর্ঘ মনে হয়, কখনো পাঁচ বছর সময়কেও পাঁচ মিনিটের মতো মনে হয়। দিলীপদা যে খুব কম দিন রইলেন তা নয়, কিন্তু যখন তার ফিরে যাবার সময় হলো মনে হলো চোখের পলক। যখন সত্যি চলে গেলেন খুব মন খারাপ হয়ে গেল। সারাদিনের মধ্যে যেন কোনো প্রত্যাশাই রইল না, কোনো কাজই রইল না।

ইতিমধ্যে আমি স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমাদের ক্লাস-টিচার পুজোর ছুটিতে ভ্রমণ বিষয়ে একটা রচনা লিখতে দিয়েছিলেন। ছুটির পরে যখন আবার স্কুলে গেলাম, তিনি রচনা দেখতে চাইলেন। আমার রচনা পড়তে পড়তে কড়া চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কাকে দিয়ে লিখিয়েছ? মুখের চেহারা দেখে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আমি নিজে লিখেছি।'

'আবার মিথ্যে কথা বলছ?'

'মিথ্যে কথা। আমি স্তম্ভিত। কী জবাব দেব ভেবে পেলাম না। উনি খাতাটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, তোমাকে আমি নিজে লিখে আনতে বলেছিলাম, বড়দের দিয়ে লেখাতে বলিনি।'

কম্পিত কণ্ঠে বললাম, 'আমি তো বড়দের দিয়ে লেখাইনি।

'ওঠো, উঠে দাঁড়াও। মিথ্যে ব্যবহার করেছ আবার মিথ্যে কথাও বলছ। এই পিরিয়ডের জন্য এই তোমার শাস্তি।'

কী নিষ্ঠুর মহিলা। দুঃখে লজ্জায় আমার বুক ফেটে গেল। কী কষ্টে যে সেদিন আমি সারাবেলা স্কুলে কাটিয়েছিলাম সে শুধু আমিই জানি। বাড়ি ফিরে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে। হেঁচকি তুলে তুলে কেঁদেছিলাম। মা-বাবা দুজনেই আমার কষ্টে ততোধিক কষ্ট পেয়ে স্কুল ছাড়িয়ে দিলেন। আমি বেঁচে গেলাম। স্কুলে যেতে আমার একটুও ভাল লাগত না।

বনগ্রামপাড়াটা বড্ডই নিম্ন মধ্যবিত্ত পাড়া। মেলামেশার লোক বলতে গেলে ছিলই না সেখানে। বিশেষত আমার বয়সী কোনো মেয়ে। বন্ধুর অভাবে আমি নিঃসঙ্গ বোধ করতাম। দিলীপদা একটা ঢেউয়ের মত বয়ে গেলেন আমার জীবনে। দিলীপদা থাকতে আজ এখানে গান কাল সেখানে গান, এখানে খাওয়া, সেখানে যাওয়া এইসব করে করে কী সুন্দর কেটে যেত দিন। দিলীপদা চলে যাবার পরে সেই দিন আর কাটতেই চায়। দিলীপদা যে চলে গেছেন সেই দুঃখ আর যেতে চায় না।

বিকেলবেলাটা আমার কোনো দিনই ভালো লাগে না। সন্ধ্যা হয়ে আসে আসে সময়টাতে কেন যে আমার মন বিষাদে ভরে যায় কে জানে। তেমনই এক বিষণ্ণ-বিকেলে মন খারাপ করে দোতলার ঝোলানো বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। একটি ফিটন এসে আমাদের দরজায় থামল। যাক, কেউ এসেছে। নির্জন বিকেলের দারুণ কষ্ট এবার কিছুটা উপশম হবে। খুশি হয়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দরজা খুলে দেখলাম, বাঙালীর তুলনায় একটু বেশিই স্বাস্থ্যবান এবং সুশ্রী এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়, এক মুখ হেসে গায়ের গেরুয়া চাদর সামলাতে সামলাতে আমাকে ঠেলেই প্রায় ঢুকে এলেন ঘরে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমিই নিশ্চয় মানু? বল ঠিক ধরেছি কি না? তুমিই মন্টুর ছাত্রী তো?' মন্টু মানে দিলীপদা। দিলীপদার ডাক নাম মন্টু।

আমার বুকটা ধড়াস করে কেপে উঠল। মনে মনে বললাম, 'তবে কি ইনিই তিনি?'

আমি নজরুল ইসলামকে কখনো দেখিনি। তাঁর কথা শুনেছি অনেক কিন্তু চেহারার বর্ণনা কেউ দেয়নি। তবু খুব আশ্চর্যভাবেই মনে হলো এর নামই নজরুল ইসলাম। আমি রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'আপনি—আপনি কি-'

'আমি নজরুল ইসলাম।' খোলা গলায় হাসলেন। নজরুল ইসলামের বয়েস তখন বত্রিশ-তেত্রিশ অথবা কিছু বেশি। যৌবন তার চোখে-মুখে, সারাক্ষণ হাসিতে সমস্ত শরীরে নদীর স্রোতের মতো বহমান, বেগবান। সেই বয়সে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন শুধু তাঁদেরই বোঝানো যাবে কী দুকূলপ্লাবী আনন্দধারা দিয়ে গড়া তার চরিত্র। মস্ত বড় বড় কালো টানা চোখ, এলোমেলো ঘন চুলের বাবরি, তীক্ষ্ণ নাসিকা, ঘষা তামার মতো রং, সহজ সরল অদাম্ভিক ব্যবহার, উদ্দাম হাসি, উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, সবটা মিলিয়ে একটা ব্যক্তিত্ব বটে। আর তাঁর ধুলোয় লুটিয়ে পরা গেরুয়া চাদর!

ওর ঢাকা আসার গল্পটাও ওঁর চরিত্রের উপযোগীই ছিল। উনি নাকি ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছিলেন গড়ের মাঠে। ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান নিয়ে বেদম তর্ক করতে করতে কোন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে চলে এসেছেন শিয়ালদহ স্টেশনে। দেখলেন ঢাকা মেল দাঁড়িয়ে আছে ছাড়ার অপেক্ষায়। অমনি মনে হলো, মেলটা যখন দাঁড়িয়ে আছে একবার ঢাকা গিয়ে বেড়িয়ে এলে তো হয়। যেই ভাবা অমনি কাজ। তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে উঠে পড়লেন। কিছুদিন আগে দিলীপদা এসে ঘুরে গেছেন, ফিরে গিয়ে অনেক গল্প করেছেন, তখন থেকে কৌতূহল। এই স্বর্ণসুযোগ কি আর ছাড়া যায়?

আমি যে দেখেই নজরুল ইসলাম বলে মনে করতে পারলাম তার একটা কারণ ছিল। ঝাপসা ঝাপসা শুনেছি নজরুল ইসলাম নাকি ঢাকা এসেছেন। ঠিক খবর কেউ বলতে পারছিল না। নজরুল ইসলামের গানে তখন সারা দেশ পাগল। যার কোনো সুর নেই সেও মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আবেগ সহকারে 'কে বিদেশী বন উদাসী' টানে। তাছাড়া



একটা লড়াই ফেরতা লোক তো বটে। বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা দিয়ে ফাটিয়ে দিচ্ছেন দেশ, ছেলেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে, গাইতে গাইতে জেলের ফটকে ঢুকছে, প্রেমের গান গেয়ে এ-দিকে আমিও রাতারাতি এতে নাম কিনে ফেলেছি যে ভক্তসংখ্যা প্রায় অগণন।

নজরুলের কোনো সংলাপের বালাই আছে বলে মনে হলো না। বসবার ঘরে একটা তক্তপোশ পাতা ছিল, না বলতেই বসে পড়লেন সেখানে। মা-বাবাও এসে দাঁড়িয়েছেন দরজায়, তাঁদের আপ্যায়ন করে বললেন, 'আসুন আসুন। আপনাদের কথা আমি সব শুনেছি মন্টুর কাছে। কিছু অচেনা মনে হচ্ছে না। পরশু এসেছি বুঝলেন? আমার বন্ধু আছে এখানে, তার বাড়িতে উঠেছি। কাজী মোতাহার হোসেন, সে তো আপনাদের ভীষণ চেনে। মন্টুর সঙ্গে অনেকদিন এসেছে। এসে থেকেই বলছি, চল চল, আগে ঐ মেয়েটির গান শুনি, মন্টু বলেছে সে নাকি আমার গান এতো সুন্দর করে গায় যে তার জন্য আমিই বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছি বলতে বলতে কী হাসি। ঘর একেবারে ভরে গেল। হাসি থামলে বললেন, লেখাপড়ার লোকদের যা হয়, এখন বন্ধুর কলেজ, তখন বন্ধুর ছাত্র আসার সময়, এখন অমুক বইটা শেষ না করে নড়তে পারছে না—ঐ বন্ধুর ভরসা ছেড়ে নিজেই দেখুন কেমন বাড়ি চিনে চলে এলাম।'

এই মানুষের আগমনে মা-বাবা বিহ্বল। কী করবেন ভেবে পান না। বসার ঘর থেকে দোতলার ঘরে নিয়ে এলেন। একটু বাদেই হরমোনিয়ম বেরুলো। তারপর গান আর গান আর গান। দিলীপদার কাছে ওর যতো গান শিখেছি সব শোনানো হলো। মাথা নাড়ছেন আর বলছেন, অভোলন অভোলন।

নজরুল ইসলামের গানের গলাটা ভাঙা ভাঙা ছিল। সেই ভাঙা ভাঙা স্বরটাই ছিল ওঁর কণ্ঠস্বরের আসল বৈশিষ্ট্য। কী মিষ্টি সে সুর, কী মনমাতানো ! তবে গানের সময়ে তাঁকে দেখাও গানের একটা অঙ্গ। সুরের তরঙ্গে তাঁর সারা শরীর যেন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠতো। চোখের মণি জ্বলজ্বল করত, গানের প্রতি ভালোবাসার আবেগ লাবণ্যের আধার হয়ে ধরা দিত। গানের প্রাণ যেন মূর্ত হয়ে সারা ঘরের সব আবহাওয়াকে আনন্দসাগরে ভাসিয়ে রাখতো। আমার মা-বাবা দুজনেই সংগীতপিপাসু, নজরুলেরও যেমন গান পেলে সময়ের জ্ঞান থাকত না, আমার মা-বাবাও তাই। প্রথমদিনের পরিচয়েই নজরুল তাঁদের সময়ের কথা ভুলিয়ে দিয়ে একান্ত কাছের মানুষ হয়ে গেলেন, কখন ঘড়ির কাঁটা বেলা 'ছ'টা থেকে রাত দশটায় এসে কাঁপতে লাগল কারোই মনে রইল না সে কথা।

নজরুল ইসলামের স্মৃতি মানেই হাতে হারমোনিয়ম, পাশে বাটাভরা পান, ভাসা ভাসা গলায় আশ্চর্য সুর। মুখে একই সঙ্গে হাসি আর গান এবং তা অনর্গল। সেদিন চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ একটা আনন্দের সতেজ হাওয়ায় ঘরটা ভরে থাকলো।

পরের দিন সকালেই আবার এলেন। এটা আমরা আশা করিনি। একেবারে ছটফট করতে করতে এসেছেন। রাত জেগে নতুন গান লিখেছেন তিনি, না শিখিয়ে থাকতে পারছেন না। এসো এসো শিগ্গির এসো, হারমোনিয়ম নিয়ে বোসো। আমরা তখন সবে, চা খাচ্ছি, আমার চেহারায় তখনো ঘুম ঘুম ভাব। বসে গেলেন সঙ্গে। 'দিন দিন 'তাড়াতাড়ি চা দিন। বেলা বাড়বার আগেই পালিয়েছি। উঃ কী করে ছেলেগুলো! ওদের পাল্লায় পড়লে উপায় আছে, ঠিক কোথাও না কোথাও ধরে নিয়ে যাবে। রাত্তিরে একটা গান লিখেছি সুরটা তুলে নাও তাড়াতাড়ি, আবার ভুল হয়ে যাবে।'

সকালটা ঝক্ ঝক্ করতে লাগলো। আবার হারমোনিয়ম আবার পানের বাটা আবার ঘনঘন চা। গানটা হলো আমার কোলে আজ ভিড়লো তরী, এ কোন সোনার, গাঁয়/ভাটির টানে আবার কেন উজান যেতে চায়। দেখা গেল তখন তার বয়ান সঠিক নয়, সুরেরও হেরফের হচ্ছে। ঠিক করছেন গাইতে গাইতে, শেখাতে শেখাতে।

অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন তখন বর্ধমান হাউসে ছিলেন। অত্যন্ত ভালো মানুষ। দিলীপদার সঙ্গে দুচারদিন এসেছেন আমাদের বাড়ি। দাবা খেলতে খুব ভালোবাসতেন। দিলীপদা চলে যাবার পরে নিজেই আসতেন, আমার মা-বাবার সঙ্গে একটা বিশেষ সৌহার্দ্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল। নজরুল তাঁর বাড়িতেই উঠেছেন। সেইখান থেকে খুব ভোরে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসতেন। বলতেন 'মর্নিংওয়াক হয়ে যাচ্ছে নিজে থেকে। মনে মনে একটা গান তৈরি করতে করতে হাঁটি, কখন যে পথ ফুরিয়ে যায় বুঝতেই পারি না। যে মানুষ যুদ্ধে গিয়েছেন, জেল খেটেছেন, জেলের নিঃসঙ্গ কুঠুরির অন্ধকারে নির্বাসিত হয়েছেন, অনশন করেছেন, গায়ে গেরুয়া চাদর, মাথায় গান্ধী টুপি আর খদ্দরই যার একমাত্র ভূষণ–সেই মানুষই আবার কবিতার কম্পন সঙ্গীতের ঝঙ্কারে পাগল করে দিচ্ছেন মানুষকে। তাঁকে নিয়ে যে দেশ উন্মত্ত হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কী? এসেছিলেন দু'চার দিনের জন্য কৌতূহল মেটাতে কিন্তু থেকে গেলেন অনেকদিন। আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য হলো, একাত্ম হলো অচিরে, আমাদের বাড়িরই আর একজন মানুষ হয়ে গেলেন।

নজরুল ইসলাম ঢাকা থেকে কলকাতা ফিরে যাবার দু-চার মাসের মধ্যে আমাকেও কলকাতা আসতে হলো। আমি গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে বছরে ছ'খানা রেকর্ড মানে বারোখানা গানের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলাম। সেটা ওকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, সেই অনুসারে উনি চুঁচুড়ায় আমার পিসিমার বাড়িতে এসে দেখা করলেন আমার সঙ্গে। আমি চুঁচুড়াতেই উঠেছিলাম। বললেন, 'আমার গান রেকর্ড করো।' আমি নিজেও সেটা ঠিক করে এসেছিলাম। নজরুল ইসলামের প্রায় সমস্ত গানই তখন আমার কণ্ঠস্থ। এখানে ওখানে সেখানে সর্বত্রই আমি ওর গান গেয়েই খুশি করি সকলকে। কোম্পানী কর্তাকে বললাম সে কথা। শুধু তাই নয়, আমার ট্রেইনার হিসেবেও যেন ওকেই নিযুক্ত করা হয় সেই অনুরোধও করলাম। আগ্রহের সঙ্গেই সেই অনুরোধ রক্ষা করলেন তিনি। আমরা সেবায় বেশ কয়েক মাস ছিলাম চুঁচুড়াতে। উনি প্রায়ই এসে ওখানে থাকতেন। আমি আর মা ওঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতাম। উঠতাম নলিনীকান্ত সরকারের বাড়িতে।

নলিনীকান্ত সরকার নজরুলের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, রাজনীতিক, সাংবাদিক এবং সংগীতজ্ঞ। সেই সূত্রেই আমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এই বাড়ি ছাড়া অন্যত্র ওঠার কোনো প্রশ্ন তো ছিলই না, বরং বেশিদিন না এলেই চিঠি পাঠাতেন। 'অবিলম্বে চলে এসো, খুব দরকার।' কী যে দরকার তা তো জানি। শুধু আড্ডা আড্ডা আর আড্ডা। কী প্রচণ্ড আড্ডার বাড়ি ছিল যে সেটা! কতো লোক যে আসতেন সেখানে। আর গান।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে আমি সেখানেই দেখেছিলাম। উনি এলেই নজরুল ইসলাম ফুর্তিতে টগবগ করে বলে উঠতেন, 'দা'ঠাকুর এসে গেছে। দে গরুর গা ধুইয়ে।' ব্যস, আর কথা নেই। অহোরাত্র গানের ব্যবস্থা পাকা।



নজরুল ইসলাম যেমন এই একশো, তেমনি এক নলিনীদার বাড়িই সকলের বাড়ি। তার মধ্যে দা ঠাকুরের আগমন হলে তো কথাই নেই। ফোয়ারার মতো আনন্দে উচ্ছ্বসিত হতে থাকতো। নজরুল ইসলাম আর নলিনীদা আমাকে একদিন রেডিওর আপিসে নিয়ে গেলেন। রেডিও তখন সরকারি আপিস নয়। নিয়ম-কানুনের বিশেষ ধার ধারা হতো না। নৃপেন মজুমদার ছিলেন কর্ণধার। তাঁর অনুরোধেই ওঁরা আমাকে গানের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখন সর্বত্রই নজরুল ইসলামের গান গেয়ে বেড়াই। সেখানেও নজরুলের গানই গেয়েছিলাম। পরের দিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে খুব বাহবা বেরুলো। অবশ্য সেই বাহবাতে আমার নিজের কতোখানি অবদান সেটা বিচার্য বিষয়। গান তখন এসব ক্ষেত্রে বলা যায় প্রায় পেশাদার স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ভদ্রঘরের মেয়েদের নাম হাতের এক আঙুলের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত। তার উপরে নজরুলের গানের চাহিদাও খুব বেশি। বাংলা শব্দের বন্ধনে উনি সুমিষ্ট উর্দু ভাষার সুমিষ্ট গজলের সুর আরোপ করে এক নতুন চমকের সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেনের পরে কম্পোজার হিসেবে তাঁর নাম তখন সকল সংগীতপিপাসুর মুখে মুখে। বস্তুত যুগপৎ রচয়িতা এবং সরকার হিসেবে এই ধরনের গানে তিনি অবশ্যই অনন্য। সুতরাং এই বাহবার অংশীদার নিশ্চয়ই আমি একা ছিলাম না। সমবেতভাবেই সেটা পেয়েছিলাম। আমার পৈতৃক পদবি সোম। কোনো কাগজ লিখেছিল এমন কণ্ঠ কি তার পদবির গুণেই সম্ভব হলো? নজরুল আর নলিনীদার খুশি দেখে কে? বললেন, –"ঈশশ! পদবির জোরেই যার এই অবস্থা, সেই সোমরস পান করতে পারলে না জানি কতো আনন্দ হতো।"–

হঠাৎ নজরুল খুব কীর্তন লিখতে শুরু করলেন। অবশ্য সেই অনুপ্রেরণার একটি নির্দিষ্ট কারণ ছিল। আমাদের পরিচারিকা নজরুলকে দেখে বলেছিল, 'ওমা এ যে একেবারে কালো কৃষ্ণ গো।' সেটা শোনার পর থেকে পিসিমা সব সময়েই কালোকৃষ্ণ বলে ঠাট্টা করতেন। উনিও পিসিমাকে খাঁদানাক বলে খ্যাপাতেন। পিসিমা জবাবে বলতেন, 'তা যাই বলো বাপু, খাঁদাই হই আর যাই হই, রংখানাতো তোমার চেয়ে গোরা।' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, –"নাও মেলাও, পরখ করে দ্যাখো একবার–"

একদিন নজরুল বললেন, "নাহ্ কালোরূপের যে কতো গুণ সেটা আর না দেখালে নয়।" সেই রাত্রেই কীর্তনের সুরে এই গানটি লিখলেন তিনি,

'কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া, কাঁদিয়া, কাঁদিয়া গো
যত ভুলি ভুলি করি ততো আঁকড়াইয়া ধরি
ততো মরি সাধিয়া সাধিয়া সাধিয়া গো।
শ্যামের সেরূপ ভোলা কি যায়?
নিখিল শ্যামল যার শোভায়।
আকাশে সাগরে বনে কান্তারে
লতায় পাতায় সে রূপ ভায়।
(আমি) বধূর রূপের ছায়া বুকে ধরি
আকাশ আরসি নীল গো
বহে ভুবন প্লাবিয়া কালোরে ভাবিয়া
কালো সাগর সলিল গো।
যদি একাকিনী চলি বনতলে

সে যে ছায়া হয়ে পিছে পিছে চলে
যদি ফুল হয়ে ফুটি তরুশাখে।
সে যে পল্লব হয়ে ঘিরে থাকে—'

সমস্ত গানটা আমার মুখস্থ নেই, যতোটা মনে পড়লো তুলে দিলাম। হয়তো কিছু ওলোট-পালটও হলো। তবু এতোটা এজন্যই লিখলাম, কী সুন্দর কথা আর কী সুন্দর গান সেটা জানাবার জন্য। একটা সময়ে আমি কীর্তন ও পালা ধরে ধরে শিখেছিলাম। নৌকাবিলাস গেয়ে অনেক আসরে অনেক শ্রোতাকে সুখীও করতে পেরেছি। চিত্তরঞ্জন দাশের কন্যা সুপর্ণা রায়ের ব্রজমাধুরী সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম। অপর্ণাদির অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম আমি। তাঁর আসরে আমার নিজেরও যেমন একদিন অনুপস্থিত থাকলে খারাপ লাগতো তিনি নিজেও সেটা পারতপক্ষে হতে দিতে চাইতেন না। এঁরই সুযোগ্য পুত্র আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এখন আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত।

কীর্তন প্রসঙ্গে আমার আরো একজন ভগমান্য সন্ন্যাসিনীকে মনে পড়ে গেল। তিনি হলেন আনন্দময়ী মা। তাঁকে যখন আমি প্রথম দেখেছিলাম তখন আমি যেমন অতি অল্পবয়সী একটি মেয়ে, তিনিও তখন একজন অতি লজ্জাবতী যুবতী ঘোমটা টানা বধূ। কিন্তু বিশেষ এ সময়েই ঢাকা শহরে অনেকেই তাঁকে চিনেন জানেন এবং শিষ্য। বনগ্রাম আর যুগীনগরে অত্যন্ত কাছাকাছি দুটো পাড়া। যুগীনগরে নিশিকান্ত মিত্র নামে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাস ছিলো। তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা শৈল আমার কাছাকাছি বয়সের বন্ধু ছিল। একদিন দুপুরে ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি একতলাটা একেবারে খালি, এখনো কেউ নেই। ভাইবোনরা ওরা সব সময়ে একতলাতেই থাকতো, একতলাতেই সব বন্ধুবান্ধবীর আড্ডা। আমি ভাবলাম এরা গেল কোথায়? কেউ কি বাড়ি নেই? আস্তে আস্তে ঘর পেরিয়ে দোতলার সিঁড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে ভাবলাম একা একা উপরে উঠে যাওয়া ঠিক হবে কি না। এই সময়েই আমি আমার বন্ধুকে নিচে নেমে আসতে দেখলাম। সে এসে খুব নিচুগলায় বলল, 'লিলিদির ছেলের খুব অসুখ। যায় যায় অবস্থা। শা-বাগের গণ্ডি কেটেছেন। বাড়ির সকলের মন খুব খারাপ।

লিলিদি শৈলর দিদি। লিলিদিকে আমার খুব সুন্দর লাগতো। ছিপছিপে চেহারা, ফর্সা রং, কোমর ছাপানো চুল। নববিবাহিতই বলা যায়। ঐ তার প্রথম পুত্র, বয়েস কতো জানি না, তবে কোলের শিশু। এক দু'বছর হবে হয়তো।

লিলিদির ছেলে লিলিদির মতোই সুন্দর। তার অসুখ জেনে এবং অবস্থা খারাপ জেনে আমারো মন খুব খারাপ হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, 'শা-বাগের মা কে? তিনি কিসের গণ্ডি কেটেছেন? শৈল বললো, "শা-বাগের মায়ের নাম জানো না? আমরা সবাই তার শিষ্য। শা-বাগে মায়ের আশ্রম। মায়ের সঙ্গে বাবাও এসেছেন। তিনিও আছেন। যমকে আসতে দেবেন না মা, সেজন্যই গণ্ডি কেটেছেন।'

ঢাকা রমনার কাছাকাছি শা-বাগ বলে ধু-ধু প্রান্তর মস্তবড়ো একটা জায়গা ছিল। সম্ভবত আমবাগান। এখন ভালো মনে নেই। সেই জায়গায় সুন্দর একখানা মাটির কুটিরে মা আর তাঁর স্বামী বাস করতেন। নিশ্চয়ই কোনো শিষ্যই এই বাগে এই কুটির বেঁধে



দিয়েছিলেন। সেই বাগে থাকেন বলেই ঢাকার লোকেরা তাঁকে শা-বাগের মা বলতো। পরবর্তী জীবনে তিনিই আনন্দময়ী মা হন।

খুব নিঃশব্দে শৈলর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। গণ্ডিকাটা কথাটাও যতো কৌতূহলের উদ্রেক করেছিল, যে মা সেই গণ্ডি কেটেছেন তাঁকে দেখার আগ্রহও ততোই প্রবল হয়ে উঠেছিলো। দোতলায় উঠে টানা বারান্দা, বারান্দার পাশে পাশে সব ঘর। একতলার মতোই। উঠতে উঠতে মাকে দেখতে পেলাম। শেষ সিঁড়ি পর্যন্তও উঠতে হলো না। ডাইনের প্রথম ঘরখানাতেই একটি খাটের উপরে লিলিদির ছেলে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে, মা বসে আছেন শিয়রে, থুতনি পর্যন্ত ঘোমটা টানা। দু তিন সিঁড়ি নিচে থেকেই মায়ের ঘোমটা-ঢাকা মুখটা আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ধবধবে ফর্সা কপালে টাকার মতো বড়ো একটা সিঁদুরের টিপ জ্বলজ্বল করে সাধব্যের সাক্ষী দিচ্ছে। মোটা-সোটা বাবা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। আরো দু একজন যেমন লিলিদি নিজে, তাঁর মা বাবা শোকার্ত অথচ আশান্বিত মুখে দূরে কাছে প্রতীক্ষারত। শৈল বললো, মা যতোক্ষণ এভাবে বসে আছেন ততোক্ষণ মৃত্যু ওকে ছুঁতে পারবে না। যদি বেলা চারটে পর্যন্ত এভাবেই কেটে যায় তবেই ও বাঁচবে। আমি নেমে এলাম, বাড়িও ফিরে এলাম। লিলিদির ছেলের জন্য মন কেমন করতে লাগলো। মায়ের গণ্ডিতে যেন যমদূত কোনোভাবেই প্রবিষ্ট হতে না পারে সে জন্যও প্রার্থনা করতে লাগলাম।

লিলিদির ছেলেকে ঢাকার সমস্ত বড়ো বড়ো ডাক্তাররাই চিকিৎসা করেছিলেন। জানি না কার দয়াতে সে যাত্রা লিলিদির ছেলে বেঁচে গেল। তার অনতিকালের মধ্যেই সে বাড়িতে একটা উৎসব হয়েছিল। কী কারণে সেই উৎসব এতোকাল বাদে সে কথা আর আমার মনে আসছে না। সেখানে আমরা নিমন্ত্রিত ছিলাম। মাকে আবার দেখলাম। মস্ত আসর পাতা ঘরে বহুলোকের মধ্যস্থলে তিনি বসে আছেন। বোধহয় সকলেই শিষ্য সেবক। আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে হারমোনিয়ম দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হলো, মাকে কীর্তন শোনাতে হবে। মা বড়ো বড়ো শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আমি গান আরম্ভ করলাম। পালা ধরেই গাইতে শুরু করেছিলাম, অর্ধেক-পর্যন্ত আসতেই, তাঁর ভাবসমাধি হলো। তাঁকে ওরকম অজ্ঞানের মতো হয়ে পড়ে যেতে দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, সেই ইঙ্গিতে গান থামাতে বারণ করলেন। এই ভাবসমাধি শব্দটা তাঁরাই উচ্চারণ করে বললেন, 'গান শুনতে শুনতেই আবার জ্ঞান ফিরে আসবে।'

এই ঘটনার পরে মা আমাকে চিনে রাখলেন। তাঁর নির্দেশেই আরো দুবার আমি তাঁর আশ্রমে তাঁর ভূমিশয্যার বিছানায় গিয়ে তার সঙ্গে বসবার অধিকার পেয়েছিলাম। তাঁর ইচ্ছে অনুসারে সেখানে বসেই গান করতে হলো।

গান শুরু হলেই দেখতাম ধীরে ধীরে তাঁর বড় বড় চোখ দুটি বন্ধ হয়ে যেতো। মুখে একটা নরম অতি মৃদু হাসি ফুটে উঠতো, কোনো এক অভাবিত অজানিত অনুভবের মধ্যে ডুবে যেতেন, সমস্ত শরীর একেবারে নিস্পৃহ হয়ে থাকতো।

নজরুল ইসলাম অন্ধকারেও চোখে দেখতে পেতেন। এই ক্ষমতা তাঁর জেলের 'সেলে' আবদ্ধ থাকার সময়ে আয়ত্ত হয়। অন্ধকারে ঠিক বই পড়তে পারতেন কিনা জানি না

তবে লিখতে কোনো অসুবিধে হতো না। এই কীর্তনটি তিনি রাত জেগে অন্ধকারে বসেই লিখেছিলেন। আমাদের চুঁচুড়ার বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না, ঘুমের আগে সব আলো নিভিয়ে শোওয়া হতো। রাস্তায়ও বিদ্যুৎ ছিল না, দূরে দূরে গ্যাসপোস্ট থাকতো, তার আলো খুব নরম। কাজেই ঘরের আলো নিভে গেলে ঘোর অন্ধকারে ছেয়ে যেতো চার দেওয়ালের পৃথিবী। সেই অন্ধকারে তিনি কী করে সমস্ত লাইন সমানভাবে সাজিয়ে লিখতে পারতেন ভেবে খুব অবাক হতাম। শুধু ঐ কীর্তনই নয়, আমাদের কাছে থাকাকালীন বহু গান তিনি রাত্রি নিঃশব্দ হলে, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নির্জন অন্ধকারে বসে সুর করে লিখেছেন। আর সকালে উঠেই চ্যাঁচামেচি 'এসো এসো তাড়াতাড়ি এসো, শিগ্গির সুরটা তুলে নাও হারমোনিয়মে–'

যদি বলতাম, 'কী করে মানুষ অন্ধকারে দেখতে পায়–' হাসতে হাসতে অস্থির হয়ে বলতেন, "না না অন্ধকারে দেখবো কেন, মা যে একটা লণ্ঠন ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। তাই না মা?"

মা মানে আমার মা। মা চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে হাসতেন।

এরপরেই কীর্তনে পেয়ে বসলো ওঁকে। পর পর তিনটি কীর্তন লিখলেন। শেখানো হয়ে গেলে বললেন, 'চলো, কলকাতা চলো, এবার। আমাদের কীর্তনের আসর বসাতে হবে নলিনীদার বাড়িতে। ঈশশ, মন্টু নেই, কী মজাই হতো তবে।'

মন্টু মানে দিলীপদা ততোদিনে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য হয়ে পণ্ডিচেরী নিবাসী হয়েছেন। লোকেরা বলতো উনি সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছেন। মনে আছে খবরটা পেয়ে খুব কেঁদেছিলাম। পণ্ডিচেরী যাবার আগে ঠিকানা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন একটা। আমার মন খারাপের জবাবে ঠাট্টা করে লিখলেন, 'ভয় পেয়ো না, আমি তেমন সন্ন্যাসী নই, যে। তোমাদের ভুলে গায়ে ভস্ম মেখে চিমটে হাতে গিরিগুহার অন্তরালে বসে দিনযাপন করছি। এখানে খুব আনন্দ, খুব শান্তি, খুব আড্ডা। রাতদিন বসে বই পড়ি, বই লিখি, গান গাই। আসবে নাকি একবার?'

নজরুল তাঁকে নিয়ে গান লিখেছিলেন 'সাজিয়াছ যোগী, বল কার লাগি, তরুণ-বিবাগী।'

তখনকার গানের আসরগুলোতে খুব আনন্দ ছিল। টিকিট কেটে রসিক-বেরসিক যে কোনো লোক ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকতো না। শুধুমাত্র রসিকদেরই আমন্ত্রণ জানানো হতো। গায়ক-গায়িকা আর শ্রোতার মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠতো। একবার নলিনীদার বাড়িতে বড় সুন্দর একটি আসর হয়েছিল। সেই আসরে ঠুংরি গায়ক অনাথনাথ বসু গান করেছিলেন। আশ্চর্য হারমোনিয়ম বাদক আফতাউদ্দীন খাঁও হারমোনিয়ম বাজিয়েছিলেন। অনাথনাথ বসু দুরকম গলাতেই গান করতে পারতেন। পুরোমাত্রায় মেয়েদের গলায় এমন আশ্চর্য ঠুংরি গাইতেন যে কল্পনা করা যেতো না এই গান কোনো ওস্তাদ গায়িকার গলার গান নয়। প্রথমে আফতাউদ্দীন খাঁ হারমোনিয়ম বাজালেন, তখনি মধ্যে মধ্যে অন্য একটা সুর যেন ভেসে আসছিল। ঠিক বোঝা যাচ্ছিল। সবাই ভাবছিলাম এটা আফতাউদ্দীন খাঁর বাজনারই কোনো নতুন কৃতিত্ব। তারপরে অনাথনাথ বসু ঠুংরি ধরলেন। সেই সঙ্গেও মধ্যে মধ্যে সেই সুর ভেসে এলো। আমিও ঠুংরি গাইলাম, সেই সুর তখন আরো স্পষ্ট। রাত গভীর হতে দেখা গেল সেই সুর শুধু স্পষ্টই নয়, রীতিমতো অনুকারকের মতো অথবা সঙ্গী গায়কের মতো সমানে



সমানে শিস দিচ্ছে। যখন নজরুলের ইচ্ছেতে নজরুলের 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরাণ পিয়া' গানটি ধরলাম, তখনি বোঝা গেল উপরে একটি কাপড় ঢাকা পাখি ঝুলিয়ে রেখেছেন নলিনীদা, এটি বৌদির প্রিয় পোষা পাখি। সেই পাখিই সনে শিস দিয়ে যাচ্ছে সুরে সুর মিলিয়ে। নলিনীদা অনেক আগেই বুঝেছিলেন, কিন্তু বলেননি। তিনি নিজেও জানতেন না পাখিটি এতো রসিক, এতো গুণী। জানবার পরে সকলের কী আনন্দ!

বৌদির তো গর্বে আর মুখে হাসি ধরে না। আমি হতবাক। গান গেয়ে এতো আনন্দ আর সত্যি কোনোদিন বোধহয় কেউ পাননি। নলিনীদা হাসির গান করতেন। চমৎকার গলা। অঙ্গভঙ্গি সহকারে যখন ডি এল রায়ের 'পার তো জোন্মো না কেউ বিষ্যৎবারের বারবেলায়' গাইতেন, আমি হাসতে হাসতে মরে যেতাম। দাঠাকুর এলে দাঠাকুরও গান ধরতেন, সব প্যারোডি। লেগেছে অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া গানটির এমন সুন্দর প্যারোডি করেছিলেন আর নলিনীদা সেটা এমন চোখ নাচিয়ে হাত নাড়িয়ে গাইতেন যে আমি আর থামতে দিতে চাইতাম না। কেবল বলতাম ঐ জায়গাটা আর একবার, ঐ জায়গাটা আর একবার। ঐ জায়গাটার লাইনটা ছিল ফাটিয়া গিয়াছে তাওয়া। গানের প্যারোডিটা, একটুও মনে নেই, নইলে সব লাইনগুলো তুলে দিলে গান না গাইলেও পড়তে পড়তে হাসি পেতো। হাসিরই বয়েস ছিল সেটা, সব কিছুতে অবাক হবার বয়েস ছিল। আনন্দকে মুঠোয় ধরে খেলাবার বয়েস ছিল। দিনগুলো কোথায়। যায়? কেন যায়? এই তো সব সেদিনের কথা! জীবন বড় ছোট, বড় কৃপণ। ঈশ্বর এক, হাতে দেন এক হাতে নেন। অথচ নীতিকথায় আমাদের আশৈশব শেখানো হয়েছে দিলে আর ফিরে নিতে হয় না। কিন্তু ঈশ্বর তো সব ফিরিয়ে নেন।

নলিনীদার মেয়ের নাম ছিল গীতা। আমার সব কিছুতে এত হাসি দেখে নলিনীদা হাসির গানের মতোই মুখভঙ্গি করে চোখ কুঁচকে বলতেন, 'আরে এ মেয়েটা এতো হাসে কেন রে? দাঁড়াও, অত হাসলে আমি সক্কলকে বলে দেব, তুমি গীতার পিসি নও মাসি।' এটা নলিনীদার একটা বিশেষ রসিকতা ছিল আমার সঙ্গে। আমি রসিকতাটা বুঝতাম। বুঝি না দেখে সকলের আবার হাসি। আমি অপ্রস্তুত। বৌদি বলতেন, 'তুমি যদি তোমার দাদার বোন না হয়ে আমার বোন হও তবে তুমি তোমার দাদার কী হও?

আমি তাও বুঝি না। আবার সকলের হাসি। নলিনীদার বাড়ির সমস্ত আবহাওয়াটাই এই হাসি আর গান আর আনন্দ নিয়ে গমগম করতো। ক্রমে আমার ঢাকা ফিরে আসার সময় ঘনিয়ে এলো। রেকর্ডিং শেষ, সুতরাং আর থাকার কোনো প্রশ্ন নেই। নজরুল ইসলাম গেরুয়া চাদর লুটিয়ে তুলে দিতে এলেন স্টেশনে। বললেন, 'খুব-শিগ্গির আবার চলে এসো।' আমার মা বললেন, আপনিও আর একবার আসুন না–'

আমি কিছু বললাম না। বলতে পারলাম না। বলতে না পারার পিছনে শুধু যে আমার বিচ্ছেদের বেদনাই লুকিয়ে ছিল তাই নয়, তার চেয়েও আরো অনেক গভীর বেদনা আমাকে লজ্জা দিচ্ছিলো।

সেবার ঢাকা গিয়ে নজরুল ইসলাম যেদিন ঢাকা ছেড়ে ফিরে গেলেন, তার দু'দিন আগে সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে তাঁর গান আর আবৃত্তির একটি আসর বসেছিল। আসর ভাঙতে সামান্য দেরি হলো। সকলে চলে গেলে মা নজরুলকে খেতে দিলেন। রাত দশটা বেজে গেল। বাবা বললেন, 'আপনি অপেক্ষা করুন, আমি সাইকেল নিয়ে গিয়ে

একটা গাড়ি ডেকে আনি।' উনি বললেন, 'পাগল নাকি? আপনি গিয়ে আমার জন্য গাড়ি ডেকে আনবেন? সে কখনো হয়?'

বাবা বললেন, 'পাড়াটা দেখছেন তো এইটুকু রাত্রিতেই কেমন থমথমে চুপচাপ হয়ে যায়? এখন কাছে পিঠে কোনো গাড়ি পাবার সম্ভাবনা নেই, বড় রাস্তার মোড়ে একটা ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবল আছে, ভাড়া বেশি দিলে চলে আসবে।'

নজরুল হেসে খুন, আমার কি রানুর মতো ভূতের ভয় আছে নাকি যে রাত বেশি হয়েছে বলে, পাড়া চুপ হয়ে গেছে বলে হেঁটে যেতে ভয় পাবো? গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে নেমে গেলেন রাস্তায়।

মা দোতলায় এসে বিছানা পাততে পাততে বাবাকে বললেন, 'জান, আজ ও বাড়িতে এই বলে ইঙ্গিতে পাশের বাড়িটা দেখিয়ে দিলেন, (অর্থাৎ তাঁর পিত্রালয়ের পরশ্রীকাতর আত্মীয় বাড়িটা) সারাদিন ধরে কী যে পরামর্শ চলছিল, কে জানে, কেবল বারান্দায় এসে এসে কয়েকটা ছেলে আমাদের বাড়িটা দেখছিলো, পাণ্ডা দেখলাম গুণ্ডার সর্দার সেই অমুক সাহাটা–'

যখন দিলীপদা এসেছিলেন তখন ওঁরা একদিন দিলীপদাকে নিজের মেয়েদের গান শোনাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, দিলীপদা সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারপর থেকে ও বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী বয়স্ক সুন্দরী আত্মীয়টি আর আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন না। দ্রুত এবং কন্যাদেরও বলতে দিতেন না। অতি পাশাপাশি বাড়ি, চোখাচোখি হয়ে যাবার সম্ভাবনায় বারান্দায় একটি চটও খুলিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা বলেছিলেন। বেশ হলো। তোর মায়ের পিত্রালয়ের আত্মীয় প্রীতিটা একটু কমবে এবার।' আমার বাবা ওদের ধরন-ধারণ কথাবার্তা জীবন যাপনের প্রণালী কিছুই বিশেষ পছন্দ করতেন না।

মায়ের কথা শুনে বাবা বললেন, 'ঐ গানটান হচ্ছিল তো, লোকজন এসেছিল, ওদের বলা হয়নি, তাই উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখছিল।'

বলতে বলতেই নিঃশব্দ পাড়া ভেদ করে একটা কোলাহল ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে মা ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে নজরুলকে ওরা আজ কিছু করবে, আমি দেখেছি নজরুল বেরুলো, আর ওদের বাড়ি থেকেও বেরিয়ে পড়লো কয়েকটা ছেলে–'

বাবা গেঞ্জি গায়েই দৌড়ে নিচে নেমে গেলেন, চটি পায়েই দরজা খুলে ছুটলেন। আমি আর মা উৎকণ্ঠিত উদ্বেগে ঝোলানো বারান্দায় যত দূর চোখ চলে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

খানিকক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম বাবা আর নজরুল হেঁটে হেঁটে আসছে, বাবা নজরুলকে ধরে ধরে আনছেন।

মায়ের মনে যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল সেটাই ঘটেছে। নজরুল যখন বনগ্রামের মোড় পেরিয়ে একটা আরো নির্জন রাস্তায় পৌঁছেছেন, বোধহয় সেটা ঠাটারি বাজারের মোড়, সেই মুখটাতে যেতেই জনা সাত-আট ছেলে লাঠি দিয়ে পিছন থেকে প্রচণ্ড জোরে মাথায়



আঘাত করতে করতে বললো, 'দিলীপ রায়ের টাক মাথাটা ফাটাতে পারিনি, এবার তোর বাবরিচুলের মাথাটা আর আস্ত রাখবো না।'

নজরুল আচমকা আঘাত পেয়ে মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন বটে, পরক্ষণেই . ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা ছেলেকে ধরে ফেলে, তার হাতের লাঠি দিয়েই তাকে ধরাশায়ী করে সমানে সেই লাঠি বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'কে আসবি আয়, কটা আসবি আয়–লাঠি খেলা ছোরা খেলায় দক্ষ মেরুদণ্ড সিধে একটা যুদ্ধফেরতা মানুষের সম্মুখে এই শৃগাল শূকরের দল কি কখনো দাঁড়াতে পারে? তবু যতোক্ষণে তিনি ঐ ছেলেটাকে পিটিয়ে হাতের সুখ করেছেন ততোক্ষণে এরাও এলোপাথারি যে যেভাবে পারে মেরেছে তাঁকে। তারপর লাঠি ঘোরানো দেখে মাটিতে পড়ে থাকা ছেলেটাকে তুলে নিয়ে পালিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেছে ব্যাপারটা। বাবা গিয়ে যখন পৌঁছেছেন তখন লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতেই পথ হাঁটছেন নজরুল। বর্ধমান হাউসে যাবেন।

'নজরুল, আমি।–' বাবার গলা পেয়ে থেমে গেলেন তিনি, বাবা তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কোথায় যাচ্ছেন? আমার সঙ্গে চলুন।'

নজরুল হেসে বললেন, আপনার বাড়ি যাই বলে ওরা আমাকে মেরেছে, রানুকে নিয়ে অনেক কুৎসিত কথা বলেছে, এখন যদি আবার ওখানে যাই, এই শূকর সন্তানগুলো তো বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবে। আপনি কেন এলেন? কী সাহসে এলেন? ওরা কোথায় লুকিয়ে আছে ঠিক নেই, আপনাকে খুন করে ফেলবে ওরা। আমি ওদের সঙ্গে যুঝতে পারবো, আপনি পারবেন না।

বাবা বললেন, 'পারি না পারি সেটা আমি দেখবো। আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো না।'

'আমিও আপনার সঙ্গে যাবো না। রাত দশটা পর্যন্ত থেকেছি বলেই যেসব জঘন্য ভাষা প্রয়োগ করেছে, সারা রাত থাকলে কি উপায় রাখবে? না না, আপনি ফিরে যান আমি যাবো না।'

বাবা জোর করে ধরে নিয়ে এলেন। কী করে এবং কী দুরন্ত সাহসে যে উনি অতদূর হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছিলেন তা উনিই জানেন।

বাড়িতে এনে বাবা বিছানায় শুইয়ে দিলেন, মা লণ্ঠন কাছে নিয়ে কোথাও জখম হয়েছে কিনা দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়েই শিহরিত হলেন। হাতে পায়ে মাথায় পিঠে সর্বত্র গভীর আঘাতের চিহ্ন মোটা মোটা হয়ে রক্ত জমে ফুলে উঠেছে। কী করে যে সেই রাতটা আমরা কাটিয়েছিলাম, আমরাই জানি। মা ওঁকে একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাইয়ে দিলেন, আমাদের পরিচারিকা পুনার মা, যে ওঁকে কালোকৃষ্ণ বলেছিল, সে চোখ মুছতে মুছতে সমস্ত আহত জায়গা নারকোল তেল দিয়ে ভিজিয়ে দিল, মা বাতাস করতে লাগলেন, আমি আর বাবা প্রায় অচেতনের মতো মেঝেতে বসে রইলাম। রাত ভোর হয়ে গেল।

তার মধ্যে অবশ্য নজরুল ঠাট্টা-তামাসা করে আমাদের ভারী মন হালকা করার চেষ্টা করেছিলেন, ফলশ্রুতি শুধু অশ্রুর বন্যা। লজ্জা দুঃখ অসম্মান কী না নিহিত ছিল তার মধ্যে? একাদিক্রমে অতগুলো দিন ওরকম একটা অনাবিল আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে ঢাকা এসে যে মন বসতে চাইবে না সে কথা বলাই বাহুল্য।

এতোদিন আমার মা আমার সঙ্গে ছিলেন, বাবা সেই যে একবার ছুটি নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসেছিলেন তারপরে আর যাননি। আমি বাবার অতি অনুরক্ত কন্যা। বাবাকে এতোদিন বাদে দেখে ভীষণ ভালো লাগল। ওস্তাদজিও পূর্বের মতো নিয়মিত আসতে লাগলেন। মন ঠিক হয়ে এলো। তা ছাড়া আমরা ফিরে আসার কয়েকদিন বাদে দাদারও স্কুল ছুটি হয়ে গেল, দাদাও চলে এলো। তখন আমাদের জন্য বাবা একজন মাস্টারমশায়ও রেখে দিলেন।

মাস্টারমশায়ের নাম জ্ঞান চক্রবর্তী। সবাই বলতো জ্ঞানঠাকুর। সুন্দর চেহারা। সাদা দাড়ি আর সাদা চুলে যেন রবীন্দ্রনাথের ছবি। পূর্বে নাকি পালোয়ান ছিলেন, সেই পালোয়ানি চেহারার অবশিষ্টাংশও পালোয়ানের মতোই। পেটটা অবশ্য হাঁড়ির মতো। তবে বেশ টাইট। গুজব, কবে নাকি ঠাকুরবাড়ির কোন্ কন্যাকে দেখে তার রূপে পাগল হয়ে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, সেটা সম্ভব হয়নি। সে জন্য তিনি চিরকুমার। বাবা তাঁকে জ্যেষ্ঠের মতো মান্য করতেন, তিনিও বাবাকে অনুজের মত স্নেহের চোখে দেখতেন। আমরা জ্যাঠামশাই বলতাম। মা তাঁর বৌমা। কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে মা তাঁকে চা করে দিতেন, রেকাবিতে প্রচুর খাবার সাজিয়ে দিতেন। পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে খেতে আমাকে বলতেন, 'বুঝলি মালক্ষ্মী, আমার বৌমার মতো সেবাময়ী হবি। এরকম রান্না শিখবি। কিশমিশ দিয়ে আর ছোট এলাচের গন্ধ দিয়ে হালুয়াটা যা করেছে না, আঃ–'

জ্যাঠামশায়ের কেউ ছিল না। কোথায় কার একটা বাড়ির একটা ঘরে বিনা পয়সায় থাকতেন। ভীষণ কৃপণ, সারাদিন কিছু খেতেন না, রাত্রে আধা সের চিড়ে ভিজিয়ে জল চিনি দিয়ে খেয়ে নিবিড় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হতেন। গলার আওয়াজ যেন মাটির জালার গভীর তলা থেকে বেরুত, এমন গুমগুমে। পাড়হীন সাদা ধুতি পরতেন, গায়ে ফতুয়া, কাঁধে চাদর।

জ্যাঠামশায় আমাদের দুপুরে পড়াতে আসতেন। আমরা বসার ঘরে পড়তাম। খুব ভালো ইংরেজি জানতেন। দাদা অংকে কাঁচা তাই দাদাকে অংক দিতেন, আমাকে কোনো ইংরেজি বইয়ের প্যাসেজ দাগিয়ে দিয়ে অনুবাদ করতে বলতেন। তারপরেই সুন্দর বেডকভার ঢাকা তক্তপোশটিতে শুয়ে এলো গা হয়ে প্রচণ্ড জোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতেন। মস্ত বড় টানটান পেটটা নিঃশ্বাসের ওঠাপড়ায় সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এই এতোখানি উঁচুতে উঠতো আর নামতো। আমি আর দাদা হা হা করে হাসতাম। তারপর ওই পেটের উপরে কে কতো ওষুধের নাম লিখতে পারে এই খেলাটা খেলতাম। দাদা লিখতো চ্যবনপ্রাস, আমি লিখতাম পালসেটিলা; দাদা লিখতো টিনচার আইডিন, আমি লিখতাম বেঞ্জামিন; দাদা লিখতে ত্রিফলা, আমি লিখতাম মৃতসঞ্জীবনী সুধা। জ্যাঠামশায় কিছুই টের পেতেন না। অনেক পরে উঠে বলতেন, 'এই খুকি কী করছিস? অংকগুলো করে ফেলেছিস তো? খোকা কোথায়? দেখি কী রকম অনুবাদ করেছিস।' ঘুমের চোটে ভুলেই যেতেন কাকে কী করতে দিয়েছেন।

দাদার পড়াশুনোয় এক বিন্দু মনোযোগ ছিল না। কেবল পিসিমার কাছ থেকে আমাদের কাছে, আমাদের কাছ থেকে দাদামশায়ের কাছে এইরকম ঘোরাঘুরি করতো। ফলে একবার এই ইস্কুল থেকে সেই ইস্কুল সেই ইস্কুল থেকে ওই ইস্কুল, করে করে বছরগুলো নষ্ট হতো। কিন্তু মেধা ছিল। জ্যাঠামশায় বলতেন, 'অ্যাই খোকা, কী? ভেবেছিস কী



তুই? বেটাচ্ছেলে জমিদারি ভাঙিয়ে খাবি, না? সে জন্য আর পড়তে ইচ্ছে করে না। তিনদিনের মধ্যে ইতিহাসের ওই চ্যাপ্টারটা মুখস্থ করতে পারলি না? এই আজকে আমার শেষ কথা, কাল যদি না মুখস্থ বলতে পারিস, দেখবি কী মার মারি আমি। আমাকে তো চিনিস না।'

দাদা রেগে গিয়ে বলতো, আমি আজই মুখস্থ করে দেবো আপনাকে।

'আজ দিবি? দিতে পারবি?'

'হ্যাঁ পারবো।'

'কতক্ষণের মধ্যে?'

'আধঘণ্টার মধ্যে।'

'ঠিক তো। নইলে এই লাঠি দেখছিস?'

জ্যাঠামশায়ের হাতে সর্বদাই একটা মোটা লাঠি থাকতো, সেটা দেখিয়ে বলতেন, 'এই লাঠি দিয়ে পিঠ ভাঙবো তোর।'

দাদার একটা চোখ সামান্য একটু ট্যারা, প্রায় বোঝাই যায় না। সেই চোখটাকে আরো ট্যারা করে দাদা বইয়ের পৃষ্ঠায় মুখ ডোবাতো, ঠিক আধঘণ্টায় মুখস্থ করে ফেলে বলতো, 'নিন পড়া।'

জ্যাঠামশায় লাঠি উঁচিয়ে পড়া নিতেন। অবাক হয়ে জড়িয়ে ধরে বলতেন, 'খোকা তোর এত মাথা? আর তুই এভাবে নষ্ট করছিস?'

অবশ্য জ্যাঠামশায়কে অচিরেই মা বাবা অব্যাহতি দিয়েছিলেন এই মাস্টারি থেকে। আমাদের পরিচারিকা পুনার মা, আমার মায়ের কাছে নালিশ করে বলেছিল, 'ঠাকুর মাস্টার তো সব সময় ঘুমায়, বৈদি আর দাদা বইসা বইসা কেবল প্যাটের উপর কী ল্যাখে আর হাসে!'

মা তাঁর দিবানিদ্রা ছেড়ে দু এক দিন চেক করে দেখেছিলেন, কথাটা সত্য। তাছাড়া দাদার ছুটি ফুরিয়ে গেল, চলে গেল, আর আমরাও দু চার মাসের মধ্যে কোনো কারণে কলকাতা এলাম।

কলকাতা থেকে চলে আসবার পরে নজরুল, আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। আমিও আমার অবিশ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং নজরুলের উপহার দেওয়া অগণিত বই-পড়া মন নিয়ে সেই সব সুন্দর আশ্চর্য সাহিত্যিক চিঠির যোগ্য জবাব লিখতে চেষ্টা করতাম। নজরুল আমাকে ইটালি রংয়ের পার্কার কলমও উপহার দিয়েছিলেন। সেই কলমেই লিখতাম। উনি খুব বেগুনি রংয়ের কালি ভালোবাসতেন। সেই কালি নিজেই ভরে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি আবার যখন কলকাতা গেলাম, তার বেশ কিছু আগেই চিঠির সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় তলানিতে এসে গিয়েছিল। সেই যে আমাকে ট্রেনিং দিতে উনি 'হিজ মাস্টারস ভয়েসে'র কুঠুরিতে ঢুকেছিলেন, আর বেরুতে পারেননি। শুনলাম সমস্তক্ষণ সেখানেই আবদ্ধ। অনেকটা অবস্থান্তরও ঘটেছে, গাড়ি কিনেছেন একটি, এবং আঙুরবালা ইন্দুবালা কাননদেবীর মতো বড় বড় গাইয়েদেরই যে তিনি তখন ট্রেইনার, তাই নয়, গ্রামোফোন কোম্পানি অবিরত তাঁকে দিয়ে গানও লিখিয়ে নিচ্ছে। তাঁদের

জন্য। নজরুল ইসলাম যখন যার তখন তার, যে তাঁকে যেদিকে নিয়ে গেল সেখানেই তিনি বসে গেলেন। সেই ভয়ে গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁকে নাকি প্রচুর চা আর পান দিয়ে দরজা বন্ধ করে বসিয়ে দেয়।

আমরা কলকাতা আসবার আগে তাঁকে একটা চিঠি লিখে এসেছিলাম। একদিন এলেন, কিন্তু আগের মতো উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নয়, আগ্রহের সঙ্গে নয়। মনে হলো খুব অন্যমনস্ক। হঠাৎ আমার ওঁর স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল। গতবার তাঁকে আমি একপলকের জন্য দেখেছিলাম। সেবার আমার প্রায়ই মনে হতো নজরুল সব সময় আমাদের নলিনীদার বাড়িতে নিয়ে আসেন কেন? নিজের বাড়িতে নিয়ে যান না কেন? মনে হলেও আমি বলতাম না। উইন আমার সঙ্গে যতোই সমকক্ষের মতো ব্যবহার করুন না কেন, সমস্ত দিক থেকেই উনি আমার চেয়ে এতো বড় যে ওসব বলতে সংকোচ হতো। কিন্তু ওঁর স্ত্রীকে দেখতে কৌতূহলও হতো খুব। একদিন নলিনীদার বাড়ি থেকে স্টেশনে যাবার পথে একটা গলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে একটা বাড়ির সামনে থামিয়ে মাকে বললেন, 'আমি এক্ষুনি আসছি, একটু বসুন।'

মা বললেন, 'এটা কি আপনার বাড়ি?'

নজরুল বললেন, 'হ্যাঁ।'

মা বললেন, 'চলুন না, আমরাও যাই একটু আপনার সঙ্গে, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হবে।'

অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন, 'চলুন।'

একটা আধো অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। উঠে ছোট একটু জায়গায় ছড়ানো ছিটানো জিনিসপত্র। একটা ফুটফুটে বাচ্চা দৌড়ে এসে বললো, 'এই যে কাজীদা, কোথায় ছিলে?'

নজরুল তাকে দুহাতে বুকের মধ্যে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'দুষ্টু, আবার কাজীদা বলছিস?'

পাশেই একটা ঘর। আমাদের নিয়ে সেই ঘরটাতেই ঢুকতে যাচ্ছিলেন উনি। তার পাশের ঘরটা থেকে একজন ধবধবে থান পরা বিধবা মহিলা ছুটে এসে বললেন, 'খবরদার নরু, ওই ঘরে তুমি যাবে না। দুলুর অসুখ।' আমাদের গ্রাহ্য করলেন না তিনি।

নজরুল ইসলামের মুখ গম্ভীর হলো, থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে আমাদের বললেন, 'চলুন।' আমরা নেমে এলাম। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যে ওঁর স্ত্রীকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম। ঘরের দরজায় পর্দা ছিল না, উনি মেঝের বিছানায় পাশ ফিরে শুয়েছিলেন, হঠাৎ মুখ ফেরালেন। শ্যামলা রং, ছিপছিপে চেহারা, বড় বড় চোখ।

নজরুলকে অন্যমনস্ক দেখে সেই দৃশ্যটা মনে পড়লো আমার। জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি ভালো আছেন?'

অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কার কথা বলছো?
'আপনার স্ত্রীর কথা।'
'ও। হঠাৎ তার কথা কেন?'
'এমনি।'



'আমার ছেলের কথা মনে আছে তোমার?'
'খুব।'
'তাকে একদিন নিয়ে আসবো।'

সেদিন তিনি থেকে গেলেন। আবার তাঁর সাবেক আনন্দ ফুটে উঠলো মুখে। গান শেখাতে শেখাতে বললেন, "আমার একটা বই বেরিয়েছে, ভেবেছিলাম পাঠিয়ে দেব, হলো না। নিজেই নিয়ে আসবো এবার। বইটা, তোমাকে উৎসর্গ করেছি, নাম 'চোখের চাতক'। গানের বই। কী? অনুমতি নিইনি বলে মান গেল না তো?" বলেই হাসি।

সারাবেলা কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা চলে গেলেন আর সেই যে গেলেন-আর-পাত্তা নেই। মাত্রই কয়েকদিন ছিলাম সেবার। রেডিওতে গান ছিল একদিন। বাবা সঙ্গে ছিলেন। ঢুকতে গিয়ে দেখি একজন মহিলার সঙ্গে তিনি কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসছেন।

আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'আপনারা?'

বাবা বললেন, 'ওর গান আছে এখানে।'

'তাই নাকি? কই, আমি তো জানি না!'

মহিলা একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন, ভাঙা ভাঙা ফাটা ফাটা গলায় ডাকলেন, 'তাড়াতাড়ি এসো, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।' নজরুল দ্বিধান্বিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'আচ্ছা, আজ আমি যাই, কেমন? ছুটতে হবে দমদম, সেই গ্রামোফোন কোম্পানিতে। রানু, রাগ কোরো না, আমি কাল নিশ্চয়ই বুলবুলকে নিয়ে যাব; বাড়ি থেকো।

তা তিনি এসেছিলেন, বুলবুলকেও এনেছিলেন। চোখ জুড়োনো ছেলে। ওর বাবা হারমোনিয়মে যে গানই বাজান অমনি সে তার রাগরাগিণী বলে দিয়ে প্রশংসার জন্য সকলের মুখে মুখে তাকায়। সারাবেলা ওর রঙ্গ দেখেই কাটলো। যাবার সময় বললেন, 'তুমি আমাকে বেশ সুন্দর একটা সোনার খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছ।'

আমি বললাম, 'ভালোই তো। কী সুন্দর গাড়ি কিনেছেন।'
'তা বটে। চলি।'
'আবার কবে আসবেন?'
'আসবো। তুমি যাবার আগে আসবো। গ্রামোফোন কোম্পানি আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে।'
তিনি অবশ্য আর আসেননি। গ্রামোফোন কোম্পানি সত্যিই তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছিল।

(উদ্ধৃতি : জীবনের জলছবি, প্রতিভা বসু, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নবম মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৪১৮, পৃ. ৪০-৫৬)

কাজী নজরুল বর্ধমান হাউসে বরেণ্য আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে থাকাকালে তিনি বনগ্রামে প্রতিভা সোমকে গান শেখাতে যেতেন। এই নিয়ে সমকালীন কলকাতার একটি পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি'তে কাজী নজরুলকে উদ্দেশ্য করে তার গান প্যারডি করে নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিভা সোমকে গান শিখানো সমকালের ঢাকার কিছু সংখ্যক হিন্দু যুবক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে

ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। কাজী নজরুল বনগ্রাম থেকে বর্ধমান হাউসে ফেরার পথে রাত্রির অন্ধকারে তারা একদিন কাজী নজরুলকে আক্রমণ করেছিল। সমকালীন ঢাকার পত্রপত্রিকায় কাজী নজরুলকে আক্রমণ করার ঘটনাটি বেরিয়েছিল। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ, ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে জুলাই সাপ্তাহিক 'সওগাত' সাময়িকীতে যে খবর ছাপা হয়েছিল তা নিম্নরূপ–

> গত ২৪শে জুন রাত্রি দশ ঘটিকার সময় বাংলার মুসলিম সমাজের গৌরব, বীররসের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বিদ্রোহী জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব তাঁহার এক বন্ধুর বাসা হইতে ফিরিবার সময় ১৫/২০ জন হিন্দু যুবক তাহাকে হকিস্টিক হাতে আক্রমণ করে। কবি সাহেব খালি হাতে তাহাদিগকে বাধা দিতে যাইয়া হাতে, শরীরে আঘাত পান এবং জোরে একজনকে ধাক্কা দিয়া তাহার হাতের হকিস্টিক দ্বারা সকল যুবককে ছাগল ভেড়ার ন্যায় মারিতে মারিতে তাড়াইয়া দেন। আমরা জানি ২০/২৫ জন ভালো পালোয়ান ও বিদ্রোহী কবি হাবিলদার নজরুল ইসলাম সাহেবের নিকট শক্তি পরীক্ষায় টিকবে না।

(উদ্ধৃতি : নজরুল জীবনী, অরুণকুমার বসু, পশ্চিম বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৫৫৬)

প্রতিভা সোমের কণ্ঠে HMV ছাড়িতে পরাণ নাহি চায় (চোখের চাতক), P11673 স্মরণ পারের ওগো প্রিয় (বুলবুল/নজরুলগীতিকা) শীর্ষক কাজী নজরুলের গান সমকালে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।



## যোবায়দা মির্যা

স্মৃতিকথা হচ্ছে যে কারও জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিশ্বস্ত উপাদান। কাজী নজরুলের বর্ধমান হাউসে অবস্থান সম্বন্ধে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেনের (১৮৯৭-১৯৮১) জ্যেষ্ঠ কন্যা যোবায়দা মির্যার (১৯২৩-১৯৯৩) স্মৃতিচারণ উদ্ধৃতিযোগ্য। কেননা, তাঁদের পরিবারের আতিথ্যে কবি নজরুল বর্ধমান হাউসে কিছু দিন কাটিয়েছেন। সেই স্মৃতি তাঁর বাবা কাজী মোতাহার হোসেন বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> নজরুল ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে... মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনেও ঢাকায় এসেছিলেন। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাউস টিউটর হিসেবে উক্ত ভবনের দোতলায় বাস করতাম। কাজী নজরুল সেবার মাসাধিককাল আমার সঙ্গে ছিলেন। বাসগৃহের সংলগ্ন একটা ছোট কামরায় তিনি থাকতেন। আমার বড় মেয়ের বয়স তখন পাঁচ বছর। নজরুল তাকে গান শোখাতেন...।

[উদ্ধৃত : বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল : আলোকচিত্রে বাংলা একাডেমির ইতিহাস, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), পৃ. ১৬]

কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন কাজী নজরুল ভক্ত। তার জ্যেষ্ঠ মেয়ে যোবায়দা মির্যা। কবি নজরুল তাদের পরিবারের বিশেষ একজন হয়ে গিয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের কোলে বসে যোবায়দা মির্যা গান শিখেছেন, পড়া মুখস্থ করেছেন। বড় বোন যোবায়দা মির্যা সম্বন্ধে সন্‌জীদা খাতুন স্মৃতিচারণে এসব লিখেছেন। যোবায়দা মির্যা পরবর্তীকালে খ্যাতিমান লেখক ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর 'রচনা সংগ্রহ' গ্রন্থটি বিখ্যাত। যোবায়দা মির্যার লেখা 'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি' একটি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ।

এই বইটিতে তাঁদের পারিবারিক আবহ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের স্মৃতিচারণ উল্লেখ রয়েছে। 'কাজী নজরুল ইসলামের বর্ধমান হাউসের স্মৃতি কথা' এ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। এছাড়া বইটিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী আব্দুল ওদুদ প্রমুখ ব্যক্তির সাথে তাঁদের পারিবারিক সম্পর্কের কথাও লিখেছেন। তাঁর 'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি' একটি অসাধারণ গ্রন্থ। এই ব্যতিক্রমী বইয়ে কাজী নজরুলসহ বেশ

কয়েকজন গুণী ব্যক্তির স্মৃতিকথা উল্লেখ করেছেন। তবে এই বইয়ে কাজী নজরুলের স্মৃতিই অধিক। বইটি বিচিত্র ও বর্ণিল কাজী নজরুলকে ধারণ করেছে। বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুলের স্মৃতির প্রাসঙ্গিক অংশ 'সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি' গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ চয়ন করা হলো।

প্রথম-দেখা কাজী নজরুল ইসলামকে আমার চোখে বড়ই সুন্দর, জ্যোতির্ময় লেগেছিল। উজ্জ্বল কমলা রঙের মোটা খদ্দরের ঢোলা পাঞ্জাবী, ধুতিটাও ওই একই রঙে ছাপানো। পরতেন কাছা দিয়ে (কোঁচা দিয়ে নয়) ইউনিভার্সিটির অনেক অধ্যাপককে দেখেছি। ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরী ধুতির কোঁচাটা এক হাতে ধরে হেলেদুলে হাঁটবার সময় একটা পা সম্পূর্ণ উদোম হয়ে থাকত। ওই লম্বা দোহারা মানুষটিকে দূর থেকে মনে হত যেন পেশোয়ারীদের মত সালওয়ার পরেছেন, সাদার বদলে রঙিন। কোনক্রমেই পা বেরিয়ে থাকার উপায় নেই। গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা। কাঁধে আলগোছে একটা চাদর ফেলা; মাথায় গান্ধীটুপি। সবই খদ্দরের। পায়ে বিদ্যাসাগর চটি। দেশে তখন চরকা আন্দোলনের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আমাদের বাড়িতেও একটা চরকা কেনা হয়েছিল। কিছুদিন মহা উৎসাহে সুতো কাটার হিড়িক চলল। তারপর সেই চরকা অনাদরে অবহেলায় বারান্দার কোনায় পড়ে থাকত। বাড়ির, এবং পাড়ায়ও, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এলোপাতাড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অল্প দিনেই তার দফারফা করে দিল। আম্মু আর ফুফুদের তক্‌লী দিয়ে হাতে হাতে সুতো কাটাতেও দেখেছি। এসব হুজুগ কিছু দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল।

কবির উপস্থিতি বহুদূর থেকে টের পাওয়া যেত–চলন-বলন সবই দশদিক কাঁপিয়ে, সেই সাথে বেপরোয়া অট্টহাসি। গুণগ্রাহী যুবকের দল সারাক্ষণ তাকে ঘিরে থাকত, ঠিক যেমন করে তারা সক্রেটিসের চারপাশে ভীড় জমাত অতি প্রাচীনকালে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কাজী সব্যসাচী এসে উঠে ছিল হোটেল পূর্বাণীতে। সেখানে গিয়েও ওই একই দৃশ্য দেখলাম। ছেলেছোকরার দল তাকে এমনভাবে ছেঁকে ধরেছে যে ওই ঘরে তিলধারণের জায়গা নেই। তার উপর টেপ রেকর্ডার একখানা চালানই আছে অনবরত–সব্যসাচীর প্রত্যেকটি কথা তো বটেই, তার হাঁচি-কাশি পর্যন্ত সবই রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। এমনই নিবেদিত ভক্তের দল!

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের বাড়িতে যতদিন ছিলেন, বিরামবিহীন ভূতের তাণ্ডব চলত দিনরাত। ছেলেবুড়ো সব সেই দলে, কোন বাছ-বিচার নেই। হৈ-হৈ করে হুজুগে মাতা আর সবাইকে সাথে নিয়ে মাতিয়ে তোলাই ছিল কবি-চরিত্রের বিশেষত্ব। চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছেন ছুটতে ছুটতে। সেটা হচ্ছে তাঁর লোক জড় করার কায়দা-ওয়ার ক্রাই-অর্থাৎ সবাই এলে সিঁড়ির গোড়ায় খোলা জায়গায়টায় জমা হতো। এ-ডাক এড়াবার সাধ্য নেই কারও। এ-ডাক আসত প্রায়ই ছুটির দিনে সকালে নাস্তা খাওয়ার পর। তাঁর প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল 'নারী' আবৃত্তি, 'মহুয়া' গীতিনাট্যের নদের চাঁদের সংলাপ; রবীন্দ্রনাথের আজি এ প্রভাতে রবির কর'-এই সব। শেষ সিঁড়ির একধাপ উপরে দাঁড়িয়ে তিনি, সমবেত দর্শকমণ্ডলী চিত্রার্পিতের মত স্থির হয়ে শুনত এবং কাণ্ডকারখানা দেখত। মাঝে মাঝে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়তেন, টপাটপ দু'চারটে বাচ্চাকাচ্চা তুলে নিয়ে কাঁধে নিয়ে অথবা বগলদাবা করে গান গাইতে



গাইতে দে ছুট, দে ছুট উঠোন পেরিয়ে এক্কেবারে পুকুর ঘাট পর্যন্ত, সেই সাথে ধিড়িং নৃত্য-হিন্দী ফ্লিমের দৃশ্য যেন গানগুলোও বাছাই করা :

১ তাইরে নাইরে নাইরে না  
রইমু ঘরে বাইরে না।  
... ... ...  
কাইল আইমু বউ লইয়া  
থাকবি তরা ফ্যালফ্যালইয়া।  
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ  
২ আদায় আর কাঁচকলায় মিলন  
মোদের স্বামী-স্ত্রীতে।  
... ... ...  
আমি বলি, ইস্তিরির চেয়েও  
স্বামী সে ঢের ভাল,  
তা হোক সে মোট্‌কা, পিলে-পট্‌কা  
হাঁদা কাঁদা কালো।

এই হাঃ হাঃ হাঃ অট্টহাসিটা একদম ওরিজিন্যাল কাজী নজরুল ইসলাম ব্র্যান্ড হাসি। রেকর্ডেও ঠিক এমনি হাসিই আছে। তার 'প্রীতি উপহারের' রসালাপ সবাইকে হাঁক ডেকে শোনাতে খুব পছন্দ করতেন।

তাঁর সে প্রাণচাঞ্চল্য সবাই উপভোগ করত। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেত। সেই হাত-পা-মুখ-চোখ নাচিয়ে অপরূপ মুদ্রা বর্ণনা করা অসম্ভব। ধূমকেতু নয়, উল্কার মত গতিবেগ! গানের গুঁতোয় সব কাজকর্ম বন্ধ :

'বেয়াই তুমি জানোয়ার লোক,  
জানো অনেক কিছু'...

বলার ভঙ্গিতে না হেসে থাকতে পারবে না কেউ। স্কুলে কেউ বেশি হাসলে অন্যরা গম্ভীর হয়ে উপদেশের ছলে বলত 'যত হাসি, তত কান্না বলে গেছেন রাম সন্না'। তাঁর সেই হাসি ফুরিয়ে যাবে বলেই কি তিনি এক সাথে সব হাসি হেসে নিয়েছিলেন! তিনি কি আগে থেকেই জানতেন যে সব হাসি-কান্নার পাট চুকিয়ে একদিন এসে এই বর্ধমান হাউসের থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে মসজিদের পাশে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে থাকবেন। কোথায় হারিয়ে গেল সেই আনন্দমুখর দিনগুলো, সেই হৈ-হুল্লোড়।

আম্মু সেই সময় ঘোর পর্দানশীন ছিলেন, কবির সামনে যেতেন না। আর কবি ঘরের মধ্যে একটু চুড়ির শব্দ কি শাড়ির খস্‌খাস শুনতে পেলে আড়াল থেকেই চেঁচিয়ে বলতেন, 'ওই আমার সতীন আশেপাশেই আছে।' আব্বুকে অনেকবার বলেছেন, 'তোমার বৌকে লুকিয়ে রেখেছ, আমায় দেখাবে না?' আব্বুর তেমন আপত্তি ছিল না। আম্মু রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কবিদের নাকি বিশেষ রকম আকর্ষণীয় শক্তি থাকে। তাছাড়া তাঁর সম্বন্ধে ফজিলাতুন্নেছা, নোটন, জাহানারা বেগম চৌধুরী, ইত্যাদি

অনেককে জড়িয়ে নানা কথা শোনা যেত তাই আম্মু অতি সন্তর্পণে পালিয়ে বেড়াতেন। একদিন টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে, আরেকটা তরকারি বেড়ে এনে আম্মু রাখতে গেছেন এমন সময় হো হো শব্দে অট্টহাসিতে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন কবি কাকা। রান্নাঘর থেকে খাবার ঘরে আসার ওই সময়টুকুর মধ্যে তিনি চুপি চুপি এসে টেবিলে বসেছিলেন ডাকার আগেই। সাধারণত সব দেওয়া হয়ে গেলে আম্মু সরে যেতেন, আমি গিয়ে খবর দিতাম, আব্বু নিজে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে নেমে আসতেন। সেদিন এ রকম দুষ্টুমি করে তিনি মহা খুশি। আব্বুকে বললেন, 'আজ তোমার বৌকে দেখলাম আড়ি পেতে, ঘাপটি মেরে, কত কৌশলে। যেমন করে হেঁটে আসছিল ঠিক তেমনি করেই ফিরে চলে গেল। ঘোমটা টেনে অথবা ফেলে দিয়ে ছুটে পালাল না। জিভ কাটল না। এতেই বোঝা যায় শরীফ ঘরের মেয়ে। অতি শান্ত সংযত আচরণ। আমি হেরে গেছি।' কিন্তু আম্মুর 'সতীন' নামটা ঘুচল না। কবির ১০-৩-২৮ তারিখে আব্বুকে লেখা চিঠিতে দেখা যায়, "তোমার বৌ-এর ভাগ্য ভাল, হিংসে হয় এক-একবার। দেখ, তোমার বৌও এই চিঠি লেখায় আর প্রিয় সম্ভাষণের ঘটা দেখে আমায় সতীন না ঠাওরান।" হিংসেটা ছিল কবিরই একচেটিয়া। আম্মু কখনো এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাননি একটুও। কবি বলতেন, 'সতীন-মিতীন গোলমরিচের ঝাল, সতীন তুমি বাঁচবা কতকাল?

আরেকদিন টেবিলে খেতে বসেছেন কবি কাকা আর আব্বু। আমারও ওই খানেই বসার কথা। কিন্তু ইলিশ মাছ বাছতে পারব না বলে রান্নাঘরে খেলাইকে (আজকাল যাকে বলে 'আয়া') দিয়ে মাছ বাছিয়ে নিয়ে এলাম। থালির কিনারে গোল করে ঘিরে পতি লোকমায় (গ্রাসে) যতটুকু মাছ খাব তা ভাগ করে সাজিয়ে দিয়েছে। কাকা দেখে বললেন, 'বাঃ! বেশ তো' আমি বললাম, 'এক একটা এক একজনের ভাগ।' প্রত্যেকের নাম নিয়ে আমিই খেতে লাগলাম সবগুলো ভাগ। এতেও তিনি মজা পেলেন। এটা হচ্ছে ছেলে-পিলেদের ফাঁকি দিয়ে সব ভাত খাওয়ানোর ফন্দি। নইলে, তারা সাধারণত মাছ-তরকারি টপাস করে তুলে খেয়ে নিয়ে ভাত ফেলে চলে যায়।...আমি খেতে খেতে আব্বুর পাতের 'মাছের সারি' আর 'হরিণের মাংস' দাবি করে বসলাম। উনি খুশি হয়ে উঠলেন 'মাছের সারি' শুনে। বাঃ দিব্যি নাম রেখেছ তো! এই তেল-তেলে চামড়াটা? আমার মাছের সারিটাও তুমি নাও। আর হরিণের মাংসটা কি?' আমি গড়গড়িয়ে আব্বুর কাছে শোনা গল্পটা সম্পূর্ণ বলে ফেললাম :

হরিণ আর মাছের রেস হয়েছিল–মাছ নদীর ধারে ঘেঁষে পানির মধ্যে আর হরিণ সেই বরাবর ডাঙার উপর দিয়ে ছুটল। মাছের সাথে হরিণ পারল না, হেরে গেল। তাই নিজের পায়ের কিছুটা মাংস কেটে মাছকে দিয়েছিল। মাছের চামড়ার সাথে যেটুকু চকলেট রঙের হয়ে আছে সেইটাই হরিণের মাংস।

খুব খানিকটা হা-হা করে হাসলেন গল্প শুনে। আমাকে তাঁর নিজের মাছের থেকে হরিণের মাংসটুকুও দিয়ে দিলেন আর আব্বুকে বললেন, "এ-গল্প আমার চিরদিন মনে থাকবে। বাচ্চাদের সাথে নিয়ে খেতে বসাই উচিত। ওরা সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়ে খেতে শেখে।"



কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছিলেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হয়ে। উঠেছিলেন সম্পাদকের বাসায়, বর্ধমান হাউসে। তিনি এই অধিবেশন উদ্বোধন করলেন 'চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটি দিয়ে। এ গানের উদ্দীপনাই আলাদা। মার্চের সুরসর্বাঙ্গ নেড়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে শরীরের রক্ত গরম করা গান! এই সময় আরেকটি গানের রেকর্ড হয়েছিল, টলমল, পদভরে বীর দল চলে সমরে।' এটিও তিনি অন্তরের সব আবেগ ঢেলে দিয়ে গাইতেন। আমাদের বাড়িতে যতদিন তাঁকে দেখেছি, যেন টগবগিয়ে ছুটছেন, তেজি ঘোড়া 'চোখ হাসে মোর মুখ হাসে'-এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এক মুহূর্ত চুপ করে বা থেমে থাকতে দেখিনি। 'হাসি, গান, কথা, আবৃত্তি, অনর্গল চলেছে রাস্তার ধারের মাথা-উড়ে যাওয়া কলের জলের মত বিরামহীন। সেই সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি, অভিনয় তো আছেই। কেমন করে জেলে কাটিয়েছেন সে কথা তাঁর মুখে অতি চমকপ্রদ–চোখে ঘুম নেই, আকাশে তারা উঠছে ডুবছে, আবার উঠছে, এই দেখেই কেটেছে। কোনটা কোন সময় আকাশের কোন জায়গায় অবস্থান করে সব বলে দিতে পারেন। দু'হাতের কড়া ঝনঝনিয়ে বাজিয়ে 'শিকল পরা ছল, মোদের এই শিকল পরা ছল, গান গাওয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চের আতঙ্ক, শীতের কষ্ট, রেশনের কষাকষি এসব গল্প সেকেন্ডহ্যান্ড শুনতে অত মজা লাগে না, যত ভালো লেগেছে তাঁর, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। অবসর পেলে জ্যোৎস্না রাতে পুকুর ঘাটে কিংবা রেসকোর্সের ময়দানে বসে বাঁশি বাজানোর প্রতিযোগিতা হতো আমার সেজ কাকা আর ছোট কাকার সাথে। বলতেন, "বিদ্যেটা ঝালিয়ে নিচ্ছি"।

যিনি এ তিথির অধিককাল অবস্থান করেন না তিনিই হচ্ছেন 'অতিথি'। এটা কবি কাকার বেলায় খাটে না। তিনি বেশ অনেক তিথিই কাটিয়েছেন আমাদের বাড়িতে। খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। আব্বুর কথা লিখতে গিয়ে এর প্রসঙ্গ আপনা আপনিই এসে গেছে অনেক। লিখেছিও কয়েক জায়গায়। যে কথাগুলো লিখিনি তাই চেষ্টা করব এবার লিখতে। তখন আমি আঠালুর মত লেগে থাকতাম সারাক্ষণ তাঁর কোলে, পিঠে ও কাঁধে, অর্থাৎ, সব চেয়ে কাছে। কিন্তু তিনচার বছর বয়সের ঘটনাগুলো অনেক মনে থাকলেও সব মনে থাকা সম্ভব নয়। হয়ত এর কিছু পরবর্তী সংযোজন। বাড়িতে তাঁর প্রসঙ্গ উঠলেই সকলেই মহা উৎসাহ আলোচনায় যোগ দিতেন, সেই সব কথার কিছু তিলে তিলে সঞ্চিত হয়েছে আমার মনে। তাঁর গুণমুগ্ধরা তাঁরে পাকড়াও করে যেখানেই নিয়ে যাক, আমি সঙ্গে গিয়েছি। এ-ভাবেও কিছু স্মৃতি সংগ্রহ হয়েছে। হয়ত আমার ঠিক মনে নেই, তবু প্রসঙ্গটা উঠলে চট্ করে সম্পূর্ণ ছবিটা এক নিমেষে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যেমন, আমি নাকি পাঁচ বছর বয়সে কলকাতায় এক বিরাট সাহিত্য-সভায় তাঁর কোলে বসে 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল' গেয়েছিলাম। এ কথা আমার মনে খুবই অস্পষ্ট তবু যারা ওই সভায় ছিলেন তাঁদের অনেকেই এ ঘটনা উল্লেখ করে প্রশংসা করায় আমার মনে পড়ে গেছে, কবি কাকার জোড়াসন হয়ে বসে আমাকে কোলে বসিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়েছিলেন মস্ত বড় হলঘরে লাল রঙের গালিচা পাতা ষ্টেজের উপর। আমার সামনে অসংখ্য লোকের ভীড়। তারা আমার গানের সাথে

হেসে হেলেদুলে মাথা নেড়ে তাল ঠুকেছিল। গান শেষ হলে 'সাবাস', 'বাঃ' হাতে তালি দিয়েই ক্লান্ত হয়নি, এর কোন থেকে ওর কোলে লোফালুফি হয়ে আমি আশ্চর্য উপায়ে আমার আব্বুর কোলে চলে গিয়েছিলাম–কবি তখন বক্তৃতা দিতে উঠেছেন–আমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্যে আব্বু সভার শেষ প্রান্তে দরজার কাছাকাছি বসেছিলেন। সম্পূর্ণ দৃশ্যটা সিনেমার মত খেলে যায় আমার মনের চোখে।

সংগীত চর্চা আমাদের বাড়িতে আগে থেকেই ছিল। আব্বু নিজে সেতার ও উচ্চাঙ্গ সংগীত শিখতেন ওস্তাদ রেখে। চাচারা প্রত্যেকে গান গাইতেন, বাঁশী বাজাতেন। ফুফুদের, এমনকি আম্মুকেও, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে শুনেছি (দেখেছিও) : 'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলা শেষের গান', 'গানের সুরের আসন খানি পাতি পথের ধারে', ইত্যাদি। কবি কাকা আসায় যেন সেই হুজুগের মাত্রা বেড়ে গেল, জোয়ার এল। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, ছোট বড় যেই হোক, একটা সুর ভাঁজলেই ক্রমশ সে 'সুরের আগুন' যেন সারা বাড়িতে ছড়িয়ে যেত তিন চার মিনিটের মধ্যে। দেখা যেত, ওই একই গান প্রত্যেকে গাইছে, কেউ গুনগুনিয়ে, কেউ গলা ছেড়ে।... সাহিত্য সভা, রাজনীতি আলোচনা ছাড়াও কবির বহুবিধ তৎপরতা ছিল ঢাকায় থাকাকালীন। তিনি গান শেখাতেন বেশ কয়েকজনকে। এদের মধ্যে প্রিন্সিপাল মৈত্রের মেয়ে নোটন, মিস ফজিলাতুন্নেসার বোন শফিকুন্নেসা, ওয়ারীর রানু সোম (বর্তমানে বিখ্যাত লেখিকা প্রতিভা বসু, বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী)। এ-সব বাড়িতে নিয়মিত আমিও গিয়েছি, স্পষ্ট মনে আছে। কোলে কিংবা পিঠে ঝুলিয়ে অথবা কাঁধে বসিয়ে নিয়ে যেতেন কাছের বাড়িগুলোতে। যেমন, ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপালের বাড়ি, সুরতজামালের ঢালে মিস ফজিলাতুন্নেসার বাড়ি। ওয়ারীতে যেতেন প্রায়ই আব্বুর সাইকেলে। যেদিন ও-পাড়ার কিছু সংখ্যক গুণ্ডা ছেলে লাঠিসোটা নিয়ে তাঁকে তেড়ে এসেছিল সেদিন ভাগ্যিস আমি সঙ্গে ছিলাম না। সেদিন ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সবাই উদ্বিগ্ন। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কবি কাকার সেই চিরাচরিত হো হো শব্দের অট্টহাসি শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। তিনি তখন অ্যাকটিং করে দেখাচ্ছিলেন, কেমন করে ওরা হৈ-হৈ করতে করতে ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ফেলল, সাত-আট জন। প্রত্যেকের হাতে লাঠি, হকিষ্টিক। তিনি ওদেরই এক জনের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে বোঁ-বোঁ করে ঘুরাতে ঘুরাতে ব্যূহ ভেদ করে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এলেন–একটি আঁচড়ও লাগেনি। 'শালারা পালাতে পথ পায় না।' তাঁর লাঠি ঘুরানোর কায়দা দেখে সবাই চমৎকৃত। আমি অনুযোগ করলাম, 'আমাকে নেননি বলেই তো।' হাসির তোড়ে আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভাগ্যিস নিইনি! নইলে বিপদ আরও বেড়ে যেত।' বলেই এক হাতে আমাকে চট্‌ করে কাঁধে তুলে নিয়ে অন্য হাতে পাঁই পাঁই করে লাঠি ঘুরাতে লাগলেন। সেই ঐতিহাসিক লাঠিখানা বেশ মজবুত, ছড়ির মত, কিন্তু আরেকটু লম্বা। গাঢ় খয়েরি রঙের, মাথাটা মুঠ-পাকিয়ে ধরার উপযোগী গোল, চামড়া দিয়ে টাইট করে বাঁধানো, দেয়ালের পেরেক ঝুলিয়ে রাখার জন্যে চামড়ার একটা সুরু ফিতে দিয়ে লুপ করা। লাঠির অপর প্রান্তে কালো রঙের লোহার গুলটি লাগানো। কবি কাকার বীরত্বের সাক্ষী ওই লাঠিখানা বহুদিন আমাদের বাড়িতে ছিল। গরু-ছাগল বারান্দায় উঠলে তাড়ানো হত ওটা দিয়ে–নজরুল মারা লাঠি!



ছুটতে ছুটতে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে কোন রকম বাধানিষেধ না শুনে সোজা তাঁর সামনে হাজির হয়ে এক নিঃশ্বাসে 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করে বলেছিলেন, গুরুদেব, আমি তোমায় হত্যা করেছি।' এ শুধু তাঁর ছল। এমন আত্ম-বিস্মৃত রবীন্দ্রভক্ত খুব কমই দেখা যায়। আমি অবশ্য আরেকটি দেখেছি—বুদ্ধদেব বসু। যিনি রবীন্দ্র-প্রভাব কাটিয়ে উঠে নিজস্ব ঢঙে কবিতা লেখার দাবি করেন। এর একটা বই পড়েছিলাম, 'নব মেঘদূত'। বইটার আগাগোড়াই একটার পর একটা রবীন্দ্রনাথে বিরহের কবিতার মালা গাঁথা। অপূর্ব নির্বাচন ক্ষমতা।

কবি কাকা একদিন পর্যায়ক্রমে চারজনকে গান শেখাতে গেলেন। শফিকুন্নেসাকে 'হে ক্ষণিকের অতিথি', নোটনকে 'আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি', রানু সোমকে 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে' এবং চতুর্থ জনের নাম ঠিকানা মনে নেই। তবে গানটা হচ্ছে 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে পানিয়া ভরণে চল লো গোরী'। অর্থাৎ হত্যা করা দূরের কথা, তাঁর অস্তিত্বের তিন ভাগই রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরতে, বাঁচিয়ে রাখতে সর্বদা সচেষ্ট।

প্রায়ই গানের আসর বসত বর্ধমান হাউসের একতলার হলরুমে। সারারাত চলত চা, পান আর গান। বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েরা আসতেন। এদের মধ্যে দিলীপ কুমার রায়ও ছিলেন। সংগীত চর্চার কত রকম কায়দা কানুন অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলতেন। গলা সাধা তো আছেই। এর সাথেই ব্যায়াম, ভোরে উঠে মাইল খানেক দৌড়ে আসা ইত্যাদি নিয়মিত অভ্যাস করতেন দিলীপ বাবু। একদিন আম্মুকে ডাকিয়ে পর্দার ওপাশ থেকে বললেন, 'বৌদি, আমাকে একটা জিনিস তৈরি করে দিতে হবে, ওষুধও বলতে পারেন।'

'কি জিনিস?'

'সেটা হচ্ছে, ছোট পেঁয়াজী (ছোট সাইজের এক কোষওয়ালা পেঁয়াজ) ডোবা-ঘি-এর মধ্যে ছেড়ে খুব ঢিমে আঁচে নেড়েচেড়ে লাল করে ভেজে দিতে হবে।' তিনপোয়া জিনিস ধরে এমনি একটা বোয়েম ভরে আম্মু ওই পেঁয়াজ ভেজে দিলেন ফরমাশ অনুযায়ী। দেখতে ঠিক কিসমিসের মত হল ওগুলো। প্রতিদিন ভোরে ওই কিসমিস গোটা চারেক খেয়ে গলা সাধতে বসতেন। এক এক ওস্তাদের এক এক ফতোয়া। মুহম্মদ হোসেন খাঁ বলতেন গুল বানাকুশা—পশারীর দোকানে পাওয়া যায়। চিরতার মত খুব ছোট ছোট ফুল, সাদা রঙের কাঠি-কুঠি ডালপালাসুদ্ধ শুকনো—চায়ের মত সেদ্ধ করে ছেঁকে একটু দুধ চিনি দিয়ে গরম-গরম চুমুক দিয়ে খেয়ে নিলে নাকি গলা খোলে। পরে আমি নিজেও পরীক্ষা করে দেখেছি। অত্যন্ত বিশ্রী লাগে খেতে। কিন্তু স্বভঙ্গে ম্যাজেকের মত ফল পাওয়া যায়। আরেকটা ওষুধ এই ওস্তাদজী শিখিয়েছিলেন, ফ্যারেনজাইটিসের দোষ থাকলে, অর্থাৎ আলাজিভ বেড়ে গেলে গলা খুশ খুশ করে শুকনো কাশির মত হয়। তখন গোল মরিচের সাথে একটু তালমিছরী মিশিয়ে গুঁড়ো করে, এক চিমটি নিয়ে আলাজিভে টিপে দিলে সঙ্গে সঙ্গে আরাম হয়। কবি কাকার এ-সব কিছু লাগত না। মাঝে মাঝে গলা ব্যথায় ভুগতেন বটে তবু তাই নিয়েই তেড়ে গান গেয়ে যেতেন, গ্রাহ্যই করতেন না

ওসব ছোটখাট ব্যথা। কখনো ভুলতেই দিতেন না তিনি যে মহাযুদ্ধ ফেরত বিজয়ী বীর যোদ্ধা! দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল দিলীপ বাবুর সাথে। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ বিদ্রুপ লেগেই থাকত। কোন সুযোগ ছাড়া হত না। এও এক রকম কবির লড়াই, যদিও এক তরফা। দিলীপ বাবুর ছাত্রী রেণুকা সেনের দুটো গানের রেকর্ড বেরিয়ে গেল এবং দুটোই হিট–'পাগলা মনটারে দুই বাঁধ' আর 'যদি গোকুল চন্দ্র ব্রজে না এল সখিগো'। একি কখনো সহ্য হয়। তৎক্ষণাৎ ছাত্রীর নামের অক্ষরগুলো উল্টে নিয়ে মাস্টারের নামকরণ হয়ে গেল, 'কানুরে'। নিজেও উঠে পড়ে লাগলেন, রানু সোমকে নিয়ে এর চেয়েও ভাল গান গাওয়াতে হবে–সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই অত ঘন ঘন ওয়ারীতে যাওয়া আর রাত দুপুরে ফেরা। এতে কোনই দুরভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর প্রতি নোটনের অনুরাগের কথা ও তাঁর নিজের ফজিলাতুন্নেসার প্রতি দুর্বলতার কথা রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। ফলে কেউ আর তাঁর সাধু সংকল্পের কথা বিশ্বাস করেনি। ভুল বোঝাবুঝির দরুন রানু সোমের বাড়ি থেকে ফেরার পথে লাঠিসোটা, হকিষ্টিক নিয়ে তেড়ে এসেছিল গুণ্ডা প্রকৃতির ছাত্রদল। এরপর তিনি হঠাৎ ঢাকা থেকে চলে যান, এক রকম 'লেজ গুটাইয়া'–গান রেকর্ড করানো হয়ে ওঠেনি আর।

(সূত্র : উদ্ধৃতি লেখাটি 'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি', যোবায়দা মির্যা, মুক্তধারা, জুলাই ১৯৮৪ থেকে সংকলিত)

বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুলের অবস্থানকালীন মজার মজার ঘটনা যোবায়দা মির্যার লেখায় চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে।

## গ্রন্থপঞ্জি

১. আলোকচিত্রে বাংলা একাডেমির ইতিহাস, সম্পাদক : শামসুজ্জামান খান
সংস্কৃতি, পত্রিকা ও মিলনায়তন বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮।



## বুদ্ধদেব বসু

১৯২৮ সালের দিকে বুদ্ধদেব বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তার লেখায় স্মৃতিময় রমনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান হাউস ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও জীবনীকার সমীর সেনগুপ্ত তার 'বুদ্ধদেব বসুর জীবন' (২০২০) গ্রন্থে লিখেছেন :

কাজী নজরুলের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পরিচয় হয়েছিল ঢাকা শহরে। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা মুসলিম সাহিত্যসমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে হয়েছিল। এ সম্মেলন উপলক্ষ্যেই নজরুল এসেছিলেন ঢাকায়। বুদ্ধদেব বসু তখন জগন্নাথ হলের সাহিত্য সম্পাদক। নজরুলের সম্মানে তিনি জগন্নাথ হলে কবির একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে ইডেন কলেজের অধ্যাপিকারাও এসেছিলেন। কাজী নজরুলকে দেখেই তাঁকে ভালোবেসেছিলেন বুদ্ধদেব। নজরুলের চওড়া কাঁধ, বলিষ্ঠ দেহ, মাঝখান দিয়ে সোজা সিঁথি করা কোঁকড়া চুল, গায়ে গেরুয়া রঙের খদ্দর পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর, কণ্ঠে হাসি–এ এক মনোমুগ্ধকর মানুষ! কাজী নজরুলের গান আর আবৃত্তি শুনে উপস্থিত সবাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেবার নিজের পুরানা পল্টনের বাড়িতেও নজরুলকে নিয়ে গিয়েছিলেন বুদ্ধদেব।

কাজী নজরুলের জীবনে গান কতটা সত্য ছিল, তা যাঁরা সামনে থেকে কবিকে দেখেছেন, শুধু তাঁরাই জানেন। বুদ্ধদেব সেই বিরল সৌভাগ্যবানদের একজন। একটি হার্মোনিয়ম, প্রচুর পরিমাণে পান আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা–সারা দিন গান গেয়ে যাওয়ার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু চাইতেন না নজরুল। হার্মোনিয়মের ওপরে খোলা থাকত তাঁর গানের খাতা আর ফাউন্টেন পেন। হার্মোনিয়ম বাজাতে বাজাতেই তিনি গেয়ে ওঠেন একটা লাইন, তারপর বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখেন খাতায়, এরপর দ্বিতীয় লাইন, তৃতীয় লাইন...। এভাবেই রচিত হতে থাকে গান।

বুদ্ধদেবের সামনেই লেখা হয়ে গেল নজরুলের একটি গান, 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া, পরানপিয়া...'। সাধারণত লেখার ব্যাপারে একটা কথা সব সময় শোনা যায়। মনোযোগ দেওয়ার জন্য দরকার নির্জনতা, নীরবতা। বুদ্ধদেব লক্ষ করলেন, সৃষ্টিকর্ম যে নির্জনতা দাবি করে, তার কোনো তোয়াক্কা করেন না নজরুল। ঘরভর্তি মানুষের উপস্থিতি তাঁকে বিব্রত করে না; বরং তাদের দিকে তাকিয়ে, হাসতে হাসতে, হাসির উত্তরে হাসি দিয়ে যেন অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এরপরই তৈরি হয়ে যায় গান!

সূত্র : সমীর সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসুর জীবন, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

বুদ্ধদেব বসুর লেখায় আরো এসেছে কাজী নজরুলের বর্ধমান হাউসে দেখা করার প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে তার লেখার অংশবিশেষ হলো :

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে এক মুসলমান অধ্যাপকের বাসা, সেখানে থেকে নজরুলকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা কয়েকটি সাহসী যুবক চলেছি আমাদের 'প্রগতি'র আড্ডায়। বিকেলের ঝকঝকে রোদ্দুরে সবুজ রমনা জ্বলছে। হেঁটেই চলেছি আমরা, কেউ কেউ বাইসাইকেলটাকে হাতে ধ'রে ঠেলে নিয়ে চলেছে, জনবিরল সুন্দর পথ আমাদের কলরবে মুখর, নজরুল একাই একশো। চওড়া মজবুত জোরালো তাঁর শরীর, লাল-ছিটে-লাগা বড়ো বড়ো মদির তাঁর চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা ঝাঁজরা চুল তাঁর প্রাণের ফুর্তির মতোই অবাধ্য, গায়ে হলদে কিংবা কমলা রঙের পাঞ্জাবি এবং তার উপর কমলা কিংবা হলদে রঙের চাদর—দুটোই খদ্দরের। 'রঙিন জামা পরেন কেন?' 'সভায় অনেক লোকের মধ্যে চট ক'রে চোখে পড়ে, তাই।' ব'লে ভাঙা-ভাঙা গলায় হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

আমাদের টিনের ঘরে নিয়ে এলাম তাঁকে, তারপর হার্মোনিয়ম, চা, পান, গান, গল্প, হাসি। আড্ডা জমলো প্রাণমন-খোলা, সময়ের হিসেব-ভোলা-নজরুল যে ঘরে ঢুকতেন সে ঘরে কেউ ঘড়ির দিকে তাকাতো না। আমাদের 'প্রগতি'র আড্ডায় বার কয়েক এসেছেন তিনি, প্রতিবারেই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। প্রাণশক্তির এমন অসংবৃত্ত উচ্ছ্বাস, এমন উচ্ছৃঙ্খল অপচয় অন্য কোনো বয়স্ক মানুষের মধ্যে আমি দেখিনি। দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময় উছলে পড়ছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত ক'রে, মনের ময়লা, খেদ ও ক্লেদ সব ভাসিয়ে দিয়ে। সকল লোকই তাঁর আপন, সব বাড়িই তাঁর নিজের বাড়ি। শ্রীকৃষ্ণের মতো, তিন যখন যার তখন তার। জোর ক'রে একবারে ধ'রে আনতে পারলে নিশ্চিন্ত, আর ওঠবার নাম করবেন না—জরুরি এনগেজমেন্ট যাবে ভেসে। ঝোঁকে প'ড়ে, দলে পড়ে, সবই করতে পারেন। একেকবার কলকাতায় খেলার মাঝে বুঝি মোহনবাগানের জিৎ হলো, নাকি এমনি আশ্চর্য কিছু ঘটলো, ফুর্তির ঝোঁকে, 'কল্লোল'-দলের চার-পাঁচজন খেলার মাঠ থেকে শেয়ালদা স্টেশনে এবং শেয়ালদা থেকে একেবারে ঢাকায় চলে এলেন নজরুলকেও ধরে নিয়ে এলেন সঙ্গে। হয়তো দু'দিনের জন্য কলকাতায় বাইরে কোথাও গান গাইতে গিয়ে সেখানেই এক মাস কাটিয়ে দিলেন। সাংসারিক দিক থেকে এ চরিত্র অনুকরণযোগ্য নয়, কিন্তু এতে রম্যতা আছে তাতে সন্দেহ কী। সেকালে বোহিমিয়ান চাল-চলনে অনেকেই অভ্যাস করেছিলেন—মনে মনে তাঁদের হিসেবের খাতায় ভুল ছিলো না—জাত-বোহিমিয়ান এক নজরুল ইসলামকেই দেখেছি। অপরূপ তাঁর দায়িত্বহীনতা।

কথাবার্তার আসরে তিনি যে খুব দীপ্যমান, তা নয়। নিজের আনন্দেই তিনি মত্ত, অন্যের কথা মন দিয়ে শোনবার সময় কই। নিজে রসিকতা ক'রে নিজেই হেসে লুটিয়ে পড়ছেন। কথার চেয়ে বেশি তাঁর হাসি, হাসির চেয়ে বেশি তাঁর গান। একটি হার্মোনিয়ম এবং যথেষ্ট পরিমাণে চা এবং পান দিয়ে একবার বসিয়ে দিতে পারলে তাঁকে দিয়ে একটানা পাঁচ-সাত ঘণ্টা গান গাওয়ানো কিছুই নয়।—গানে তাঁর আন্না নেই; ঘুমের সময়



ছাড়া সবটুকু সময় গাইতে হ'লেও তিনি প্রস্তুত। কণ্ঠস্বর মধুর নয়, ভাঙা-ভাঙা খাদের গলা, কিন্তু তাঁর গান গাওয়ায় এমন একটি আনন্দিত উৎসাহ, সমস্ত দেহ-মন-প্রাণের এমন একটি প্রেমের উচ্ছ্বাস ছিলো যে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছি। সে সময়ে গান রচনা করতেও দেখেছি তাঁকে—হার্মোনিয়ম, কাগজ আর কলম নিয়ে বসেছেন, বাজাতে-বাজাতে গেয়েছেন, গাইতে গাইতে লিখেছেন। সুরের নেশায় এসেছে কথা, কথার ঠেলা সুরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেবারে ঢাকায় যেসব গান তিনি লিখেছিলেন সেগুলি প্রায় সবই স্বরলিপি সমেত 'প্রগতি'তে বেরিয়েছিলো। 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী'; 'এ-বাসি বাসরে কে গো/ছলিতে'; 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া/পরান প্রিয়া', এসব গান ঢাকা লিয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে। এইমাত্র শেষ করা গান কবির নিজের মুখ তক্ষুণি শুনতে শুনতে আমাদেরও মনের মধ্যে নেশা ধ'রে যেতো।

[উদ্ধৃতি : নজরুল ইসলাম : বুদ্ধদেব বসু, নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদক : কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, পৃ. ২৫৪-২৫৫]

## কাজী নজরুলের চিঠিপত্রে বর্ধমান হাউসের প্রসঙ্গ

একজন লেখক বা ব্যক্তিকে সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে ও ঘনিষ্ঠরূপে পাওয়া যায় তাঁর চিঠিপত্রে। এজন্যই বলা হয় He who touches a letter forches a man অথবা A Letter is Visit on paper.

কাজী মোতাহার হোসেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাদের মধ্যে ব্যাপক পত্রালাপ হতো। বিভিন্ন পত্রে কাজী নজরুল তাকে মোতাহার, মোতিহার বলে সম্বোধন করেছেন। ১৯২৮ সালে কাজী নজরুলের লেখা কয়েকটি পত্রে তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ফুটে উঠেছে। ১৯২৮ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' বার্ষিক সম্মেলনে ঢাকায় এলে কাজী নজরুল বর্ধমান হাউসে অবস্থান করেন। এখানে তিনি কাজী মোতাহার হোসেনের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এ সময়ই কাজী নজরুলের সঙ্গে মোতাহার হোসেনের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সম্পর্ক রচিত হয়। কাজী নজরুল কলকাতায় গিয়ে নিম্নলিখিত পত্রসমূহ মোতাহার হোসেনকে লিখেছিলেন। শাহাবুদ্দীন আহ্মদ সম্পাদিত 'নজরুলের পত্রাবলী' (১৯৯৫), সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদিত 'নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায় (১৯৬৭)-সহ নানা সূত্র থেকে এই পত্রগুলো আহরণ করা হয়েছে।

> ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়। কবি নজরুল ইসলাম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন; সেই উপলক্ষেই "চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল" গানটি রচনা করেন। সে-সময়ে তিনি কিছুকাল ঢাকা অবস্থান করেছিলেন। ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি সাহিত্য-সমাজের তৎকালীন সম্পাদক অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে এই পত্রখানি লেখেন।

পদ্মা
২৪-২-২৮ সন্ধ্যা
("Vulture" স্টিমার)

প্রিয় মোতাহার!

আমার কেবলি মনে পড়ছে (বোধ হয় ব্রাউনিং-এর) একটি লাইন,-[১] "So very mad, so very bad, so very sad it was, yet it was sweet!"

---

১. স্মৃতি থেকে লেখা বলে উদ্ধৃতি সঠিক ছিল না। হবে How sad and bad, and mad it was! But then, how it was sweet!



আর মনে হচ্ছে, ছোট্ট দুটি কথা–'সুন্দর' ও 'বেদনা'। এই দুটি কথাতেই আমি সমস্ত বিশ্বকে উপলব্ধি করতে পারি।...

'সুন্দর' ও 'বেদনা", এ দুটি পাতার মাঝখানে একটি ফুল–বিকশিত বিশ্ব। একটি মক্ষী-রাণী[২], তাকে ঘিরেই বিশ্বের মধু-চক্র।

বাগানের মালি[৩] রাতদিন লাঠি নিয়ে বাগান আগলে আছে। বেচারা মানুষ তাকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না। মৌমাছি[৪] তার মাথার ওপর দিয়ে গজল-গান গেয়ে বাগানে ঢোকে, সুন্দরের মধুতে ডুবে যায়, অস্ফুট কুঁড়ির কানে বিকাশের বেদনা জাগায়, প্রস্ফুটিত যে–তাকে ঝরে পড়ার গান শোনায়; তার এতটুকু বাধে না, দেহেও না, মনেও না। বেচারা মালী–যেন অঙ্কশাস্ত্রী মশাই! হাঁ করে তাকিয়ে দেখে, আর মৌ-মক্ষীর চরিত্রের এবং আরো কত কি'-র সমালোচনা জুড়ে দেয়। মৌ-মক্ষী কিছু শোনে না, সে কেবলি গান করে–সুন্দরের স্তব সে গান। তাকে মার, সে সুন্দরের স্তব করতে করতেই মরবে।

কোন দ্বিধা নেই, ভয় নেই। তাকে আবার বাঁচিয়ে ছেড়ে দাও, সে আবার সুন্দরের স্তব করবে, আবার বাগানে ঢুকে ফুলের পরাগে অন্ধ হয়ে ভগ্নপক্ষ হয়ে মরবে।

সুষমা-লক্ষ্মীর বাগান আঙুলে বসে আছে নীতিবিদ বুড়ো সামাজিক হিতকামীর দল,–স্টার্ন, রিজার্ভ, রিজিড, ডিউটিফুল! কত বড় বড় বিশেষণ তাদের সামনে ও পেছনে। তারা সর্বদা এই পোজ নিয়ে বসে আছে যে, তারা যদি না থাকত, তাহলে একদিনে এই জগৎটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত, একটা ভীষণ ওলটপালট হয়ে যেতো। বেচারা! দেখলে দয়া হয়।

এদের মাঝেই হয়তো কোটির মাঝে একটি আসে সুন্দরের ধেয়ানী, কবি। সে রিজার্ভ নয়, ডিউটিফুল নয়, সে কেবলি ভুল করে, সে কেবলি falls on the thorns of life, he weeps![৫] সে সমস্ত শাসন সমস্ত বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে উঠে সুন্দরের স্তব গান করে skylark'-এর মত। সে কেবলি বলে, "সুন্দর বিউটিফুল!" মিল্টনের স্বর্গের পাখির মত তার পা নেই, সে ধূলার পৃথিবী স্পর্শও করে না।....

কবি এবং মৌ-মক্ষী। বিশ্বের মধু আহরণ করে মধু-চক্র রচনা করে গেল এরাই।

---

২. মিস ফজিলাতুন্নেসাকেই তিনি মক্ষীরাণী নামে উপমায় অভিহিত করেছেন।
৩. মালি বলতে কবি রক্ষণশীল সমাজকে বুঝিয়েছেন।
৪. কবি নিজেকে এ পত্রে মৌমাছি বা মৌ-মক্ষী বলে অভিহিত করেছেন।
৫. শেলীর Ode to the West Wind.-এর একটি পঙ্‌ক্তি I fall upon the thorns of life–I Bleed-এর অনুসরণ।

কোকিল, পাপিয়া, বৌ-কথা-কও, নাইটিঙ্গেল, বুলবুল–ডিউটিফুল বলে এদের কেউ বদনাম দিতে পারেনি। কোকিল শিশুকে তার রেখে যায় কাকের বাসায়, পাপিয়া তার শিশুর ভার দেয় ছাতার পাখিকে, বৌ-কথা-কও শৈশব কাটায় তিতির পাখির পক্ষপুটে! তবু, আনন্দের গান গেয়ে গেল এরাই। এরা ছন্নছাড়া, কেবলি ঘুরে বেড়ায়, শ্রী নাই, সামঞ্জস্য নাই, ব্যালেন্স-জ্ঞান নাই; কোথায় যায় কোথায় থাকে–ভ্যাগাবন্ড একের নম্বর! ইয়ার ছোরার দল! তবু এরাই ত স্বর্গের ইঙ্গিত এনে দিল, সুন্দরের বৈতালিক, বেদনার ঋত্বিক–এই এরাই, শুধু এরাই! কবি আর বুলবুল!

কবি আর বুলবুল পাপ করে, তারা পাপের অস্তিত্বই মানে না বলে। ভুল করে–ভুলের কাঁটায় ফুল ফোটাতে পারে বলে।

আমার কেবলি সেই হতভাগিনীর কথা মনে পড়ছে–যার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে "ডিউটিফুল", আর পায়ের তলায় প্রস্ফুটিত শতদলের মত "বিউটিফুল।" পায়ের তলার পদ্ম–তার মৃণাল কাঁটায় ভরা, দুদিনে তার দল ঝরে যায়, পাপড়ি শুকিয়ে পড়ে তবু সে সুন্দর! দেবতা গ্রেট হতে পারে–কিন্তু সুন্দর নয়। তার আর-সব আছে, চোখে জল নেই।

তুমি মনে করতে পার মোতাহার আমারি চিরজনমের কবি-প্রিয়া আমারই বুকে শুয়ে কাঁদছে তার স্বর্গের দেবতার জন্য! মনে কর-সে বলছে আমায় মাটির ফুল, আর তার দেবতাকে আকাশের চাঁদ! আচ্ছা এমনি করে তোমায় কেউ বলে তুমি কী করতে বল ত!

আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি এক সঙ্গে কবি এবং নজরুল। ঐ কথা শুনে কবি খুশি হয়ে উঠল–বললে–"এই বেদনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ তুমি, তোমায়' এর ঊর্ধ্বে, তোমার দেবতারও ঊর্ধ্বে নিয়ে যাব আমি–আমি তোমায় সৃষ্টিকরব।"[৬]

কিন্তু নজরুল কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। মনে হল সারা বিশ্বের অশ্রুর উৎস-মুখ যেন তার ঐ দুটো চোখ। নজরুলের চোখে জল! খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে, না? এই চোখের দুফোঁটা জলের জন্য কত চাতকই না বুক ফেটে মরে গেল! চোখের সামনে।[৭]

৬. ইংরেজ কবি শেলীর স্কাই-লার্ক (Skylark) কবিতার প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছেন। Skylark-কবিতায় শেলী সেই পাখিকে দেখেছেন সব বন্ধনের উপরে, আকাশের মুক্তাঙ্গনে সংগীত রচনার আনন্দে বিভোর।

৭. কাজী নজরুলের কাব্যতত্ত্ব ইংরেজ কবি এলিয়টের কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয় : Traditional and Individual talent প্রবন্ধে এলিয়ট কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা ও কাব্য রচনার কাজে



তুমি ভাবছ–আমি কি হেঁয়ালী! কী সব বকছি–যার মাথামুণ্ড কিছু খুঁজে পাবে না। সত্যিই পাবে না। বুকের গোলকধাঁধায় কখনো ঢুকেই কি বন্ধু? ওর পথ নেই, সমাধান নেই, মাথামুণ্ডু মানে–কিছু না!

ওর মাঝে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে শিশুর মত কাদা ছাড়া আর কোন কিছু করবার নেই। তুমি হয়ত পরজন্ম মান না, তুমি সত্যান্বেষী গণিতজ্ঞ। কিন্তু আমি মানি–আমি কবি।

আমি বিশ্বাস করি যে, যে আমায় এমন করে চোখের জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে–সে আমার আজকের নয়, সে আমার জন্ম-জন্মান্তরের, লোক-লোকান্তরের দুখ জাগানিয়া। তার সাথে নব নব লোকে এই চোখের জলে দেখা এবং ছাড়াছাড়ি।

তুমি হয়ত মনে কর্‌ছ–বেচারা শেলী, বেচারা কীটস, বেচারা নজরুল। কেঁদেই মরুল।

রবীন্দ্রনাথ আমায় প্রায়ই বলতেন, "দেখ উন্মাদ, তোর জীবনে শেলীর মত, কীটস্-এর মত খুব বড় একটা tragedy আছে, তুই প্রস্তুত হ!" জীবনে সেই ট্রাজেডি দেখবার জন্য আমি কতদিন অকারণে অন্যের জীবনকে অশ্রুর বরষায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছি, কিন্তু আমারই জীবন রয়ে গেছিল বিশুষ্ক মরুভূমির তপ্তমেঘের ঊর্ধ্বে শূন্যের মত। কেবল হাসি কেবল গান! কেবল বিদ্রোহ!–যে বিপুল সমুদ্রের ওপরে এত তরঙ্গোচ্ছ্বাস, এত ফেনপুঞ্জ, তার নিস্তরঙ্গ নিথর অন্ধকার তলার কথা কেউ ভাবে না। তাতে কত বড় বড় জাহাজ ডুবি হল, সেইটেরই হিসেব রাখলে শুধু, আর সে যে কত যুগ ধরে আপনার অতল তলায় বসে কেবলই শুক্তির পর শুক্তির বুকে মুক্তা-মালা রচনা করে গেল এবং আজ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে রইল তার সেই মুক্তামালা,–এ খবর কেউ রাখলে না।

ফরহাদ[৮], মজনু[৯], চন্দ্রপীড়[১০], শাজাহান[১১]–এরা যেন এক-একটা দৈত্য-শিশু। কিন্তু স্বর্গকে আজো ম্লান করে রেখেছে এরাই।–ফরহাদ পাগলটা শিরি'র কথায়

সেই অভিজ্ঞতার রূপান্তর সম্বন্ধে বলতে যেয়ে কবি হিসেবে এবং ব্যক্তি হিসেবে দুই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।

৮. বিখ্যাত প্রেম উপাখ্যানের নায়ক ফরহাদ শিরীকে পাওয়ার জন্য পাহাড় কাটতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবু তাঁকে প্রতারণা ও ব্যর্থ করেছিল। সেই-ব্যর্থতার বেদনায় সে প্রাণ ত্যাগ করে।

৯. বিখ্যাত আরবি ফার্সি প্রেম-উপাখ্যান লাইলী মজনুর নায়ক মজনু! মজনু অর্থ পাগল। লাইলীকে না পাওয়ার বেদনায় কায়েস পাগল হয়ে রাজ্য ত্যাগ করে বনে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে।

১০. সংস্কৃতকাব্য গ্রন্থ 'কাদম্বরী'র নায়ক চন্দ্রাপীড়।

১১. সম্রাট শাজাহান।

একটা গোটা পাহাড়কেই কেটে ফেললে। পাহাড়ের সব পাথর শিরি হয়ে উঠল। প্রেমিকের ছোঁয়ায় পাহাড় হয়ে উঠল ফুলের স্তবক। পাষাণের স্তব-গান উঠল উর্ধ্বে। কোথায় স্বর্গ! কোন্ তলায় রইল পড়ে!।

লায়লি–সাধারণ মেয়ে, মজনু তাকে এমন করে সৃষ্টি করে গেলো, যেমন করে দেবতা ত দূরের কথা, ভগবানও সৃষ্টি করতে পারে না!

শাজাহান–আরেক ফরহাদ! মোমতাজকে শিরি'র মত অমর করে গেল তাজমহলের মহাকাব্য রচনা করে। তাজমহল–যেন নির্বাক ভাস্করের পাষাণ স্তব! মর্মরের মহাকাব্য!

এইখানেই মানুষ স্রষ্টাকে হার মানিয়েছে।

আমি চাচ্ছিলাম এই দুঃখ, এই বেদনা। কত দেশ-দেশান্তরে, গিরি-নদী-বনপর্বত-মরুভূমি ঘুরেছি আমার এই অশ্রুর দোসরকে খুঁজতে। কোথাও "দেখা পেয়েছি"–এই আনন্দের বাণী উচ্চারিত হয়নি আমার মুখ দিয়ে।

তাই ত এবারকার তীর্থযাত্রাকে আমি বারেবারে নমস্কার করেছি। এতদিনে আমি যেন আপনাকে খুঁজে পেলাম। এবারে আমি পেয়েছি–প্রাণের দোসর বন্ধু তোমায় এবং চোখের জলের প্রিয়াকে।

আর আজ লিখতে পালাম না, বন্ধু! বালিশ চেপে কি বুকের যন্ত্রণার উপশম হয়?

তোমার
নজরুল

**[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত]**

কৃষ্ণনগর
২৫-২-২৮
বিকেল

বন্ধু!

আজ সকালে এসে পৌঁচেছি। বড়ডো বুকে ব্যথা। ভয় নেই, সেরে যাবে এ ব্যথা। তবে ক্ষত-মুখ সারবে কিনা ভবিতব্যই জানে। ক্ষত-মুখের রক্ত মুখ দিয়ে



উঠবে কিনা জানি না। কিন্তু আমার সুরে, আমার গানে, আমার কাব্যে সে রক্তের যে বন্যা ছুটবে তা কোনোদিনই শুকোবে না।

আমার জীবনে সবচেয়ে বড় অভাব ছিল sadness-এর। কিছুতেই Sad হতে পারছিলাম না। তাই ডুবছিলাম না। কেবল ভেসে বেড়াচ্ছিলাম কিন্তু আজ ডুবেছি, বন্ধু! একেবারে নাগালের অতলতায়।

ভাসে যারা, তাদের কুল মেলা বিচিত্র নয়। কিন্তু যে ডোবে, তার আর উঠবার কোনো ভরসা রইল না। প্রতাপ-শৈবলিনী[১২] ভেসেছিল এক সাথে, তাদের কূলও মিলল।

তোমাকে দুদিনেই বুকে জড়িয়ে ধরতে পেরেছি–তোমার গণিতের পাষাণ-টবে ফুলের চারা দেখতে পেয়েছি বলে। অদ্ভুত লোক তুমি কিন্তু! নিজেকে কেবলি অসুন্দরের আড়াল দিয়ে রাখছ! তোমাকে আমার নখদর্পণে দেখতে পাচ্ছি। নিঃস্বার্থ, কোমল, অভিমানী, প্রেমিক–কিন্তু সবকে গোপন করে চলতে চাও যেন। তোমার তৃষ্ণা আছে, কিন্তু নেলসনের[১৩] মত তোমার তৃষ্ণার বারি অনায়াসে আরেকজনের মুখে তুলে দিতে পার।

তুমি দেবতা! তোমাকে যদি কেউ ভুল করে, তবে তার মত ভাগ্যহীন আর কেউ নেই।...

তোমায় আমি বুঝি। কিন্তু কোনো নারী–সুন্দরের উপাসিকা নারী–কোন অঙ্কশাস্ত্রীর কবলে পড়েছে, এ আমি সইতে পারি নে। নারী হবে সুন্দরের অঙ্কলক্ষ্মী, সে অঙ্কশাস্ত্রের ভাড়ার রক্ষী হবে কেন? আমি কবি, হিসেব যেখানে-সেখানে আমি খড়গহস্ত। তুমি ভাবতে পার যে, সুন্দরই যার ধ্যান, সেই নারী রাস্তায় বসে দিনের পর দিন পাথর ভাঙবে, আর তারই পাশে সমানে দিনের পর দিন দড়ি? পাহারা দেবে কর্তব্যপরায়ণ স্টার্ন একটা লোক? এবং ঐ পাথর-ভাঙিয়ে লোকটা মনে করবে–সে একটা খুব বড় কাজ করছে! আর যে-কেউ তাকে দেবতা বলুক,–আমি তাকে বলি প্রাণহীন যক্ষ। অকারণে ভূতের মত রত্ন-মানিক আগলে বসে আছে। সে রত্ন সেও গলায় নিতে পারে না,–অন্যকেও নিতে দেবে না।

হায় রে মূঢ় নারী! তাকে চিরকাল আগলে রইল বলেই যক্ষ হয়ে গেল নেতা! অঙ্কের পাষাণ-টবে ঘিরে রেখে তিলোত্তমাকে তিলে তিলে মারাই যদি বড় দেব হয়,

---

১২. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের 'চন্দ্রশেখর' প্রতাপ এবং শৈবালিনীর প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে।
১৩. মূল চিঠিতে 'নেনসন' ছিল। আবদুল কাদির সম্পাদনা করে 'সিডনী' করেন।

তবে মাথায় থাক আমার সে দেবত্ব! আমি ভালোবাসলে তাকে আমার বাঁধন হতে মুক্তি দিই। আমি কবি, আমি জানি কী করে সুন্দরের বুকে ফুল ফুটাতে হয়।

যে যক্ষ[১৪] রাজকুমারীকে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে পাষাণ-পরতে সোনার খাটে শুইয়ে রাখলে, তার অতি স্নেহকে কি দেবত্ব বলে ভুল করবে? হয় তাকে মেরে ফেল, কিংবা ছেড়ে দিয়ে বাঁচতে দাও। রূপার কাঠির যাদুতে 'মিয়ে রইল বলেই রাজকুমারী হয়ত যক্ষকে অভিশাপ দিলে না হয়ত বা দেবতাই মনে কর্‌লে! কিন্তু যেদিন না-চাওয়ার পথ দিয়ে এল না-দেখা রূপকুমার, এখন কোথায় রইল 'যক্ষ' কোথায় রইল পাষাণ-পুরী! আমার মনে হয় কি জান? ঐ দেবতার মোহ: যেদিন তেপান্তরের রূপকুমারীর ঘুচবে, সেদিন সে বেঁচে যাবে–বেঁচে যাবে!

সে শুভদিনের প্রতীক্ষা করেই আমি মালা গাঁথব, গান রচনা করব। আমি এত বড় ধৈর্যহারা বোকা blunt নই যে, যাকে পেলাম তাকে আমার এই জন্মেই পেতেই হবে। তাকে মড়া-আগলা করে আগ্লাবো, এ-প্রবৃত্তি আমার-কবির–হবে না; এ তুমি নিশ্চিত জেনো। যাক বহু জন্ম হারিয়েছি তাকে পাবার জন্য আরও বহু জন্ম অপেক্ষা করতে পারব। তাই ত, যেই শুনলাম, আমার জন্য আর একজনের মুখ ম্লান হয়ে গেছে, অমনি চলে এলাম চিরদিনের মতো।

বোধ হয় তোমার মনে আছে বন্ধু, তোমাকে শেষ অনুরোধ করে এসেছিলাম যে, তুমি কারুর অবিচারের বিচার করো না। কারুর ভুলের প্রতিশোধ ভুল নিয়ে করো না। কে তোমায় অপমান করতে পারে, যদি নিজেকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পার!

যার কল্যাণ কামনা কর, সে যদি কোনদিন তোমায় দুর্ভাগ্যবশতঃ বিষদৃষ্টিতেই দেখে তাকেই বরণ করে নিও। তাকে ত্যাগ করে না। এ তো শুধু বন্ধুর অনুরোধই নয়, আরো কিছু।

খবর দিও সব খবর। বুকের ব্যথা হয়ত তাতে কমবে। এখন কী ইচ্ছে করছে জান? চুপ করে শুয়ে থাকতে, সমস্ত লোকের সংস্রব ত্যাগ করে পদ্মার ধারে। একটি একা কুটিরে। হাসি-গান আহার-নিদ্রা সব বিস্বাদ ঠেছে।

তোমার ছেলেমেয়েদের চুমু দিও–তোমার বৌকে সালাম।

১৪. যক্ষ বলতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্র বিভাগের অধ্যক্ষ নলিনীমোহন বসুকে। এ পথে মনে হয় মিস ফজিলাতুন্নেসা আভাস দিয়েছেন বা কবিকে বুঝিয়েছেন যে অধ্যাপক বসু তাঁর রক্ষাকর্তা, দেবতা।



সেরে উঠলে জানাব। তোমার চিঠি চাই। এ চিঠি শুধু তোমার এবং আর একজনের। একে secret[১৫] মনে করো। আর একজনকে দিও এই চিঠিটা দু'দিনের জন্য।

কতকগুলো ঝরা মুকুল দিলাম, নাও।

তোমার
–নজরুল

**[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত]**

কৃষ্ণনগর
১-৩-২৮
বিকেল

প্রিয় মোতিহার!

তোমায় এবার থেকে মোতিহার বলে ডাকব। কাল সকাল সাড়ে দশটায় তোমার এবং তোমার বোনের[১৬] চিঠি পেয়েছি। কালই উত্তর দিতাম, কিন্তু পরশু রাত্তির থেকে জ্বরটা ও গলার ব্যথা বড়্ডো বেড়ে ওঠায় কিছুতেই বসতে পারলাম। তোমাদের চিঠি পাওয়ার পর থেকে জ্বর আরো বেড়ে ওঠে। সমস্ত দিন-রাত্তির ছিল–আজ ছেড়েছে সকালে। জ্বর ছেড়েছে, কিন্তু গলার ব্যথা সারেনি। কথা বলতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। আজ উপোস্ করছি। আল্লা মিয়া রোজা না-রাখার শোধ তুলে নিলেন দেখছি–আচ্ছা করেই।

সকালে তোমার বোনকে[১৭] শেষ চিঠি লিখলাম। শেষ চিঠি মানে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে চিঠি দিয়ে আর অপমানিত করব না তাঁকে–এবং আমাকেও।

বড়্ডো 'শক' পেয়েছি কাল ওঁর চিঠি পড়ে। শরীর মন দুই অসুখ বলে হয়ত এতটা লাল–হবেও বা! কেমন লাগল–জান? বাজপাখির ভয়ে বেচারি কোকিল

১৫. Secret-গোপনীয় মনে করো।

১৬. মিস ফজিলাতুন্নেসাকে কাজী মোতাহার হোসেন বোন বলে ডাকতেন। তাঁর লিখিত এ চিঠি পারিবারিক কারণে বিনষ্ট হয়েছে বা হারিয়ে গেছে। কাজী নজরুল ফজিলাতুন্নেসার পত্রগুলো ব্যক্তি জীবনের নানা বাস্তবতার কারণে ধ্বংস করেছেন বলে অনুমান করা হয়।

১৭. এ চিঠি কোথায়ও রক্ষিত হয়নি।

রাজকুমারীর ফুলবাগানে লুকোতে গিয়ে বুকে সহসা ব্যাধের তীর বিঁধে যেমন ঘাড়মুড় দুমড়ে পড়ে, তেমনি।

কাল থেকে কোথায় পালাই, কোথায় পালাই করছিল মনটা। দৈব মুখ তুলে চেয়েছে। একটু আগে দিলীপের[১৮] তার পেলাম,–আমি ফিরেছি কিনা জানতে চেয়েছ। এক্ষণি তার করলাম–ফিরেছি। কাল দুপুরে কলকাতা যাচ্ছি। এখন সেখানে দু-দশদিন থাকব। অতএব তোমরা কেউ পত্র দিলে সেখানেই দিও।

অমল কলকাতার ঠিকানা,–১৫, জেলিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা।

ওখানে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার[১৯] (musician) থাকেন। যাকে "বাঁধন-হারা" dedicate করেছি।

এর মধ্যে তোমাদের চিঠি এসে পড়লে কলকাতায় redirected হয়ে যাবে ব্যবস্থা করে গেলাম।

তোমার অভিমান-তপ্ত চিঠি আমার যে কী ভালো লাগছে–তা আর কী বল্ব! কত বারই না পড়লাম–যেন প্রিয়ার চিঠি! ভাগ্যিস্ তুমি মেয়ে হয়ে জন্মাওনি-নৈলে এবার তোমায়ই হয়ত ভালোবেসে ফেলতাম ঢাকা গিয়ে। এমন দর্পণের মত স্বচ্ছ শহদের[২০] মত মিষ্টি মন কোথায় পেলে বল ত নীরস গণিতবিদ।

কাল তোমার চিঠিটা যদি এসে না পড় ত–তোমার বোনের চিঠির সাথে, তাহলে কি যে হত আমার–তা আমি ভাবতেও পারিনে।

সে যাক। আজ যে তোমার চিঠি পাবই মনে করেছিলাম। কেন চিঠি এল, বল ত? আমি রবিবারে তোমায় চিঠি পোস্ট করেছি এখানে। সে চিঠি অন্তত মঙ্গলবার সকালে পাওয়া উচিত ছিল তোমার। দেরি হয়ে গেছিল বলে Late-fee দিয়ে পোস্ট করতে দিয়েছিলাম। নিজে যেতে পারিনি পোস্ট করতে–কিন্তু যাকে দিয়েছি সে ত ভুল করবে না

কাল তোমার চিঠি পাবই আশা করছি। বোধ হয় নিরাশ হব না। আর, যদি হই-ই, কী আর করব।

তুমি ছাড়া ঢাকার আর কারুর চিঠি পেতে ভয় করবে আমার–যদি ঐ রকম চিঠি হয়। তবে, ঐ এক চিঠি পেয়েই যতদূর বুঝেছি–আমায় তিনি দ্বিতীয় চিঠি দিয়ে দয়া করবেন না।

---

১৮. গায়ক ও বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ দিলীপ কুমার রায়। দিলীপ কুমার রায়কে কাজী নজরুল সংগীত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগী হিসেবে গণ্য করতেন।

১৯. কাজী নজরুল তাঁকে নলিনীদা বলতেন। তিনি কমিক গানের জন্য বিখ্যাত।

২০. মধু।



তোমার চাওয়া গানটা এবং তোমার লেখা (অগ্রদূত) চিঠিটা পাঠালাম। কপি করবার মত হাতে জোর নেই, ভাই! কী যে দুর্বল হয়ে গেছি, তা ভাবতে পার না। গলার ভিতর ঘা-ই হল না কি, solid কিছু খেতে পারছিনে। এর জন্যেও অন্তত কলকাতা যাওয়ার দরকার আমার। অগ্রদূতের চিঠিটা তোমার দেখা হলে পর আবার আমায় পাঠিয়ে দিও কলকাতায়। ওটার উপর তোমার কোন দাবি নেই।

বুদ্ধদেব বসু[২১]কে একটা কবিতা পাঠালাম। গজল-গানের স্বরলিপিও পাঠাচ্ছি আজকালের মধ্যে দেখা হলে বলো।

আবুল হোসেন খুব রেগেছেন, নয়? ওঁর কাছে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়েছো। আমি যে কেমন করে ফিরে এসেছি, আমিই জানিনে।

আবুল হোসেন[২২], মিঃ বোর[২৩], কাজী আবদুল ওদুদ[২৪] প্রভৃতিকে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করতে বলো।

বুদ্ধদেব খুব রেগে চিঠি দিয়েছে–কেন অমন করে না বলে চলে এলাম। কেন যে এলাম, তা কি আমিই জানি।...

তুমি নিশ্চয় যাও তোমার বোনের ওখানে। ওঁর দিন কেমন কাটছে। আমার খুব হয়ত বদনাম করছেন–খুব ক্ষুব্ধ হয়তো আমার উপর–না? কী সব আলাপ হল তোমাদের মধ্যে আমায় নিয়ে? কত খাই না জানতে ইচ্ছা করে, বন্ধু! জানাবে কি?

তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই; সত্য যত বড় নিষ্ঠুর হোক–তাকে সইতে পারব–এ ভরসা আছে আমার।

আচ্ছা মোতিহার! তুমি কোনদিন কাউকে ভালবেসেছিলে? তখন তোমার কি মনে হত? খুব কি যন্ত্রণা হত বুকে? সে ছাড়া জগতের আর সব-কিছুই কি বিস্বাদ ঠেকত তখন?

এত সুন্দর এত কোমল–একমুঠো ফুলের মত তোমার মন–হয়তো আজো পষ্ট হয়নি কোন বেদরদির রাঙা চরণে! তোমার চিঠি পড়ে এক একবার হাসি পাচ্ছে, আবার খুশিও হয়ে উঠছি এই ভেবে যে, তুমি ত পুরুষ মানুষ–তোমারই যদি এই অবস্থা হয় আমায় দেখে বা ভাল লেগে'–কোন তরুণী যদি কোনদিন ভালবাসতো আমায়, তাহলে তার কি অবস্থা হত!

---

২১. কবি এবং ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র।

২২. ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা লেখক আবুল হুসেন।

২৩. অধ্যাপক বোরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

২৪. কাজী আবদুল ওদুদ লেখক। তখন তিনি ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

তুমি এক জায়গায় লিখেছ, “মনে হয় যেন একটু দুঃখ পাচ্ছি–কিন্তু কি মধুর সে দুঃখ!” এ দুঃখ কি আমাকে হারিয়ে? আমায় বলতে তোমার সঙ্কোচ হবে না নিশ্চয়। সেতুই কি শেষে জলে পড়ে গেল?

আচ্ছা মোতিহার! তুমি যে দেবতার পায়ে “চুঙ্গল”[২৫] (অবশ্য তোমার এ-কথাটার মানে জানি না) এবং মাথায় শিং দেখেছ–সে দেবতা কি আমি? আমার বন্ধুরা আমার গোঁ ও শরীর দেখে আমায় “বাবা তারকনাথের ষাঁড়” বলে গালি দেন–শত্রুরাও অন্তত এই শরীরটার আর শিং দুটোর জন্যই ভয়ে জড়সড় কিন্তু এরি মধ্যে তুমি এ-কথা জানলে কি করে–বলত! এ জানার “সোর্স” কি ‘অন্য কেউ? তুমি আমার শিং দেখেছ তিনি ত আমার হয়ত দশটা মুণ্ডু বিশটা হাত দেখেছেন! কোরানে আছে–শয়তানের চেয়ে সুন্দর করে কাউকে সৃষ্টি করেননি খোদা। আমরাও ত বিউটিফুলের উপাসক,–জগতে সুন্দর ছাড়া পাপ-পুণ্য–মন্দ-ভালোর খবরই রাখিনে,–কাজেই শিং যে দেখবে ফুলচন্দন দিতে এসে, তাতে আর বিচিত্র কি?

আচ্ছা, সত্যি করে লিখোত, আমি যে তোমায় চিঠি দিয়েছি–এ খবর তুমি জেনেছিলে–না দেখেছিলে?

গত বছর এমনি দিনে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ঢাকায়। কিন্তু সে-বার ত তুমি অনেকটা দূরে দূরেই ছিলে। এবার কি খুব একটা দুঃখের ভিতর দিয়েই আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পেয়েছি? এ রহস্যের ত হদিস খুঁজে পাচ্ছিনে, বন্ধু! তোমরা গণিতবিদ, ক্লিয়ার ব্রেণ তোমাদের, হয়তো এর Solution খুঁজে পাবে।

"Sympathetic vibration" music-এ আছে জানতাম–ওটা mathematics-এও আছে জেনে mathematics-এর ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা, telepathyটা কি Science-এর না কাব্যের? এমনি দু'একটা জায়গায় এসে অঙ্কে-কবিতায়-বিজ্ঞানে-সুরে হৃদয়-বিনিময় হয়ে গেছে বোধ হয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে এইবার আমার নতুন করে মনে হচ্ছে–স্রষ্টা গণিতবিদ না কবি? লোকটা এত হিসেবি অথচ এত সুন্দর!

আমার বেদনার অনেকটা উপশম হয়েছে এই ভেবে যে, অন্তত একজনের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়েছে আমার পত্রের প্রতীক্ষায় থেকে–তা হোক না সে পুরুষ। আচ্ছা বন্ধু, এত শক্ত মনের পুরুষ, তার কান্না পায় আমার এতটুকু অবহেলায়,–আর একজন নারী–হোক না সে পাষাণ-প্রিয়তমা–তার কিছু হয় না? (আমার একজন

২৫. বাংলাদেশের কথ্য ভাষায় জন্তুর তীক্ষ্ণ নখরকে চোংগল বলা হয়। কাজী মোতাহার হোসেন চোঙ্গলকে চুঙ্গল লিখেছিলেন। কাজী নজরুলের পক্ষে এ শব্দটি না জানাই স্বাভাবিক।



বন্ধু আছেন প্রফেসার সাতকড়ি মিত্র[২৬]। রংপুরে ইকনমিক্সের অধ্যাপক। তিনি বাড়ি এলে আমার কাছেই থাকতেন দিনরাত তখন আমি কলকাতায় থাকতাম। তাই দেখে তাঁর স্ত্রী জানলায় দাঁড়িয়ে আমায় ‘সতীন’, ‘সতীন’ ব'লে গাল দিতেন। অনেক বন্ধুর স্ত্রীরই আমি ‘সতীন’।) কিন্তু ভাবতে পারছিনে–মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে বন্ধু একজন নারী–সেও এত নিষ্ঠুর হতে পারে?

যাক, আজ ডাকের সময় যাচ্ছে। আবার লিখব। কলকাতাতে ঐ ঠিকানায় চিঠি দিও। তুমি আমার ভালোবাসা নাও।

খোকা-খুকীদের চুমু দিও। ইতি–

তোমার<br>নজরুল

**[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত)**

১৫ জেলিয়াটোলা স্ট্রিট,<br>কলিকাতা<br>৮-৩-২৮<br>সন্ধ্যা।

প্রিয় মোতিহার!

পরশু বিকেলে এসেছি কলকাতা। ওপরের ঠিকানায় আছি। ওর আগেই আসবার কথা ছিল–অসুখ বেড়ে ওঠায় আসতে পারিনি।

দু'চারদিন এখানেই আছি। মনটা কেবলই পালাই পালাই করছে। কোথায় যাই ঠিক করতে পাছিনে। হঠাৎ কোনদিন কোন এক জায়গায় চলে যাব। অবশ্য দু'দশ দিনের জন্য।

যেখানেই যাই–আর কেউ না পাক, তুমি খবর পাবে।

২৬. তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইকনমিকস পড়াতেন। তখন তিনি যুবক। কাজী নজরুলের চেয়ে দু-এক বছরের বড় ছিলেন তিনি। কাজী নজরুলের ধূমকেতুর অফিস প্রতাপ চাটুজ্যে লেনে এক সময় তিনি থাকতেন। তার ছোট বোন হলেন লীলামিত্র। বয়স এগারো-বারো বছর হবে। তাঁর একটি ছোট লেখা ধূমকেতুতে ছাপা হয়েছিল ‘বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ’ নামে। কাজী নজরুলের ‘আনন্দময়ীর আগমনে’র সঙ্গে এই লেখাটিও বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

বন্ধু! তুমি আমার চোখের জলের 'মোতিহার', বাদল-রাতের বুকের বন্ধু। যেদিন এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর আর সবাই আমায় ভুলে যাবে, সেদিন অন্তত তোমার বুক ব্যথিয়ে উঠবে তোমার ঐ ছোট্ট ঘরটিতে শুয়ে–যে ঘরে তুমি আমায় প্রিয়ার মত জড়িয়ে শুয়েছিলে। অন্তত এইটুকু সান্ত্বনাও নিয়ে যেতে পারব। এ কি কম সৌভাগ্য আমার? সেদিন তোমার শয়নসাথী প্রিয়ার চেয়েও হয়ত বেশি করে মনে পড়বে এই দূরের বন্ধুকে। কেন এ-কথা বলছি শুনবে?

বন্ধু আমি পেয়েছি–যার সংখ্যা আমি নিজেই করতে পারব না। এরা সবাই আমার হাসির বন্ধু, গানের বন্ধু। ফুলের সওদার খরিদ্দার এরা। এরা অনেকেই আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছে, প্রিয় হয়ে ওঠেনি কেউ!

আমার চোখের জলের বাদল রাতে এরা কেউ এসে হাত ধরেনি। আমার চোখের জল! কথাটা শুনলে এরা হেসে কুটপাট হবে!

আমার জীবনের সবচেয়ে গোপন সবচেয়ে করুণ পাতাটির লেখা তোমার কাছে রেখে গেলাম। আমার দিক দিয়ে এর একটা কী যেন প্রয়োজন ছিল!...

আচ্ছা, আমার রক্তে রক্তে শেলীকে কীটস্‌কে এত করে অনুভব করছি কেন বলতে পার? কীটস্‌-এর প্রিয়া ফ্যানিকে লেখা তাঁর কবিতা পড়ে মনে হচ্ছে, যেন এ কবিতা আমিই লিখে গেছি'। কীটস্‌-এর 'সোর-থ্রোট' হয়েছিল–আর তাতেই মরল ও শেষে–অবশ্য তার সোর্স হার্ট কি না কে বলবে!–কণ্ঠপ্রদাহ রোগে আমিও ভুগছি ঢাকা থেকে এসে অবধি, রক্তও উঠছে মাঝে মাঝে–আর মনে হচ্ছে আমি যেন কীটস্‌। সে কোন ফ্যানির নিষ্করুণ নির্মমতায় হয়ত বা আমারও বুকের চাপ-ধরা রক্ত তেমনি করে কোনদিন শেষ ঝলকে উঠে আমায় বিয়ের বরের মত করে রাঙিয়ে দিয়ে যাবে।

তারপর হয়ত বা বড় বড় সভা হবে। কত প্রশংসা কত কবিতা বেরুবে হয়ত আমার নামে! দেশপ্রেমিক, ত্যাগী, বীর, বিদ্রোহী–বিশেষণের পর বিশেষণ! টেবিল ভেঙে ফেলবে থাপ্পড় মেরে–বক্তার পর বক্তা।

এই অসুন্দর শ্রদ্ধানিবেদনের শ্রাদ্ধ-দিনে–বন্ধু! তুমি যেন যেয়ো না। যদি পার, চুপটি করে বসে আমার অলিখিত জীবনের কোন একটি কথা স্মরণ করো। তোমার ঘরের আঙিনায় বা আশে-পাশে যদি একটি ঝরা, পায়ে-পেষা ফুল পাও, সেইটিকে বুকে চেপে বলো–"বন্ধু আমি তোমায় পেয়েছি।"

আকাশের সব চেয়ে দূরের যে তারাটির দীপ্তি চোখের জলকণার মত ঝিলমিল করবে–মনে করো সেই তারাটি আমি। আমার নামে তার নামকরণ করো! কেমন?

মৃত্যুকে এত করে মনে করি কেন জান? ওকে আজ আমার সব চেয়ে সুন্দর মনে হচ্ছে বলে। মনে হচ্ছে, জীবনে যে আমায় ফিরিয়ে দিলে, মরণে সে আমায় বরণ করে নেবে।



সমস্ত বুকটা ব্যথায় দিনরাত টনটন করছে–মনে হচ্ছে, সমস্ত রক্ত যেন ঐখানে এসে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। ওর যদি মুক্তি হয়, বেঁচে যাব। কিন্তু কী হবে, কে জানে?

হয়ত দিব্যি বেঁচে থাকব–কিন্তু ঐ বেঁচে থাকাটা অসুন্দর বলেই ওকে যেন দু'হাত দিয়ে ঠেলছি। বেঁচে থাকলে হয়ত তাকে হারাব। তারই বুকে তিলে তিলে আমার মৃত্যু হবে।

কেবলই মনে হচ্ছে, কোন নবলোকের আহ্বান আমি শুনতে পেয়েছি। পৃথিবীর সুধা বিস্বাদ ঠেকছে যেন।...

তোমার চিঠি পেয়ে অবধি, কেবলি ভাবছি আর ভাবছি। কত কথা–কত কি, তার কি কূল-কিনারা আছে।

কত কথা জানতে ইচ্ছে করে! কিন্তু কি সে কত কথা, তা বলতে পারিনে। দুদিন আগে পারতাম। আজ আর পারব না। হৃদয়ের প্রকাশ যেখানে লজ্জার কথা–হয়ত বা অবমাননাকরও, সেখান পর্যন্ত গিয়ে পঁহুচবে আমার কাঙাল মনের এই করুণ যাঞ্চা, এ ভাবতেও মনটা কেমন যেন মোচড় খেয়ে ওঠে।

আমার ব্যথার রক্তকে রঙিন খেলা বলে উপহাস যিনি করেন, তিনি হয়ত দেবতা–আমাদের ব্যথা-অশ্রুর বহু উর্ধ্বে। কিন্তু আমি "মাটির নজরুল" হলেও সে-দেবতার কাছে অশ্রুর অঞ্জলি আর নিয়ে যাব না।

কবির কাব্যের প্রতি এত অশ্রদ্ধা যাঁর–তাঁকে শ্রদ্ধা আমি যতই করি না কেন–পুনরায় কাব্যের নৈবেদ্য দিয়ে তাঁকে "খেলো" করবার দুর্মতি যেন আমার কোনদিন না জাগে।

ফুল ধুলায় ঝরে পড়ে, পায়ে পিষ্টও হয়, তাই বলেই কি ফুল এত অনাদরের? ভুল করে সে ফুল যদি কারুর কবরীতেই খসে পড়ে, এবং তিনি সেটাকে উপদ্রব বলে মনে করেন, তাহলে ফুলের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে তখনি কারুর পায়ের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করা।

পদ্ম তার আনন্দকে শতদলে বিকশিত করে তোলে বলেই কি ওটা পদ্মের বাড়াবাড়ি? কবি তার আনন্দকে কথায়-ছন্দে সুরে পরিপূর্ণ পদ্মের মত করে ফুটিয়ে রাঙিয়ে তোলে বলেই কি তার নাম হবে "খেলো"? অকারণ উচ্ছ্বাস সুন্দরের অবহেলা আমি সইতে পারিনে বন্ধু, তাই এত জ্বালা।

তুমি আমার "শেষ চিঠি" দেখেছ, লিখেছ। "শেষ চিঠি" লিখে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়েছ। তোমার এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব?

জল খুব তরল, সর্বদা টলটলায়মান,–কিন্তু যে দেশের ঋতুলক্ষ্মী অতিরিক্ত Cold সে দেশের জলও জমে বরফ হয়ে যায়–শুনেছ? অতিরিক্ত শৈত্যে জল জমে পাথর হয়, ফুল যায় ঝরে, পাতা যায় মরে, হৃদয় যায় শুকিয়ে। ...

ভিক্ষা যদি কেউ তোমার কাছে চাইতেই আসে অদৃষ্টের বিড়ম্বনায়, তাহলে তাকে ভিক্ষা না-ই-দাও, কুকুর লেলিয়ে দিও না যেন।...

আঘাত আর অপমান, এ দুটোর প্রভেদ বুঝবার মত মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ত আছে আমার। আঘাত করবার একটা সীমা আছে, যেটাকে অতিক্রম করলে–আঘাত অসুন্দর হয়ে ওঠে–আর তখনই তার নাম হয় অবমাননা।–গুণীও বীণাকে আঘাত করেই বাজান, তাঁর অঙ্গুলি আঘাতে বীণার কান্না হয়ে ওঠে সুর। সেই বীণাকেই হয়ত আর একজন আঘাত করতে যেয়ে ফেলে ভেঙে।

মন্থনের একটা স্টেজ আসে–যাতে করে সুধা ওঠে। সেইখানেই থামতে হয়। তারপরেও মন্থন চালালে ওঠে বিষ।

যে দেবতাকে পূজা করব–তিনি পাষাণ হন তা সওয়া যায়, কিন্তু তিনি যেখানে আমার পূজার অর্ঘ্য উপদ্রব বলে পায়ে ঠেলেন, সেখানে আমার সান্ত্বনা কোথায় বলতে পার...?

তুমি অনেক কথাই লিখেছ তাঁর হয়ে। তোমায় আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু একটা কথা তোমায় মনে রাখতে বলি, বন্ধু! আমার বেদনায় সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর সোজা কথাকে রঙিন করে বলে আমায় খুশি করতে চেয়ো না যেন। এতে আমি হয়ত একটু ক্ষুব্ধই হব।

আমার আহত অভিমানের দুঃখে তুমি ব্যথা পেয়ে কী করবে, বন্ধু? সত্যিই আমি হয়ত অতিরিক্ত অভিমানী। কিন্তু তার ত ওষুধ নেই। বীণার তারের মত নার্ভগুলো সুরে বাঁধা বলেই হয়ত একটু আঘাতে এমন ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে। ছেলেবেলা থেকে পথে পথে মানুষ আমি। যে স্নেহে যে প্রেমে বুক ভরে ওঠে কানায় কানায়–তা কখনো কোথাও পাইনি। শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা–শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ও নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব?...তাই হয়ত অল্পেই অভিমান হয়। বুকের রক্ত চোখের জল হয়ে দেখা দেবার আগেই তাকে গলার কাছে প্রাণপণ বলে আটকিয়েছি। এক গুণ দুঃখ হলে দশ গুণ হেসে তার শোধ নিয়েছি। সমাজ রাষ্ট্র মানুষ–সকলের ওপর বিদ্রোহ করেই ত জীবন কাটল!

এবার চিঠির উত্তর দিতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। না জানি কত উদ্বিগ্ন হয়েছ। কী করি বন্ধু, শরীরটা এত বেশি বেয়াড়া আর হয়নি কখখনো। ওষুধ খেতে প্রবৃত্তি হয় না। কেন যেন মরিয়া হইয়া উঠছি ক্রমেই। বুকের ভিতর কী যেন অভিমান অসহায় বেদনায় ফেনায়িত হয়ে উঠছে। রোজ তাই কেবলি গান গাচ্ছি। ডাকেরও অভাব নেই। রোজ অন্তত দশ জায়গা হতে ডাক আসে। কেবলি মনে হচ্ছে, আমার কথার পালা শেষ হয়েছে, এবার শুধু সুরে সুরে গানে গানে প্রাণের আলাপন। ...



কাল একটি মহিলা বলছিলেন, "এবার আপনায় বড় নতুন নতুন দেখাচ্ছে। যেন পাথর হয়ে গেছেন! সে হাসি নেই। সে কথার খই ফুটছে কই মুখে? বেশ ভাবুক ভাবুক দেখাচ্ছে কিন্তু।"

আচ্ছা ভাই মোতিহার, বলতে পারিস–তোর ফিজিক্স শাস্ত্রে আছে কি না জানিনে–আকাশের গ্রহতারার সাথে মানুষের কোনো relation আছে কি না। সত্যিই তারায় তারায় বিরহীরা তাদের প্রিয়ের আশায় অপেক্ষা করে?

আমার সবচেয়ে অবাক করে নিশীথ রাতের তারা। তার শব্দহীন উদয়াস্ত ছেলেবেলা থেকে দেখি আর ভাবি। তুমি হয়ত অবাক হবে, আমি আকাশের প্রায় সব তারাগুলিকে চিনি। তাদের সত্যিকার নাম জানিনে, কিন্তু ওদের প্রত্যেকের নামকরণ করেছি আমার ইচ্ছা মত। সে কত রকম মিষ্টি মিষ্টি নাম, শুনলে তুমি হাসবে। কোন্ তারা কোন্ ঋতুতে কোন দিকে উদয় হয়, সব বলে দিতে পারি। জেলের ভিতর যখন সলিটারি সেলে বন্ধ ছিলাম তখন গরমে ঘুম হত না; সারারাত জেগে কেবল তারার উদয়াস্ত দেখতাম তাদের গতিপথে আমার চোখের জল বুলিয়ে দিয়ে বলতাম–'বন্ধু, ওগো আমার নাম-না-জানা। বন্ধু! আমার এই চোখের জলে পিচ্ছিল পথটি ধরে তুমি চলে যাও অস্তপারের পানে, আমি শুধু চুপটি করে দেখি! হাতে থাকত হাতকড়া–দেয়ালের সঙ্গে বাঁধা, চোখের জলের রেখা আঁকা থাকত বুকে-মুখে-ক্ষীণ ঝর্ণাধারার চলে যাওয়ার রেখা যেমন করে লেখা থাকে।

আজও লিখছি–বন্ধুর ছাদে বসে। সব্বাই ঘুমিয়ে–তুমি ঘুমুচ্ছ প্রিয়ার বাহুবন্ধনে। আরো কেউ হয়ত ঘুমুচ্ছে–একা–শূন্য ঘরে–কে যেন সে আমার দূরের বন্ধু–তার সুন্দর মুখে নিবু নিবু প্রদীপের ম্লান রেখা পড়ে তাকে আরো সুন্দর আরো করুণ করে তুলেছে–নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে তার হৃদয়ের। ওঠাপড়া যেন আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি–তার বাম পাশের বাতায়ন দিয়ে একটি তারা হয়ত চেয়ে আছে–গভীর রাতে মুয়াজ্জিনের আজানে আর কোকিলের ঘুম জড়ানো সুরে মিলে তার স্তব করছে।–"ওগো সুন্দর! জাগো! জাগো! জাগো! ..."

আচ্ছা বন্ধু, ক'ফোঁটা রক্ত দিয়ে এক ফোঁটা চোখের জল হয়–তোমাদের বিজ্ঞানে বলতে পারে? এখন কেবলি জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে–যার উত্তর নেই মীমাংসা নেই সেই সব জিজ্ঞাসা।

যেদিন আমি ঐ দূর তারার দেশে চলে যাব–সেদিন তাকে বলো এই চিঠি দেখিয়ে–সে যেন দুটি ফোঁটা অশ্রু তর্পণ দেয় শুধু আমার নামে! হয়ত আমি সে দিন খুশিতে উল্কা-ফুল হয়ে তার নোটন-খোঁপায় ঝরে পড়ব।

তাকে বলো বন্ধু তার কাছে আমার আর চাওয়ার কিছু নেই। আমি পেয়েছি–তাকে পেয়েছি–আমার বুকের রক্তে, চোখের জলে। বড় বড় উঠেছিল মনে তাই

দুটো ঝাপটা লেগেছে তার চোখে মুখে। আহা! সুন্দর সে, সে সইতে পারবে কেন এ নিষ্ঠুরতা? সে লতার আগায় ফুল, সে কি ঝড়ের দোলা সইতে পারে? দখিনের গজল-গাওয়া মলয়-হাওয়া পশ্চিমের প্রভঞ্জনে পরিণত হবে–সে কি তা জানত? ফুল-বনে কি ঝড় উঠতে আছে?

বলো বন্ধু, আমার সকল হৃদয়-মন তারি স্তবগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আমার চোখ-মুখে তারই জ্যোতি–সুন্দরের জ্যোতি–ফুটে উঠেছে। পবিত্র শান্ত মাধুরীতে আমার বুক কানায় কানায় ভরে উঠেছে–দোল পূর্ণিমার রাতে বুড়িগঙ্গায় যেমন করে জোয়ার এসেছিল তেমনি করে। আমি তার উদ্দেশে আমার শান্ত স্নিগ্ধ অন্তরের পরিপূর্ণ চিত্তের একটি সশ্রদ্ধ নমস্কার রেখে গেলাম। আমি যেন শুনতে পাই, সে আমায় সর্বান্তকরণে ক্ষমা করেছে। আমার সকল দীনতা সকল অত্যাচার ভুলে আমাকে আমারো ঊর্ধ্বে সে দেখতে পেয়েছে–যেন জানতে পাই। ভুলের কাঁটা ভুলে গিয়ে তার ঊর্ধ্বে ফুলের কথাই যেন সে মনে রাখে।

সত্যিই ত তার–আমার সুন্দরের–চরণ ছোঁয়ার যোগ্যতা আমার নেই। আমার যে দু হাত মাখা কালি। বলল, যে কালি তার রাঙা পায়ে লেগেছিল, চোখের জলে তা ধুয়ে দিয়েছি।

আর–অগ্রদূত! বন্ধু! তোমায়ও আমি নমস্কার–নমস্কার করি। তুমি আমার তারালোকের ছায়াপথ। তোমার বুকেই পা ফেলে আমি আমার সুন্দরের ধ্রুবলোকে ফিরে এসেছি! তুমি সত্যই সেতু, আমার স্বর্গে ওঠার সেতু।

ভয় নেই, বন্ধু, তুমি কেন এ ভয় করেছ যে, আমি তার নারীত্বের অবমাননা করব। আমি মানুষের নীচে না উপরে, জানি না; কিন্তু তুমি ভুলে গেছ যে–আমি সুন্দরের ঋত্বিক। আমি দেবতার বর পেলাম না বলে অভিমান করে দু'দিন কেঁদেছি বলেই কি তাঁর অবমাননা করব? মানুষ হলে হয়ত পারতাম। কিন্তু বলেছি ত বন্ধু, যে, কবি মানুষের–হয় বহু ঊর্ধ্বে অথবা বহু নিম্নে। হয়ত নিম্নেই। তাই সে ঊর্ধ্বে স্বর্গের পানে তাকিয়ে কেবলি সুন্দরের স্তবগান করে।

আমি হয়ত নীচেই পড়ে থাকব; কিন্তু যাকে সৃষ্টি করব–সে স্বর্গেরও ঊর্ধ্বে

আমারও ঊর্ধ্বে উঠে যাবে। তারপর আমার মুক্তি।

সে যদি আমার কোনো আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে বলো–আমি তাকে প্রার্থনার অঞ্জলির মত এই করপুটে ধরে তুলে ধরতে–নিবেদন করতেই চেয়েছি।–বুকে, মালা করে ধরতে চাইনি। দুর্বলতা এসেছিল, তাকে কাটিয়ে উঠেছি। সে আমার হাতের অঞ্জলি, –button hole-এর ফুল-বিলাস নয়।...

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে আবার লিখছি। কিন্তু আর লিখতে পারছিনে ভাই! চোখের জল কলমের কালি দুই শুকিয়ে গেল।



তোমরা কেমন আছো জানিয়ো। তার কিছু খবর দাও না কেন? না, সেটুকুও নিষেধ করেছে? ঠিক সময়মত সে ওষুধ খায় ত?

কেবলি কীটস্‌কে স্বপ্ন দেখছি–তার পাশে দাঁড়িয়ে ফ্যানি ব্রাউন। পাথরের মত! ভালোবাসা নিও। ইতি–

তোমার–
নজরুল

এই ঠিকানাতেই চিঠি দিও। এবার 'সওগাতে' কিছু লিখতে পারিনি–শরীর মনের অক্ষমতার জন্য। এ মাসে লিখব অবশ্য।

ইতি–
নজরুল

**[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত]**

১৫, জেলিয়াটোলা স্ট্রিট
কলিকাতা
১০-৩-২৮, রাত্রি ২টা

প্রিয় মোতিহার!

কাল সকালে তোমার চিঠি পেয়েছি। সুন্দরের ছোঁয়া-লাগা চিঠি। তারই আনন্দে অভিভূত হয়ে কেটেছে আমার দুটো দিন। দুটি কথা তাতেই এত মধু!

কাল ঘুমুতে পারিনি। আজও কিছুতেই ঘুম এলো না। তাই তোমায় চিঠি লিখতে বসে গেলাম।

কাল থেকে মনে হচ্ছে, আমার সব অসুখ সেরে গেছে। সত্যি ভাই, আজ অনেকটা ভাল আছি।

আজ 'দেবদাস' দেখতে গেছিলাম ছায়াচিত্রে–সেকথা পরে লিখছি। রোসো আগে দরকারি কথা কয়টা লিখে নিই।

কাল আমার চিঠি পোস্ট করার একটু পরেই তোমার চিঠি এসে পঁহুচল।

আমার চিঠি বোধ হয়, আজ সন্ধ্যায় পেয়েছ। না? আচ্ছা, তোমরা কলকাতার চিঠি কখন পাও, সকালে না সন্ধ্যায়? মনে করে লিখো কিন্তু।

এতক্ষণ তুমি আমার চিঠি পড়ছ।

আচ্ছা ভাই, আমার সব চিঠিই কি তোমার বোনকে দেখাও? বড়্ডো জানতে ইচ্ছে করছে। চিঠিগুলো আবার ফিরিয়ে নাও ত?

উনি যদি দেখেন সব চিঠি, তা হলে একটু সাবধানে লিখব, বন্ধু। বাপরে। ওঁর একটা চিঠি পেয়েই তার তাল আজো সামলাতে পারছিনে। ওঁকে রাগাবার দুঃসাহস আর আমার নেই।

লিখি আর ভয়ে বুক দুরু দুরু করে কাঁপে, এই রে! বুঝি বা কোথায় কি বেফাঁস লিখে তাঁকে খেলো করে ফেললাম। এই বুঝি "কবির খেয়াল" হয়ে গেল লেখাটি!–এমনিতর ভয় সব।

আচ্ছা, তোমাদের গণিতজ্ঞদের মত দুটি লাইনে দু'হাজার কথার উত্তর লেখার কায়দাটা আমায় শিখিয়ে দেবে?

গণিতের প্রতি আমার ভয় কি কোনো দিনই যাবে না? গণিতজ্ঞ লোকেরা বড়্ডো কঠোর নিষ্ঠুর হয়–এ অভিযোগের সদুত্তর তুমি ছাড়া বুঝি আরেকটা নেই জগতে। ওদের কেবল intellect, heart নেই।

আমাদের যেমন কেবল heart, intellect নেই। একেবারে যাকে বলে 'সিলি ফুল'।

কিন্তু, একটা সত্যি কথা বলব? হেসো না কিন্তু। আমার এতদিনে ভারি ইচ্ছে করছে অঙ্ক শিখতে। হয়ত চেষ্টা করলে বুঝতে পারি এখনো জিনিসটে। আমি আমার এক চেনা অঙ্কের অধ্যাপকের কাছে পরশু অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা করলাম অঙ্ক নিয়ে। এম,এ, ক্লাসে কি অঙ্ক কষতে হয়–সব শুনলাম সুবোধ বালকের মত রীতিমত মন দিয়ে। শুনে তুমি অবাক হবে যে, আমার এতে উৎসাহ বাড়ল বই কমল না। কেন যেন এখন আর অত কঠিন বোধ হচ্ছে না ও জিনিসটে। আমি যদি বি-এটা পাস করে রাখতাম, তাহলে দেখিয়ে দিতাম যে, এম, এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট কবিও হতে পারে ইচ্ছে করলে।

যদি ঢাকায় থাকতাম, তাহলে তোমার কাছে আবার একবার যাদব চক্রবর্তী[২৭]র Algebra নিয়ে বসে যেতাম–একেবারে $(a+b)^2$ থেকে শুরু করে। সত্যি ভাই মোতিহার, আমায় অঙ্ক শেখাবে? তাহলে ঢাকায় যেতে রাজি আছি। এমন অঙ্ক শিখিয়ে দিতে পারে না কেউ, যাতে করে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এম, এ.-কে হারিয়ে দিতে পারি?

---

২৭. যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট গণিতবিদ। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'গণিত সম্রাট' উপাধি দিয়েছিল। তাঁর 'পাটিগণিত' গ্রন্থটি বিখ্যাত।



এখন কেবলি মনে হচ্ছে, কী ছাই করলাম কবিতা লিখে! তার চেয়ে অঙ্কের প্রফেসর হলে ঢের বেশি লাভবান হতে পারতাম।

যাক। তোমার বোনকে বলো, এত দূরে থেকেও তাঁর ভয় আর আমার গেলো না। বেশি চা ও পান খেতে তিনি একদিন এমনি কথায় কথায় নিষেধ করেছিলেন, সেই অবধি ঐ দুটো জিনিস মুখের কাছে তুলেই এতটুকু হয়ে যাই ভয়ে। হাত কাঁপতে থাকে। আমার স্কুলের অঙ্কের মাস্টার ভোলানাথ বাবুকে মনে পড়েও অত ভয় হয় না।

ওকে বলল, "অবুঝের মত অত্যাচার" করতে হয়তো এখন থেকে ভয়ই হবে।

অঙ্কের মহিমা আছে বলতে হবে।

কিন্তু মন কেন এমন করে অবুঝের মত কেঁদে ওঠে? ওখানে যে আমি নাচার।

ওঁকে একটা অনুরোধ করবে বন্ধু আমার হয়ে? বলো–"যাকে ভাসিয়ে দিয়েছ স্রোতে, তাকে দড়ি বেঁধে ভাসিয়ো না! ওকে তরঙ্গের সাথে ভেসে যেতে দাও, পাহাড় কি চোরাবালি কি সমুদ্র এক জায়গায় গিয়ে সে ঠেকবেই।" যেই সে স্রোতে ভাসতে যাবে, অমনি দড়ি ধরে টানবে–এ হয়ত তার খেলা, আমার কিন্তু এ যে মৃত্যু।

একটি ছোট্ট আদেশের বেড়া এমন অলঙ্ঘ্য হয়ে ওঠে, তা কে জানত!

তোমার চিঠির কতকগুলো দরকারি কথার উত্তর দিতে হবে। কালকের চিঠিতে যা সব লিখেছি, তা ত তোমার চিঠির উত্তর নয়। তা হয়তো "কবির খেয়াল।"

তবে ও রোগে তোমাকেও ধরেছে বলে তোমায় লিখতে ভয় নেই।

এই চিঠি পড়ে যদি কেউ রাগ করেন, তাহলে তাকে বলো–পাথরের রাগ করতে নেই। তাহলে পাথর নড়তে হয়?

তোমার বৌ বেচারির বয়স কত হল! নিশ্চয়ই এখন ছেলেমানুষ। তার ওপর, তোমার মত ছেলেমানুষ নিয়ে ঘর করা। ও ব্যাচারিরই বা দোষ কি?–দাঁড়াও বন্ধু, আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিই–তোমার বৌ-ও কি আমার চিঠি পড়েন? দোহাই ভাই, ও কর্মটি করো না। এ চিঠি কেবল তোমার জন্য। আরেকজনকে দেখাতে পার, যদি তাঁর আমার উপর শ্রদ্ধার হানি না হয় এ চিঠি প'ড়ে।

আমি হাত গুনতে পারি। আমি জানি, তুমি যেদিন শিশির ভাদুড়ীর ভ্রমর দেখে এসেছিলে, সেদিন সারারাত বৌ-এর রসনা-সিক্ত মধু-বিষের আস্বাদ পেয়েছিলে। অন্তত তাঁর মাথার কাঁটাগুলোর চেয়ে বেশি বিঁধেছিল তাঁর কথাগুলো সেদিন তোমার বুকে। তারপর সেদিন চাঁদনি-রাতে কোনো অপরাধের জন্য সারারাত "দেহি পদ-পল্লবমুদারম" গাইতে হয়েছিল শ্রীমতির পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে!

তোমার বৌ-এর ভাগ্য ভাল ভাই, হিংসে হয় এক-একবার! দেখো, তোমার বৌ-ও এই চিঠি লেখার আর প্রিয় সম্ভাষণের ঘটা দেখে আমায় সতীন না ঠাওরান!

যাক উড়ের লড়াই-এর মত দাম্পত্য কলহ বলতে বহারম্ভে লঘু-ক্রিয়া। এতদিনে তোমার চিরদিনের "ওগো" সম্ভাষণের ফাটলে সিমেন্ট পড়েছে বোধ হয়। রোজকার মত বাহুতে চুড়ির এবং বুকে নাকছাবির চাপের পুলক অনুভব করছ! আমি এইখানে থেকেই শান্তিমন্ত্র পাঠ করছি। তোমার শিগগির আর একটি খোকা হোক! বাঢ়ম্!

ভাগ্যিস এবার 'সওগাতে' কিছু লিখিনি, তাই কারুর চোখে পড়ার সৌভাগ্য হয়ে গেছে আমার। সেই কারুর'কে বলো, লিখলে যে লেখা চোখে পড়ত–তাতে হয় তো চোখ-করকর করত! চোখের জল চাই বলে কি 'চোখের বালি' হয়ে সেই জল দেখব?

এতদিন লিখেছি বলেই হয়ত চোখে পড়িনি, আজ না লিখে যদি চোখে পড়ে থাকি, তাহলে আমার না-লেখা অক্ষয় হোক! ওর পরমায়ু বেড়ে যাক! আমি কিন্তু ফাল্গুনের 'সওগাত আজো চোখে দেখিনি। কাজেই ওতে কি আছে না আছে–জানিনে। অবশ্য আমি ইচ্ছে করলে হয়ত কিছু না কিছু লেখা দিতে পারতাম। ইচ্ছে করেই দিইনি। কিছু ভাল লাগছে না ছাই। কেবলই ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছে–নিরুদ্দেশভাবে। অনেক দূর-দূরান্তরে।

আমার সাদা পাতার জয়জয়কার হোক। ঐ পাতাটাই আজ অন্তত ভুল করেও এক-জনকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

তোমার বোন ঢাকা থাকতে আমি ওখানকার কাজ নেবো না–একথাও শুনেছ?

যাক্ শুনেইছ যখন, তখন সব কথা খুলেই বলি। তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিই, তিনি আমার সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কিভাবে কথা বলেন? তিনি কি তার এবং আমার সব কথাই তোমাকে বলেছেন? না তুমি আন্দাজি আঁচ করে নিয়েছ সব? তুমি কিন্তু খলিফা ছেলে! ভয়ানক দুষ্ট! কিউপিডের মত।

তোমার কাছে অন্তত আমার দিকটা ত আর লুকোছাপা নেই। আমার জীবনে এত বড় পরিবর্তন এত বড় সৌভাগ্য আর আসেনি, বন্ধু। যে বেদনার সাথীকে কবিতায় কল্পনায় স্বপ্নে খুঁজে ফিরেছি–রূপে রূপে যার স্ফুলিঙ্গ দেখেছি, তাকে দেখেছি–পেয়েওছি, বুকের বেদনায় চোখের জলে। কয় মুহূর্তের দেখা, তারি মাঝে তাঁর কত বিরক্তিভাজন হয়েছি, হয়ত বা কত অপরাধও করে ফেলেছি। পাওয়ার বেভুল আনন্দে যে আত্মবিস্মৃতি আমার ঘটেছে, তা তাঁর ঘটেনি। কাজেই আমি কী করেছি, না করেছি, কী লিখেছি, না লিখেছি, তা আমার মনেও নেই, কোনদিন মনে পড়বেও না। কেবল মনে আছে তাকে তার প্রতিটি গতি-ভঙ্গি, হাসি কথা চলাফেরা সব। ঐ তিনদিনের দেখা তাঁকে আজো তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার চোখের সামনে। তেমনি হাসি, তেমনি কথা–সব! ফিরে ফিরে মনে আসছে ঐ তিনদিনের



মানুষটি। একবার নয়, দু'বার নয়, দিনে হাজারবার করে। আমার সকল চিন্তা কল্পনা হাসি গান ঘুম জাগরণ-সব কিছুতে দিবারাত্তির জড়িয়ে আছে ঐ কয়েক মুহূর্তের স্মৃতি। ঐ তিনটি দিন আমার কাছে অনন্ত কালের মত অক্ষয় হয়ে রইল। তার আঘাত, বেদনা, অশ্রু আমার শাশ্বত লোকের শূন্য-ভান্ডার পূর্ণ করে দিয়েছে। এর বেশি পেতে গেলে যে আঘাত পাব, তা সইতে পারব না, বন্ধু! যে পূজারী দেবতা প্রকাশের আরাধনা করে, তার মত দুঃসাহসী বোধ হয় কেউ নেই। সুন্দর দেবতাও প্রথমে হয়ত দেখা দেন রুদ্ররূপে। সে আঘাত কি সকলে সইতে পারে?

দূর থেকে অঞ্জলি নিবেদন করব–সকলের আড়ালে সরে গিয়ে আমার হৃদয়রক্ত দিয়ে তাঁকে সৃষ্টি করব, রাঙিয়ে তুলব–শুধু এইটুকু অহঙ্কার থাকুক আমার। তাঁর পায়ের তলার পদ্মটিতেই আমার ধ্রুকে পাই যেন, তার উর্ধ্বে তাকালে স্থির থাকতে পারব না।

আমার পূজার উপচারের আড়ালে লুকাতে পারি যেন নিজেকে–দেবতা যেন পূজাই দেখতে পায় এবার–পূজারীকে নয়। আশীর্বাদ করো–ধ্রুবলোক অক্ষয় হোক এবার। অনেক পেয়েছি বন্ধু! ঋণের বোঝা আমাকেও ছাড়িয়ে উঠেছে। এবার শোধার পালা। যত চোখের জল আমার উদ্দেশে ঝরেছে যেখানে–তার সুদ সমেত ঋণ শোধ করব এবার।

যাবার দিনে অনেক পেয়েছি বন্ধু! ঋণের বোঝা আমাকেও ছাড়িয়ে উঠেছে। এবার শোধার পালা। যত চোখের জল আমার উদ্দেশে ঝরেছে যেখানে–তার সুদ সমেত ঋণ শোধ করব এবার। পরিপূর্ণ চিত্তে যেন বলে যেতে পারি, আমি ধন্য হয়ে গেলাম– আমি ভালোবেসে মরলাম। তাঁকে বলল, আমার ধ্যান-লোকে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। আমার আর তাকে হারাবার ভয় নেই।

১৮.৩.২৮

দশই তারিখের লেখা চিঠিটা পোস্ট করিনি; রোজ মনে করেছি–হয়ত। তোমার চিঠি চলে আসবে আজ। তার পরই এটা দেবো।

আজ ১৮ই মার্চ। আমি চিঠি পোস্ট করেছি ১০ই তারিখে, অন্তত ১২ই তারিখে তা পেয়েছ। পাওনি কি?

আজও তার উত্তর দিলে না কেন? না, এরি মধ্যে পুরোনো হয়ে গেলাম, বন্ধু? যা হোক একটা লিখো–শান্তি পাব। সব কথার উত্তর না-ই দিলে, এমনি চিঠি দিও।

আমি এখন ভাল আছি। এ কয়দিন বিনা-কাজের ভিড়ে এক চিন্তা ছাড়া–লিখতে পারিনি কিছু।

এর মধ্যে একটা মজা হয়ে গেছে। তেমন কিছু নয়, তবু তোমায় লিখছি। 'দৈনিক বসুমতী'তে দিনকতক আগে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল যে, কোন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক মৃত্যুশয্যায় শায়িত–কোনো সুস্থকায় যুবকের কিছু রক্ত পেলে তিনি বাঁচতে পারেন। তিনি কলকাতাতেই থাকেন। আমি রাজি হয়েছি রক্ত দিতে। আজ

ডাক্তার পরীক্ষা করবে আমায়। আমার দেহ থেকে রক্ত নিয়ে ওঁর দেহে দেবে। ভয়ের কিছু নেই এতে, তবে দু'চারদিন শুয়ে থাকতে হবে মাত্র। কী হয়, পরে জানাব—কাজেই দু'চারদিন চিঠি দিতে দেরি হলে কিছু মনে করো না, লক্ষ্মীটি।

এটি আমার—তোমার বন্ধুর অনুরোধ, একথা কাউকে জানিয়ো না যেন। কাউকে মানে—তাকেও[২৮] জানিয়ো না।

আজ আর সময় নেই। এখুনি, বেরুব ডাক্তারের কাছে। আমার বুক-ভরা ভালোবাসা নাও। তোমার ছেলেমেয়েদের চুমু খেয়ো আমার হয়ে।

তাঁর খবর একটু দিস্ ভাই। এ কয়দিন ত শুয়েই থাকব, ওটুকু পেলেও বেঁচে যাব।

তোমার
নজরুল

[কাজী নজরুলের সঙ্গে মিস ফজিলাতুন্নেসার পত্র বিনিময় ও যোগাযোগ ছিল। কবি যে তাঁকে গভীরভাবে ভালোবেসে ছিলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে অনেকগুলি কবিতা রচনা করেছিলেন। ১৯২৮ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে কাজী নজরুল ঢাকায় এলে ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সে সময় কাজী নজরুল বর্ধমান হাউসে কিছু দিন অবস্থান করেছিলেন। ঢাকাতে সে সময় পরিচয় হয় প্রতিভা সোম ও উমা মৈত্রের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গেও কাজী নজরুলের পত্রালাপ হয়। ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসবার পরে তিনি তাদের নিয়মিত পত্র লিখতেন। নিম্নলিখিত পত্রটি ফজিলাতুন্নেসাকে লিখেছিলেন।]

১১, ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিট
সওগাত অফিস
কলিকাতা,
শনিবার-রাত্রি ১২টা

আজ ঈদ-ঈদ মোবারক।

অসহায় হইয়া আপনার এই পত্র লিখিতেছি। যদি বিরক্ত করিয়া থাকি, মার্জনা করিবেন। আজ ১৪দিন হইল মোতাহার সাহেবের কোনো চিঠি পাই নাই। তাহার শেষ চিঠি পাইয়াছি ১০ই মার্চ[২৯]। তাহার পর আমি তাহাকে দুইখানা পত্র দিয়াছি

---

২৮. মিস ফজিলাতুন্নেসা।
২৯. এনভেলাপের উপর পোস্ট অফিসের ছাপ অনুযায়ী ২৮শে মার্চ ১৯২৮ সালে এ পত্র পোস্ট করা হয়েছিল।



১০ই ও ১৮ই মার্চ। আজও কোন উত্তর না পাইয়া ছটফট করিতেছি। জানি না। তিনি ঢাকায় আছেন কিনা, না অসুখ করিয়াছে—কত কি মনে হইতেছে। আপনার শারীরিক সংবাদটুকুও তাহার মারফতই পাইতাম। বড় উদ্বিগ্নে দিন কাটাইতেছি।

আপনি যদি দয়া করিয়া—জানা থাকিলে আজই দু'লাইন লিখিয়া তাঁহার খবর জানান, তাহা হইলে সবিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব।

তিনি আমার ঐ চিঠি দুইখানা পাইয়াছেন কিনা জানেন কি? তিনি কি আমার উপর রাগ করিয়াছেন? না অন্য কারণ? জানা না থাকিলে জানাইবার দরকার নাই।

আমি সওগাতের লেখা লইয়া বড় ব্যস্ত আছি। কলিকাতায় আরো দুই চারিদিন আছি। পত্র সওগাতের অফিসের ঠিকানাতেই দিবেন।

আপনার শরীর খুবই অসুস্থ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। কেবলি মনে হয়, যেন আপনার শরীর ভাল নাই। দু'দিনের পরিচয়ের এত বড় আস্পর্ধাকে আপনি হয়ত ক্ষমা করিবেন না, তবু সত্য কথাই বলিলাম।

—আপনাকে দিয়া বাংলার অন্তত মুসলিম নারী-সমাজের বহু কল্যাণ সাধন হইবে—ইহা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। তাই আপনার অন্তত কুশল সংবাদটুকু মাঝে মাঝে জানিতে বড়ডো ইচ্ছা করে। যদি দয়া করিয়া দুটি কথায় শুধু কেমন আছেন লিখিয়া জানান—তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চির-ঋণী থাকিব। আমার ইহা বিনা অধিকারের দাবি।

আমি এখন বেশ ভালই আছি। আর একটা কথা। আপনি বার্ষিক সওগাতের জন্য একটি গল্প দিয়াছেন 'শুধু দু'দিনের দেখা' শীর্ষক। সওগাত সম্পাদক আমায় তাহা দেখিয়া দিতে দিয়াছেন। কিন্তু আপনার অনুমতি ব্যতীত তাহার একটি অক্ষর বদলাইবারও সাহস নাই আমার, আমি লেখাটি পড়িয়াছি। যদি ধৃষ্টতা মার্জনা করেন—তাহা হইলে আমি উহার এক-আধটু অদল-বদল করিয়া ঠিক গল্প করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি। সামান্য এক আধটু বাড়াইয়া দিলেই উহা একটা ভাল গল্প হইবে। অবশ্য এ স্পর্ধা আমার নাই যে আপনার লেখার তাহাতে কিছুমাত্র সৌন্দর্য বা গৌরব বাড়িবে। মনে হয় গল্পটা বড়ডো তাড়াতাড়ি লিখিয়াছেন। উহা যেন আপনার অযত্ন-লালিতা।

অবশ্য আপনার অসম্মতি থাকিলে যেমন আছে তেমনটা ছাপিবেন সম্পাদক সাহেব। আপনার অমত থাকিলে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন, কিছু মাত্র দুঃখিত হইব না তাহাতে।

আর আমার লিখিবার কিছু নাই। আপনার খবরটুকু পাইলেই আমি নিশ্চিত হইতে পারিব।

হাঁ আর একটি কথা। আমার আজ পর্যন্ত লেখা সমস্ত কবিতা ও গানের। সর্বাপেক্ষা ভাল যেগুলি সেগুলি চয়ন করিয়া একখানা বই ছাপাইতেছি 'সঞ্চিতা'[৩০] নাম দিয়া। খুব সম্ভব আর এক মাসের মধ্যেই উহা বাহির হইয়া যাইবে।

আপনি বাংলার মুসলিম নারীদের রানী। আপনার অসামান্য প্রতিভার উদ্দেশে সামান্য কবির তাপার শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ 'সঞ্চিতা' আপনার নামে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে চাই। আশা করি এজন্য আপনার আর সম্মতিপত্র লইতে হইবে না। আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার জীবনের সঞ্চিত শ্রেষ্ঠ ফুলগুলি দিয়া পুস্পাঞ্জলি অর্পণ করা ব্যতীত আপনার প্রতিভার জন্য কি সম্মান করিব?

সুদূর ভক্ত কবির এই একটি নমস্কারকে প্রত্যাখ্যান করিয়া পীড়া দিবেন না–এই আমার আকুল প্রার্থনা।

দুই একদিনের মধ্যেই আমার লেখা সব বইগুলি পাঠাইয়া দিব আপনায়।

আপনার মত বিদুষী মহিলার পড়ার তাহা উপযুক্ত নয়, তবু দিব। আপনার। আঙিনায় season flower-এর গাছ দেখিয়াছিলাম যেন। তাহারও ত যত্ন নেন দেখিয়াছি। সুতরাং আমার লেখাও ফেলিবেন না, ভরসা করি।

একটু কষ্ট করিয়া আজই পত্র দিবেন। আপনার ভগ্নিদেরে ও ভাইকে স্নেহাশিস দিবেন।

ইতি<br>
নজরুল ইসলাম

[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত এই পত্রে উল্লেখিত 'দিলীপ' হচ্ছেন সুরশিল্পী দিলীপকুমার রায়। নজরুলের 'উমর ফারুক' ১৩৩৪ সনের দ্বিতীয় বার্ষিক 'সওগাতে' 'এ মোর অহঙ্কার' ১৩৩৪ চৈত্রের, 'রহস্যময়ী' ১৩৩৫ বৈশাখের এবং 'হিংসাতুর' ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠের মাসিক সওগাতে বেরিয়েছিল। 'রহস্যময়ী' কবির 'চক্রবাক' কাব্যে 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ থেকে সওগাতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৫ বৈশাখে ঢাকা থেকে মাসিক 'জাগরণ' বের হয়। 'জাগরণ'-এ নজরুলের 'পেয়ে কেন নাহি পাই হৃদয়ে মম' গানটি বেরিয়েছিল।]

৩০. কাজী নজরুল শেষ পর্যন্ত 'সঞ্চিতা' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন। কি কারণে মিস ফজিলাতুন্নেসাকে পরে উৎসর্গ করেননি তা জানা যায় না।



The saogat<br>
11, wellesly street<br>
Calcutta. 31-3-1924

প্রিয় মোতিহার!

একটু আগে তোমার চিঠি পেলাম। বড়ো মন যেন কেমন করছে।... সওগাতের (বার্ষিকের, মাসিকের) লেখা শেষ করেছি বিকেলে। আজ আমার মুক্তি, বাণীর মন্দির-দুয়ার থেকে অলক্ষ্মীর উন্মুক্ত প্রান্তরে।... গাঠরি বাঁধাবাঁধি করে রাখলুম নিশ্চিন্তে কোথাও একটু হাফ ছেড়ে বাঁচবার জন্য। এখখুনি হুগলি যাব, একজন সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়িতে সন্ধ্যায় গান। সেখানে দুদিন থেকে বোধ হয় কৃষ্ণনগরেই যাব। কলকাতায় কুড়ি-একুশ দিন কাটল, আর ভালো লাগে না এক জায়গা। ... তোমার চিঠি হয়ত কৃষ্ণনগর গিয়ে পড়ে আছে। তবে সে চিঠি যেমন redirect করে পাঠাবারও কারও তাগিদ নেই, তেমনি তা খুলে পড়ে দেখবারও কেউ নেই। আমার চিঠি ওরা খোলে না। তাদের খবর জানতে চেয়েছ–তারা ভালোই আছে হয়ত, কেননা ওরা ভালো থাকলে চিঠি দেয় না। অন্য কি খবর চাও–লিখো। পারি যদি উত্তর দেবো।... তুমি ভাবতে পার বন্ধু, একটি অন্ধকার ঘরে দুজন দুজনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে কাঁদছে। ভাবছ কী অমানুষ আমি! নয়? তাই ভাবো।...

তোমার চিঠির জন্য কী করে যে কাটিয়েছি এ কয়দিন, তা যদি বুঝতে, তাহলে তোমার চিঠি লিখবার অবসরের অভাব হত না। আজ যদি তোমার চিঠি না আসত তাহলে তোমায় আর কখনো চিঠি দিতাম না। কি যে রাগ হচ্ছিল তোমার উপর সে কী বলব : এক একবার মনে হয়েছে, খুব করে গাল দিয়ে তোমায় শেষ চিঠি দিই, একেবারে "সবিনয় নিবেদন থেকে শুরু করে। কিন্তু তুমি কৃষ্ণনগরের ঠিকানায় চিঠি দিলে কেন? আমি ত কোন চিঠিতে লিখিনি বোধ হয় যে, সেখানে যাব এখন।

আমি আবার বিষ্যুৎবার কলকাতা ফিরে আসব। সেদিন সন্ধ্যায় Broadcasting[৩১]-এ আমার গান গাইতে হবে। তোমাদের ঢাকায় wireless সেট নেই কারুর? তাহলে শুনতে পেতে হয়ত। কী গ্র্যান্ড হত বল ত তাহলে! আমি-এখান থেকে গান করতাম আর তোমরা ঢাকা থেকে শুনতে। এখন থেকে হপ্তায়

৩১. কলকাতা ও বোম্বাই এ ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির প্রেরণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯২৭ সালে। ১৯২৮ সালে ভারতবর্ষে এ দুটোই প্রেরণ কেন্দ্র ছিল। দমদমে HMV-র গ্রামোফোন কোম্পানিতে কাজী নজরুল গান দিতেন।

অন্তত দুতিন দিন করে গাইতে হবে আমায় Broadcasting-এ। আমি বিষ্যুৎবার দুটো গান আর আমার নতুন কবিতা "রহস্যময়ী" আবৃত্তি করব। "রহস্যময়ী" চৈত্রের সওগাতে বেরুবে। ওর 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' নামটা বলে 'রহস্যময়ী' করেছি। দেখ এক কাজ করা যায়। Broadcasting Company আমায় একটা মেশিন প্রেজেন্ট করবে–সেইটে তোমায় প্রেজেন্ট করব আমি। ওরা ওটা দিলেই তোমায় পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু ঠিক করে নিতে পারবে ত? তোমরা বৈজ্ঞানিক, গণিতজ্ঞ, হয়ত পারবে।

লিখছি, আর কেন যেন মন কেঁদে কেঁদে উঠছে। তোমার বোনের অসুখ, অথচ তুমি জানাওনি এর আগে? তুমি না জানালেও রোজ দেখেছি তারে ঘুমের আড়ালে–স্থির, শান্ত, উদাস–রোগ-পাঞুর। সন্ধ্যা-তারাটির মত। কেবলি মনে হয়েছে কত যেন অসুখ করেছে তার। তবু শফিক[৩২] এসেছে শুনে অনেকটা আশ্বস্ত হওয়া গেল। শফিক তার বাঁশিতে গানে তাকে অনেকটা ভালো রাখতে পারবে। শফিক কি দু'এক দিনের মধ্যেই চলে যাবে আবার? আচ্ছা ভাই মোতিহার, তোমার কথা তো তোমার বোন শোনেন; তাকে বুঝিয়ে তার বাড়ি পাঠিয়ে দাও না। মা বাপে কোলে থাকলে হয়ত অনেকটা ভালো থাকবে। আমার কেবলই ভয় করে

কেন? কী যেন ভয়। তা ঠিক বলতে পারছিনে! শফিককে এখন যেতে মানা করো। কি হবে দু'টো মাস কামাই করলে? শফিক থাকলে সে ভালো হয়ে যাবে, অন্তত ওষুধটা খাবে হয়ত সময় মতো।

যাক, তোমার চেয়ে বা আর-কারুর চেয়ে ত তাঁর শুভার্থী কেউ নেই। কিন্তু তবু কেন শান্তি পাই না? দিলীপের গান শোনার পর কি আর আমার গান ভালো লাগবে? এমনিই ত আমার গান ভালো লাগেনি! আফতাবউদ্দিনের বাঁশি শুনলে কেমন? অদ্ভুত লোকটা, না?

তোমার আমন্ত্রণ হয়ত নিলাম। আমার আবার কাজ কি? লিখি, গান করি, আড্ডা দিই, আর ঘুরে বেড়াই–এই বই ত না! তবে শফিককে গান শেখাতে পারব কি না জানিনে। শুনেছি, শফিক খুব ভালো গান জানে। অন্তত ওর বাঁশি শোনবার জন্য যাব। হাঁ, আর একটা খবর দিই তোমায়। আগামী ১৪ই এপ্রিল আমি গ্রামোফোনে গান ও আবৃত্তি দিচ্ছি। তা বেরুবে হয়ত জুলাই-এ।

বার্ষিক 'সওগাতে' দু'টো কবিতা দিলাম–উমর ফারুক' আর 'হিংসাতুর'। চৈত্রের সওগাতে 'রহস্যময়ী' (কবিতা), 'মৃত্যুক্ষুধা'র continuation, আরেকটা কবিতা ও একটা গজল-গান যাচ্ছে। চৈত্রের সওগাত' বেরুবার দেরি আছে! আগে

৩২. শফিক ওরফে শফিকুন্নেসা হলেন মিস ফজিলাতুন্নেসার ছোট বোন। সে তখন ক্লাস নাইনে পড়তেন।



বার্ষিকীটা বেরুবে–আর এক সপ্তাহের মধ্যেই।... আরো অনেকগুলো কবিতা লিখেছি। ইচ্ছা করে, সবগুলো পাঠিয়ে দিই, কিন্তু পাঠাব না–ভয় নেই। যে কাগজে বেরোয়, তা-ই পাঠাব এখন থেকে। জাগরণ'-এর জন্য লেখা চাওয়ার অর্থ বুঝলাম না। 'জাগরণ' বলে কাগজ বেরুচ্ছে নাকি, না বেরুবে? কার কাগজ? চিঠি লিখবার আগের একটা ছোট্ট কবিতা লিখছিলাম–সেইটেই দিচ্ছি এই সাথে। দরকার হলে কাজে লাগাতে পার।.... তোমার "চোখের জ্বালা" হল কেন আবার? চোখের বালির জন্য?

'দু'দিনের দেখা'[৩৩] গল্পটার এমন কিছু বেশি পরিবর্তন করিনি। মাঝে মাঝে দু'চারটে লাইন সংযোগ বা বিয়োগ করেছি মাত্র। তাতে তাঁকে ছাড়িয়ে আমি উঠিনি,–তুমি তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলো। ওটা ছাপা হয়ে গেছে। বলো যদি, পাঠিয়ে দিতে পারি ঐ ফর্মাটা। আচ্ছা, ব্যবস্থা করছি ওটা পাঠাবার।... আজ আমার বইগুলো পাঠাব তাকে। সব বই ছাপা নেই। অনেকগুলো out of print হয়ে গেছে। তোমকেও পাঠাব দুদিন পরে। আজ আর সময় নেই বলে এ-কথা বলছি। অভিমান করো না লক্ষ্মীটি!।

এপ্রিলের শেষাশেষি বা ছুটিতে তোমার বোন কোথায় থাকবেন? ঢাকায় না অন্য কোথাও, অবশ্য জানিও। ভুলো না যেন। ছানু কখন ফিরবে? তাড়াতাড়ি উত্তরটা দিও, লক্ষ্মীটি! ভালোবাসা নাও।

শরিফের বিয়ের কী হলো? নূরুন্নবী চৌধুরী[৩৪] এসেছিলেন কি?

...রক্তদান করিনি। ডাক্তার-শালা বলে, হার্ট দুর্বল। শালার মাথা! মনে হচ্ছিল, একটা ঘুষি দিয়ে দেখিয়ে দিই কেমন হার্ট দুর্বল। ভিতরের কথা তা নয়। ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক 'মুসলমানের রক্ত নিতে রাজি হলেন না! হায় রে মানুষ, হায় তার ধর্ম! কিন্তু কোনো হিন্দু যুবক আজও রক্ত দিলে না। লোকটা মরছে–তবুও নেবে নেড়ে'র রক্ত।

দেরি হয়ে গেল–তবু ঈদের কোলাকুলি নাও... হ্যাঁ, আমি ঢাকা যেতে রাজি আছি তোমার লিখিত শর্তমত। তবে আমারও একটা শর্ত আছে। সে হচ্ছে, আমি যদি কোনোদিন হঠাৎ চলে আসতে চাই কোনো কারণে,–বা অকারণে, তা হলে আটকে রাখতে পারবে না। এই একটি শর্ত শুধু।

তোমার
নজরুল

৩৩. অন্যান্য পত্রেও এই গল্পটির কথা উল্লেখ আছে।
৩৪. নূরন্নবি চৌধুরী ছিলেন আইসিএস কর্মকর্তা।

[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত। ১৩৩৪ আষাঢ় শ্রীঅজিতকুমার দত্ত ও শ্রীবুদ্ধদেব বসুর যুগ্ম সম্পাদনায় ঢাকা থেকে মাসিক 'প্রগতি' বের হয়। ১৩৩৪ চৈত্রের 'প্রগতি'তে নজরুলের 'নিশি ভোর হল জাগিয়া পরান-পিয়া' গজল এবং ১৩৩৫ বৈশাখের 'প্রগতি'তে 'সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে' কবিতা ও 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে' গজল-গান স্বরলিপি-সমেত প্রকাশিত হয়। এ পত্রে উল্লেখিত 'দিলীপ', 'সাহানা', 'কে মল্লিক' হচ্ছেন যথাক্রমে শ্রীদিলীপ কুমার রায়, শ্রীমতী সাহানা দেবী ও মরহুম মোহাম্মদ কাসেম মল্লিক।]

১১, ওয়েলসলি স্ট্রিট সওগাত অফিস
কলিকাতা
বিষ্যুৎবার

প্রিয় মোতিহার!

তোমার চিঠি রবিবার সকালে পেয়েছি কৃষ্ণনগরে–কলকাতা এসেছি তিন-চারদিন হল। এখন আবার দিলীপ ফিরে এসেছে–পরশু সকালে। এখন দিন-রাত গান আর গান। দুটো নতুন গান লিখেছি গিয়ে শোনাব। কিন্তু পরই তারিখ ত! যেতে পারছিনে, ভাই। বোধ হয় এপ্রিলের শেষ হপ্তায় যেতে পারব। এখন এত ব্যস্ত যে, নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই।

ওদিকে বুদ্ধদেবের[৩৫] দলও তাড়া দিচ্ছে যাবার জন্য এবং তাদের ওখানে ওঠার জন্য। একটা ঝগড়া বাধবে দেখছি। অবশ্য তোমারই জয় হবে এটাও স্থির নিশ্চয়।

চৈত্রের 'প্রগতি'[৩৬]তে দুটো গজল বেরুবে আমার স্বরলিপি-সমেত। বেরুলে দেখো।

বার্ষিক 'সওগাত' বেরুলো। তোমার বোনকে পাঠালাম একখানা। তোমার খানা এঁরা পাঠাচ্ছেন বলে আর আমি পাঠালাম না। আমার দ্বিতীয় কবিতাটা

৩৫. বুদ্ধদেব বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের কৃতী ছাত্র। সে সময় তিনি, ঢাকা কলেজের ইংরেজি শিক্ষক পরিমল ঘোষ, অর্থনীতির শিক্ষক জ্যোতিস্ময় রায়–এরা সব একত্রে মিলিত হতেন। তাঁদের আড্ডা বসত কখনো তাঁদের বাড়িতে, কখনো প্রতিভা সোমের বাড়িতে। প্রতিভা সোমকে কাজী নজরুল গান শেখাতেন।

৩৬. বুদ্ধদেব বসু এবং অজিত দত্ত সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'প্রগতি'। এ পত্রিকায় চৈত্র ১৩৩৪ (১৯২৮ ইং) ও ১৩৩৫ সালে কাজী নজরুলের 'এ বাসি বাসবে', 'নিশি ভোর হল' স্মরলিপিসহ গান প্রকাশিত হয়।



যায়নি, আর জায়গা ছিল না বলে। সেটা বোধ হয় চৈত্রের 'সওগাতে' যাবে। চৈত্রের 'সওগাত' আর এক সপ্তাহের মধ্যে বেরুবে বলছেন। 'রহস্যময়ী' চৈত্রের সওগাতে যাবে না, বোধ হয় বৈশাখে যাবে।

কতকগুলো লেখা জমেছিল, পাঠিয়ে দিলাম তোমার বোনকে। ভয়ে কিন্তু বুক দুরু দুরু করছে। না জানি কী শাস্তি ভোগ করতে হবে আবার। যাক, তেমন দেখি যদি, তাহলে আর পদ্মা পারই হব না। যদি খুব রাগেন, আমায় জানিও।

দিলীপ আবার আমায় কৃষ্ণনগর ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণনগরই ওর আসল বাড়ি। সেখানে তিন-চারদিন হবে হয়ত। তারপর কলকাতা ফিরে আয়। কৃষ্ণনগরের বাসা এবার তুলছি। কলকাতায় বাসা দেখছি–ওদের জন্য। ওরাও নাকি নিশ্চিন্ত হয় তাহলে এবং আমিও হই।

আমার গ্রামোফোনে গান ১৪ই, এবং ১৫ই এপ্রিল। চারখানা গান এবং দুটা আবৃত্তি দেবো। দিলীপ, সাহানা, কে মল্লিক[৩৭] প্রভৃতি আরও পাঁচ-সাতজন গাইয়ে আমার গান দেবেন এই সাথে।

রেডিওতে সেদিন আবৃত্তি করিনি; কেন যেন ভাল লাগল না। তুমি ঠিক ধরেছ, তেওড়া তালে 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে' গানটা গীত হবার আগেই আমার গান হয়েছিল। আবৃত্তি আমিই ইচ্ছা করে করিনি। রেডিওতে গান দেবার আর সময় হবে না এক সপ্তাহের মধ্যে।

আজ খুব তাড়াতাড়ি লিখছি চিঠিটা–বডডো সময়ের অভাব। যারা সব গ্রামোফোনে আমার গান দেবেন তাদের সুর শিক্ষা দিতে হচ্ছে।

.....হ্যাঁ, রহস্যময়ী' কবিতাটা তুমি কোথায় পেলে সেদিন? যাক, যে রূপেই পাও, কেন লেগেছে ওটা তোমার? এখানে সাহিত্যিক আসরে পড়েছিলাম ওটা, সকলেই ভয়ানক প্রশংসা করেছেন। বড় রথীরা বলেছেন, ঐটেই আমার লেখা শ্রেষ্ঠ Love Poem, গিয়েই একদিন আবৃত্তি করে শোনাব।

শফিক কি চলে গেছে? কোন্ দিন গেল? এখন তা হলে ওঁকে দেখা-শোনা করছে কে? অবশ্য তুমি থাকতে ওঁর চিন্তা নেই। তবু রাত্রে তো ওঁকে হয়ত একা থাকতে হয়। যাক, সীমার অতিরিক্ত হয়ত চিন্তা ও প্রশ্ন করছি। ওঁর শরীর এখন কেমন? ওঁকে নিয়ে একি পাগলের মতো দুশ্চিন্তা আমার।...

৩৭. এরা বিখ্যাত রেডিও আর্টিস্টকে। মল্লিকের প্রকৃত নাম বাবুল কাসেম মল্লিক। তিনি কালী গান গাইতেন বলে মুসলিম নাম ব্যবহার না করে কে মল্লিক বলেই পরিচয় দিতেন।

দিলীপ তোমাদের Burdwan House-এ দুদিন গেছিল বলল। তোমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে খুব–বলল। তোমার এবং তোমার বোনের খুব প্রশংসা, করল। আমায় যেতে বলেছে–তাও জানাতে ভোলেনি। ওঁর বাবা-মা কবে আছেন? একটা কথা, কিছু মনে করো না, তুমি হঠাৎ আমাদের ভাই-বোন পাতিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ কেন বলো তো। যদি ব্যবধানের নদী সৃষ্টি হয়েই যাবে আমাদের মধ্যে, আমি এপারেই থাকব, কাজ নেই আমার ওপারে গিয়ে মুখোশ পরে। আমি তোমাদের মত হতে পারিনে, তা আর কী করবে বল। তাঁর ইঙ্গিতে যদি ও-কথা লিখে থাক, তা হলে তাঁকে বলো, আমাকে ভয় করার তাঁর কিছুই নেই। আমি তার বিনানুমতিতে গিয়ে বিরক্ত করবো না–বা তাঁর শান্তির ব্যাঘাত করবো না। বন্ধু, তুমি, অনুগ্রহ করতে গিয়ে আর আমায় দুঃখ দিও না।

তুমি মনে করছ হয়ত, কত অসহায় আমি আজ! তাই বুঝি ঐ মতলব ঠাউরিয়েছ, না? যাক, ওখানে গিয়ে এ নিয়ে দস্তুরমত ঝগড়া করব তোমার সাথে।–হাঁ, কি নাটক লিখব বলত! ওদের ideal কি, তা ত জানা নেই। নাটকটা ওখানে গিয়েই লিখে দেবো দু'দিনে।

আমার ভালবাসা নাও। খুব আনন্দে আছ, না? এখন নিজের বাড়িই শ্বশুর বাড়ি হয়ে গেছে বুঝি? তাড়াতাড়ি চিঠি দিও। সতীন ভাবীকে সালাম। ছেলেমেয়েদের চুমু।

তোমার
–নজরুল

[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত এ পত্রে উল্লেখিত 'নলিনীদা' হচ্ছেন কণ্ঠশিল্পী নলিনীকান্ত সরকার। নজরুলের 'নারী' কবিতাটি 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছের অন্তর্গত। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫ মুতাবিক ১লা পৌষ ১৩৩২ তারিখে 'সাম্যবাদী' সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।]

১৫, জেলিয়াটোলা স্ট্রিট,
কলিকাতা
সকাল

প্রিয় মোতিহার!

নতুন বছরের নতুন ভালবাসা নাও। তোমায় চিঠি দিয়েছি বোধ হয় হপ্তা খানিকেরও আগে। পেয়ে উত্তর দিয়েছ কি না জানিনে। মিস ফজিলতুন্নেসাকে



আমার দু'খানা বই ছাড়া আর সব বই (১৬ খানা) পাঠিয়েছি কাল তা তিনি পেয়েছেন বোধ হয়। তিনি ত দেবেন না, তুমিই প্রাপ্তি-সংবাদটা দিও।

দিলীপ ও নলিনীদা কৃষ্ণনগর গিয়েছিলেন, আমি যেতে পারিনি। গ্রামোফোনে যাঁরা আমার গান দেবেন তাঁদের গান শেখানো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এখন তা শেষ হয়েছে। আমি গ্রামোফোনে গান দেব পরশু শুক্রবার বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। চারটা গান এবং "নারী" আবৃত্তি দেবো আমি নিজে। কেমন উৎরাবে জানিনে। আগামী শনিবার রাত্রি ৮৷৷০ টা কি ৯টায় গান ও আবৃত্তি করবো রেডিওতে শুনবার চেষ্টা করো ওখান থেকে–এবং কেমন হয় জানিও। এর পরেই কলকাতার প্রোগ্রাম আমার শেষ হবে। আপাতত Family কলকাতায় আনা হবে না হয়ত। সুবিধে মত বাড়ি পাচ্ছিনে। তারপর ঢাকা যাত্রার আয়োজন।

বোধ হয় দিন দশেকের মধ্যেই সেখানে গিয়ে পঁহুছব। যাবার আগে তার করব। কিন্তু তার আগে তোমার চিঠি পাই যেন। পারত আজই চিঠি দিও জেলিয়াটোলা স্ট্রিট এবং জানিও আমার এখন যাওয়া ভাল হবে কি না। নানান দিক থেকে এ প্রশ্ন করছি।

আমার বইগুলো ওকে পাঠাতে এত লজ্জা করছিল, সে আর কী বলব। আমি একটুও অত্যুক্তি বা বিনয় করছিনে, ভাই! ও লেখাগুলোয় আমার অপরিণত মন ও বয়সের এত সুস্পষ্ট ছাপ আছে যে, তা পড়তে এখন আমারই লজ্জা করে। আমার ওপর তোমাদের ধারণা হয়ত শিথিল হয়ে যাবে এসব পাগলের প্রলাপ পড়ে। বইগুলো পাঠনোর পর থেকে আমার আর অসোয়াস্তির অন্ত নেই। পোকা-খেগো ফুল দিয়ে কি দেবতার অর্ঘ্য দেওয়া যায়? বার্ষিক 'সওগাত' পেয়েছ কি? দুদিনের দেখায় আমার গোদা হাতের ছাপ লেগে অসুন্দর হয়ে ওঠেনি ত? উনি কী বললেন?

ওঁর শরীর কেমন? শফিক কখন গেল? ওর বাবা মা কখন আসবেন? সব লিখো।

আমার কোন কিছু ভাল লাগে না আর! এত আড্ডা গান–কিছুতেই মনকে ডুবাতে পারছিনে। এর কোথায় শেষ-কে জানে? কেবলি বিস্বাদ ঠেকছে–আলো বাতাস; হাসি–গান! সব, কী যে হবে কী যে করব–আমি জানিনে।

কী করছ এখন? কেমন করে তোমাদের দিন যাচ্ছে–জানতে এত ইচ্ছা করে–লোভ হয়।–যাক–চিঠি দিও। ইতি–

তোমার
নজরুল

## [আবদুল কাদিরকে লিখিত]

৮১, পান বাগান লেন
ইন্টালী কলিকাতা
২-১-২৯

কল্যাণীয়েষু,

তোমায় চিঠি লিখেছি দেখে তোমার চেয়ে বিস্মিত আমিই বেশি হচ্ছি। চিঠি লেখাটাই মুখস্থ হয়ে গেছে, কাজেই ওটাকে যখন দায়ে পড়ে হস্তস্থ করতে হয়, তখন হাতের চেয়ে মনটা যে বেশি বিত হয়ে পড়ে।

আমি চিঠি-পত্তর দিইনে বলে তোমাদের অভিমান যদি কখনো হয় তা হলে অন্তত এইটুকু ভেবে সান্ত্বনা লাভ করো যে, আমার চিঠি পায় বলে কেউ আমার সুনাম ঘোষণা করেনি কোনদিন! রবিবাবু চিঠি পেয়েই তার উত্তর দিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করেন, তিনি মস্ত বড় কবি। আমি চিঠি পেয়ে তার উত্তর না দিয়েই আমার অভদ্রতার প্রিন্সিপল রক্ষা করি। আমি মুসাফির কবি। ভদ্রতা, সৌজন্য, স্নেহ, প্রীতির খাতির কোনদিনই করিনি। এই যা সান্ত্বনা। রবিবাবুকে চিঠি দিয়ে লোকে ভাবে, উত্তর এল বলে। আমাকে চিঠি দিয়ে কারুর অশোস্তির আশঙ্কা নেই; সে দিব্যি নিশ্চিন্ত থাকে, তার চিঠির উত্তর কোনদিনই পাবে না। ব্যবসাদারির কথাটা আগে বলে নিই, তারপর কবির অকাজের কথা হবে।

এতদিন আমার পাবলিশাররাই আমায় ঠকিয়ে এসেছে। আমার বোধোদয় হয়েছে। তাই মনে করেছি–এবার তার শোধ নেব। এবার থেকে বইগুলো নিজেই প্রকাশ করব। 'চক্রবাক' নাম দিয়ে আমার একখানা কবিতার বই ছাপাতে দিয়েছি। তারির বিজ্ঞাপন পাঠালাম পাঁচখানা তোমার কাছে। তুমি (১) "জাগরণে" (২) "সঞ্চয়ে" (৩) "আল ফারুকে" (৪) "আমানে" ও (৫) "আজাদে" গিয়ে দিয়ে এস। যেন তাঁরা তাঁদের কাগজে প্রকাশ করেন। আমি আমার সাধ্যমত তাঁদের কবিতা দিয়ে সাহায্য করব যদি তারা সাহায্য করেন। ঐ কাগজের সম্পাদকদের আলাদা আলাদা চিঠি দিতে পারলাম না সময়ের ও ধৈর্যের অভাবে। তোমার মারফতেই আমার অনুরোধ জানাচ্ছি সম্পাদক সাহেবানদের।

তুমি ত ফেল করতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছ জসীমের সাথে, কাজেই এই হাঁটাহাঁটি করিয়ে তোমার পড়ার ক্ষতি করতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই। আশা করি এবারও পাশ না করার জন্য তুমি চেষ্টার ত্রুটি করছ না।

ডিগ্রি যদি না-ই পাও, অন্তত তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। ডিগ্রিটা থাকে শেষের দিকে অর্থাৎ ওটা ন্যাজের সামিল। আর ও জিনিসটা অর্জন করার জন্য গর্ব



আর যারাই করুন আমি পাইনি বলে বিধাতাকে তার জন্য ধন্যবাদ দিই। ন্যাজ নিয়ে গর্ব করবার মতো বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়নি আমার। আমি মানুষের স্তরে উঠে গেছি; আমি নির্লাঙ্গুল।

তোমার কাব্য-সাধনা তোমায় যে ডিগ্রি দান করেছে বা দেবে, তা হবে তোমার মাথার অলঙ্কার–শিরোপা। এটাই তোমার সত্যিকার গর্ব করবার জিনিস।

তুমি আর জসীম যেন একই নদীর জোয়ার-ভাটা একই স্রোতের রকমফের।

একটু উপদেশের ঢিল ছুড়ব? তুমি আজকের মানুষকে খুশি করতে গিয়ে কালকের অনাগতদের অসম্মান অর্জন করো না যেন! ঐ রোগে আমার যে সর্বনাশ করেছে, তার ক্ষতিপূরণ বুঝি সারা জীবনেও হবে না। বহুদিন আনন্দলোকের দ্বারে বসে কনসার্টই বাজিয়েছি হাতের বাঁশি ফেলে। তাতে বুকের ব্যথা বেড়েছে বৈ কমেনি। আজ সেই ব্যথার কথাই যখন সুরের সুতোয় গাঁথলাম, তখন ব্যথাও যেমন কমেছে, ক্ষতটাও তেমনি মালায় ঢাকা পড়েছে। আমার চোখের জলে সকলের চোখের জল এসে মিশেছে। আমার বেদনা-লোক তীর্থলোকে পরিণত। হয়েছে। সরব হাততালির লোভের চেয়ে নীরব চোখের জলের অর্ঘ্য তোমার কাম্য হোক–এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার নেই। তোমাদের দেখে কত আশাই না পোষণ করি! মনে হয়, আমার গান থামলেও গানের পাখির অভাব হবে না এই নতুন বুলবুলিস্তানে।

আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের সঙ্গে আলাপ হলো–অনেক কথা। তার মনটাই বড় রত্ন। আর্শির মত স্বচ্ছ! আর তার খবর দিও। ইতি–

শুভার্থী
নজরুল ইসলাম

P.S. কংগ্রেসে আসনি, ভালই করেছ। কংগ্রেস চৌত্রিশ ঘোড়ার রাজাকে এনে পেয়েছে চৌত্রিশ ঘোড়ার ডিম! দেখা যাক, হয়ে কোন বাচ্চা বেরে।

['দাড়ি বিলাপ' কবিতা কাজী নজরুলের 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে। 'চল্ চল্ চল্' শীর্ষক বাংলাদেশের রণসংগীতটিও এ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। দাড়ি বিলাপ কবিতাটি কাজী নজরুল ১৯২৮ সালে রচনা করেন। এ সময় তিনি বর্ধমান হাউসে অতিথি হিসেবে অবস্থান করেছিলেন।

কাজী মোতাহার হোসেনের দাড়ি কামিয়ে "দাড়ি-বিলাপ" নামে যে কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেছিলেন তা নিচে মুদ্রিত হলো]

**দাড়ি বিলাপ**

হে আমার দাড়ি!
একাদশ বর্ষ পরে গেলে আজি ছাড়ি'
আমারে কাঙাল করি, শূন্য করি বুক
শূন্য এ চোয়াল আজি শূন্য এ চিবুক!
তোমার বিরহে বন্ধ, তোমার প্রেয়সী
ঝরিছে শ্যামলী গুম্ফে ওষ্ঠকূলে বসি!
কপালে কপাল ঠকি করে হাহাকার—
রে কপটি রে সেফটি গিলেট রেজার!
একে একে মনে পড়ে অতীতের কথা
তখনো ফুটেনি মুখে দাড়ির মমতা!
তখনো এ গাল ছিল সাহারার মরু,
বেপাল মাস্তুল কিম্বা বিপল্লব তরু!
স্বজাতির ভীরুতার ইতিহাস স্মরি'
বহিয়া বি-শ্মশ্রু গণ্ড অশ্রু, যেতে ঝরি'
নারী সম কেশ বেশ, নারীকেলী মুখ,
নারীকেলী হুকা খায়!—পুরুষে উৎসুক
নারীর 'নেচার' নিতে হা ভারত মাতা!
নারী মড়ু হ'ল আজি নর বিশ্বভ্রাতা!
ভেজিপরী দারোয়ান তারও দাড়ি আছে
চলিতে সে দাড়ি যেন শিখী-পুচ্ছ-নাচে!
পাঞ্জাবী, বেলী, বীর বীর রাজপুত
দরবেশ, মুনি, ঋষি, বাবাজি অদ্ভুত,
বোকেন্দ্র গন্ধিত ছাগ সেও দাড়ি রাখে
শিম্পাঞ্জী, গরীলা হায় বাদ দিই কাকে
এমন যে বটবৃক্ষ তারও নামে ঝুরি
ঝুরি নয় ও যে দাড়ি করিয়াছে চুরি
বনের মানুষ হতে! তাই সে বনপতি আজ
দাড়ি রাখে গুল্মলতা রসুন পেয়াজ!
হাটে দাড়ি, মাঠে দাড়ি, দাড়ি চারিধার,
লক্ষ ধারে ঝরে যেন দাড়ি করি ধার
ঝরে যবে বৃষ্টিধারা নীল নভ বেয়ে



মনে হয় গাড়ি গাড়ি দাড়ি গেছে ছেয়ে
ধরণীর চোখে মুখে, সে সুখ আবেশে
নব নব পুষ্পে তৃণে ধরা ওঠে হেসে
মুকুরে হেরিয়া নিজ বি-শ্মশ্রু বদন
লজ্জায় মুদিয়া যেত আপনি নয়ন
    হায় রে বাঙালী
রহিলি তুই-ই রে হয়ে মাকুন্দা বাঙালী।
—"নজরল কাব্য-পরিচিতি"
কাজী মোতাহার হোসেন,
প্রথম সংস্করণ ১৯৫৫
পৃ. ৮৬-৮৮

**['শিখা'র' সম্পাদক আবুল হুসেনের নিকট লিখিত]**

প্রিয় আবুল হুসেন সাহেব,

কৃষ্ণনগর
১০.২.২৭

আপনার সাদর আমন্ত্রণ-লিপি নব ফাল্গুনের দখিন হাওয়ার মতই খুশ খবরী নিয়ে এসেছে। আমার শরীর জ্বরের উপর্য্যুপরি আক্রমণে জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছে। তাই মন আমার এ আনন্দ বার্তা পেয়ে যত হালকাই হয়ে উঠুক, শরীর হয়ত তেমন হালকা হয়ে উঠতে পারছে না। আমার শরীর যদি এমনি ভারী হয়ে থাকে আর কিছুদিন, তা হলে এর ভার কোনো রেলগাড়ীই বইতে সমর্থ হবে না। আমার বর্ত্তমান অভিভাবক জ্বর, তারই আদেশের প্রতীক্ষা করছি।

বসন্তের হাওয়ার জ্বরা ও জ্বর সইতে পারে না। তাই আশায় বসে আছি, কখন আসবে দখিন হাওয়া—আসবে আমার রোগ শয্যায় ফুলের আমন্ত্রণ-লিপি।

আমাদের আনন্দ মহফিলে আমার বাঁশী যদি নাই বাজে, তা হলেও আপনাদের খুশীর 'জাম' অপূর্ণ থাকবে না। ঢাকার অতগুলি কচি-কিশোরের কচি কণ্ঠের সুরে সুরে আপনাদের সুর লোক মসত হয়ে উঠবে। এ আমি অত্যুক্তি করচি নে।...আপনাদের উৎসব দিনের 'মুতরিব' হবার গৌরব আমায় দিতে চান, কিন্তু যে গান আমি গাঁথার, তার সুর যে আপনাদের মনের বেণুকঞ্জে। কোন আনন্দ-মাণিক আপনাদের উৎসবের মালার মধ্যমণি কোন বেদনা-সুন্দর এর দেবতা, কোন

প্রকাশোন্মুখ অন্তরে এর পূজা-বেদী-এর আভাস না পেলে আমি কি করে আগমনী গান রচনা করি? যদি আমাকেই গাইতে হয় এ আনন্দ জলসার আগমনী, তা হলে আপনাদের উৎসবের অন্তরের কথা—যাকে কেন্দ্র করে সুর লক্ষ্মীর নৃত্য চলবে—শীগগীর জানাবেন।

আর, আমার বাণী? তার প্রকাশ কি শোভন হবে আপনাদের নৌরোজের মজলিসে? আমার সরস্বতী অশ্রুমতী,—বেদনা-শতদলে তার চরণ। যুগযুগান্তরে অশ্রুর অঞ্জলি এসে পড়ছে তাঁর পায়ে। এ ক্রন্দসীর গান শুধু একটানা ক্রন্দন। আনন্দ-উৎসবের নৌরাতির দীপ শিখা নিভে যায় এর হতাশ্বাসে। তবু হয়ত সে দুঃস্বপ্ন দেখার মত সুন্দরের নেশায় আনন্দ গান গেয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। চোখের জলে ধোওয়া সে সুর। বেদনায় রাঙা সে হাসি। আমার বাণী শিল্পীর বাণী নয়, আমার বাণী বেদনাতুরের কান্না। আমার সুরলক্ষ্মী স্বর্গের উর্ব্বশী নয়, মর্ত্তের শকুন্তলা-বিরহ-শীর্ণা অশ্রুমুখী পরিত্যক্তা শকুন্তলা, উৎপীড়িতা লায়লি। আপনি আমার লেখা পড়ে মনে করছেন, হয়ত আবার আমার জ্বর এসেছে। নৈলে এত বকছি কেন?

আপনারা যদি নেহাত না ছাড়েন, যেতেই হবে। কিন্তু একথা সত্য যে, তাতে আপনাদের উৎসব রজনী বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। আপনার পত্র পেলে সেইরূপ ব্যবস্থা করব।

আমার আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসা নেবেন সকলে। আপনাদের সুন্দর—পূজার আয়োজন সার্থক হোক, সুন্দর হোক, পূর্ণ হোক। ইতি—

প্রীতিসিক্ত
নজরুল ইসলাম



# মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলন সম্পর্কে সমকালীন পত্রপত্রিকার সংবাদ

কাজী নজরুল মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলন এসেছিলেন এ সম্পর্কিত সমকালীন পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে গুরুত্বের সঙ্গে সংবাদ ছাপা হয়। সমকালের সাহিত্যিকদের পত্রালাপেও বিষয়টি উঠে এসেছে। নিম্নে সমকালীন নানা পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী থেকে আহরিত এ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য সংবাদ উপস্থাপন করা হলো।

**শিখা, চৈত্র ১৩৩৩**

**বার্ষিক সম্মিলনের বিবরণ**

কাজী সাহেব (কাজী আনোয়ারুল কাদির) তাঁর প্রবন্ধ শেষ করবার কয়েক মিনিট পূর্বেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সভাগৃহে উপস্থিত হন। প্রবন্ধের অপ্রিয় কথা শুনতে শুনতে মজলিশ অনেকটা উগ্র হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই সময় কবির আগমনে চাঞ্চল্যটা কথঞ্চিৎ কমে গেল। সেই অবসরে লেখক তাঁর বক্তব্য শেষ করে ফেললেন। তখন কবি সম্মিলনের সভাপতির সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে রচিত 'খোশ আমদেদ' নামক গানটি গাইতে বসে গেলেন। গানের ভাব ও ভাষায় মজলিশ নিতান্ত মুগ্ধ হয়েছিল।...

পরদিন (২৮শে ফেব্রুয়ারী) প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় কাজী নজরুলের গজল দিয়ে সভা উদ্বোধন করা হয়। গজলের পর কবি নিজে তার নূতন কবিতা 'খালেদ' আবৃত্তি করেন। শুনতে পাওয়া যায় এই আবৃত্তিতে কয়েকজন স্থিতিশীল মৌলবী সাহেবের চোখ দিয়ে নাকি অশ্রু বের হয়েছিল।...

চতুর্থ সমালোচক আমাদের তরুণ অধ্যাপক মৌঃ মমতাজুদ্দীন আহমদ। তিনি খুব উচ্চকণ্ঠে মাদ্রাসা শিক্ষা ও না বুঝে ধর্ম শিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন।... এই সময় কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব উঠে বলেন, 'আজ আমি এই মজলিশে আমার আনন্দবার্তা ঘোষণা করছি। বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়েছে। আজ আমি দেখছি এখানে মুসলমানের নূতন অভিযান শুরু হয়েছে। আমি এই বার্তা চতুর্দিকে ঘোষণা করে বেড়াব। আর একটি কথা—এতদিন মনে করতাম আমি একাই কাফের, কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম যে, মৌঃ আনোয়ারুল

কাদির প্রমুখ কতকগুলি গুণী ব্যক্তি দেখছি আস্ত কাফের। আমার দল বড় হয়েছে এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর আমি চাই না।'

[উদ্ধৃত : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সংকলন ও সম্পাদনা) : শিখা সমগ্র, (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৪১০/জুন ২০১৩), পৃ. ১২৭, ১২৮ ও ১২৯]

**শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন, ১৩৩৪ জলসা**

মূল কে বিদেশী মন উদাসী সুর-গোহাগে তন্দ্রা লাগে
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে কুসুম-বাগের গুল্-বদনে॥
প্যারডি কে উদাসী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,
বাঁশী-সোহাগে ভির্মি লাগে, বর ভুলে যায় বিয়ের ক'নে।
ঘুমিয়ে হাসে দুষ্টু খোকা, বেরিয়ে আসে দাঁতের পোকা–
বোকা-চাঁদের লাগল ধোঁকা শ্যাওলা-পড়া নীল গগনে।

**সাপ্তাহিক সওগাত, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩৫; ২০শে জুলাই, ১৯২৮**

**কবির হাত যশ**

গত ২৪শে জুন রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় বাংলার মুসলিম সমাজের গৌরব, বীর রসের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা, বিদ্রোহী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব তাঁহার এক বন্ধুর বাসা হইতে ফিরিবার সময় ১৫/২০ জন হিন্দু যুবক তাঁহাকে হকিস্টিক হাতে আক্রমণ করে। কবি সাহেব খালি হাতে তাহাদিগকে বাধা দিতে যাইয়া হাতে, শরীরে আঘাত পান এবং জোরে একজনকে ধাক্কা দিয়া তাহার হাতের হকিস্টিক দ্বারা সকল যুবককে ছাগল ভেড়ার ন্যায় মারিতে মারিতে তাড়াইয়া দেন। আমরা জানি ২০/২৫ জন ভাল পাহলোয়ানও বিদ্রোহী কবি হাবিলদার নজরুল ইসলাম সাহেবের নিকট শক্তি পরীক্ষায় টিকিবে না।

**বঙ্গনূর, ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৩; ১০ই মার্চ, ১৯২৭**

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মিলন কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাংলার বহু প্রতিভাশালী মুসলিম এই সম্মিলনীতে যোগ দিয়াছিলেন। কবি নজরুল ইসলাম তাঁহার স্বরচিত গানে সম্মিলনীর মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

... ... ...

ঢাকা হলের, জগন্নাথ হলের ও মুসলিম হলের ছাত্রবৃন্দের একান্ত অনুরোধে নজরুল ইসলামকে ৩/৪দিন ঢাকায় থাকিয়া বিভিন্ন হলে আবৃত্তি ও সংগীতালাপ



করিতে হইয়াছে। তাঁহাকে আহবান করিবার ঢাকার অনেকেরই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মুন্সিগঞ্জের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এক প্রকার কাড়িয়াই তাহাকে মুন্সিগঞ্জ লইয়া গিয়াছে।

**বঙ্গনূর, ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৩; ১০ই মার্চ, ১৯২৭**

**সাহিত্য সম্মিলনের প্রচেষ্টা**

...বিদ্রোহী কবি নজরুল এছলাম সাহেব খায়েরাৎ সম্বন্ধে একটি সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। শেষ দিন কবি সাহেব, একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় 'অভিযান' শুরু হ'ল বলে ঘোষণা করিলেন। পূর্বে নাকি তিনি একাই 'কাফের' আখ্যা পাইয়াছিলেন, এখন হইতে অনেক সঙ্গী পাইলেন ইত্যাদি বীরত্বব্যঞ্জক বাক্য উচ্চারণ করিতেও কবিবর বিরত হন নাই।...

বহুরূপী কবি এতদিন হিন্দুভক্ত ছিলেন। এক সময় 'ইন্দ্র পতনে' সি,আর, দাসকে হজরত মুহম্মদের (দঃ) সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। বৎসর কয়েক পূর্বে আমরা 'মোহাম্মদী' কাগজে পড়িয়াছি, তিনি নামাজ, রোজা ইত্যাদিকে হারাম বলিয়াছিলেন, ও 'সরস্বতীর' পায়ে কোরান শরিফ রাখিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। জানি না ব্যাপার কতদূর সত্য। যাহা হউক গত কাউন্সিল নির্বাচনে ধাক্কা খাইয়া যেন কবি সাহেব অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। বোধ হয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। নজরুল এছলাম সাহেবের বিভিন্নমুখী কবি প্রতিভাকে আমরা অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এতদিন তিনি হিন্দু প্রেমে মশগুল ছিলেন বলিয়া বিরাট মুসলমান সমাজ তাঁহাকে appreciate করে নাই। সম্প্রতি তাঁহার সুর পরিবর্তন হইয়াছে। 'খালেদ' কবিতায় ও ইতোমধ্যে যতগুলি কবিতা তিনি লিখিয়াছেন তাহাতে 'তৌহিদে'র ঝঙ্কার দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। এখন এই 'বিদ্রোহে'র ভাবটা গেলেই হয়। কেননা দীন এছলামের বিরুদ্ধে অভিযান শুদ্ধি সংগঠনী' দল থেকে পূর্বে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং কবিবরের 'অভিযান' না করাই শ্রেয়। এছলাম ও মুসলমান কবি সাহেবের নিকট অনেক কিছু আশা করে। রবীন্দ্রনাথ যেমন হিন্দু সভ্যতা, হিন্দু জ্ঞান দর্শন তাঁহার গানে, বক্তৃতায়, কবিতায়, কাব্যে, উপাখ্যানে বিশ্বপ্রেম নাম দিয়া বিশ্বব্যাপী বিস্তার করিতেছেন, আমরা আশা করি নজরুল এছলাম সাহেব তাহার অনন্য সাধারণ প্রতিভা দ্বারা প্রকৃতই 'বিশ্বপ্রেম' যে ইসলাম, তাহার সভ্যতা, শিক্ষা, স্বভাব, সৌন্দর্য্য, শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি গানে, বক্তৃতায়, কাব্যে তিনি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করুন, এবং রবীন্দ্রনাথের মত উহা বিশ্বব্যাপী জলদগম্ভীর স্বরে প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন।

**১৯২৮। বুদ্ধদেব বসু–**

পট পরিবর্তন করে আসা যাক দশ বছর পরে, ঢাকায়, পুরানা পল্টনে, 'কল্লোল'-'প্রগতি'র যুগে। নজরুল ইসলাম ঢাকা এসেছেন এবং গান গেয়ে সারা শহর

মাতিয়ে তুলছেন। 'কল্লোলে' গজল-গানের প্রথম পর্যায় বেরিয়ে গেছে—তারপর বয়ে চলেছে গানের অফুরন্ত স্রোত–তা কখনো ক্লান্ত হবে না, ক্ষান্ত হবে না। সেবারে ঢাকায় সুধীজনের মধ্যে নজরুলকে নিয়ে কাড়াকাড়ি, জনসাধারণ তাঁর গান শুনে আত্মহারা, কেবল কতিপয় দুর্জন দুশমনের পক্ষে তাঁর প্রতিপত্তি এত দুঃসহ হলো যে তারা শেষ পর্যন্ত তাঁর উপর গায়ের জোরের গুণ্ডামি করে ঢাকার ইতিহাসে এক সঙ্গে অনেকটা কালি ঢেলে দিল।[১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে একটি মুসলমান অধ্যাপকের[২] বাসা, সেখান থেকে নজরুলকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা কয়েকটি উৎসাহী যুবক চলেছি আমাদের 'প্রগতি'র আড্ডায়। বিকেলের ঝকঝকে রোদ্দুরে সবুজ রমনা জ্বলছে। হেঁটেই চলেছি আমরা, কেউ-কেউ বাইসাইকেলটাকে হাতে ধরে ঠেলে নিয়ে চলেছে, জনবিরল সুন্দর পথ আমাদের কলরবে মুখর, নজরুল একাই একশো। চওড়া মজবুত জোরালো তাঁর শরীর, লাল ছিটে-লাগা বড়ো বড়ো মদির তাঁর চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা ঝাঁকড়া চুল তাঁর প্রাণের ফুর্তির মতোই অবাধ্য, গায়ে হলদে কিংবা কমলা রঙের পাঞ্জাবী এবং তার উপর কমলা হলদে রঙের চাদর-দুটোই খদ্দরের।...

আমাদের 'প্রগতি'র আড্ডায় বার কয়েক এসেছেন তিনি, প্রতি বারেই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। প্রাণশক্তির এমন অসংবৃত উচ্ছ্বাস, এমন উচ্ছৃঙ্খল অপচয় অন্য কোন বয়স্ক মানুষের মধ্যে আমি দেখিনি। দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময় উছলে পড়ছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলেই উজ্জীবিত করে, মনের ময়লা, খেদ ও ক্লেদ সব ভাসিয়ে দিয়ে। সব লোকই তার আপন, সব বাড়িই তাঁর বাড়ি। শ্রীকৃষ্ণের মতো, তিনি যখন যার তখন তার।[৩]

১. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রঃ– ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, 'স্মৃতিপটে নজরুল', 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা।' ১৩৭৬ গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৩৭৬ গ্রীষ্ম সংখ্যা।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিকসের অধ্যাপক, কাজী মোতাহার হোসেন।

৩. 'নজরুল ইসলাম', 'কবিতা', নজরুল সংখ্যা, ১৩৫১, কার্তিক-পৌষ থেকে উদ্ধৃত।

## ১৯২৮। বুদ্ধদেব বসু

কথার চেয়ে বেশি তাঁর হাসি, হাসির চেয়েও বেশি তাঁর গান। একটি হার্মোনিয়ম এবং যথেষ্ট পরিমাণে চা-পান দিয়ে বসিয়ে দিলে এক সঙ্গে পাঁচ-সাত ঘণ্টা গান গাওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই নয়। গানে তাঁর আন্না নেই, ঘুমের সময় ছাড়া সবটুকু সময় গাইতে তিনি প্রস্তুত। কণ্ঠস্বর মধুর নয় তার, ভাঙা-ভাঙা খাদের গলা, কিন্তু তাঁর গান-গাওয়ার এমন একটি আনন্দিত উৎসাহ, সমস্ত দেহ-মন-প্রাণের এমন একটি প্রেমের উচ্ছ্বাস যে আমরা মুগ্ধ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছি। সে সময়ে[১]



গান রচনা করতেও দেখেছি তাকে হার্মোনিয়ম, কাগজ আর কলম নিয়ে বসেছেন, বাজাতে বাজাতে গেয়েছেন, গাইতে গাইতে লিখেছেন। সুরের নেশায় এসেছে কথা, কথার ঠেলা সুরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেবার ঢাকায় যে-সব গান তিনি লিখেছিলেন সেগুলি প্রায় সবই স্বরলিপি সমেত প্রগতি'তে বেরিয়েছিলো। 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী', 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে', 'নিশি ভোর হয়ো জাগিয়া পরাণ পিয়া'[২] এ সব গান ঢাকাতে লিখেছিলেন বলে আমার মনে পড়ে। এইমাত্র শেষ করা গান কবির নিজের মুখে তক্ষুণি শুনতে শুনতে আমাদের মনেও নেশা ধরে যেতো।

–('নজরুল ইসলাম', 'কবিতা', নজরুল-সংখ্যা, ১৩৫১, কার্তিক-পৌষ থেকে উদ্ধৃত।)

১. ১৯২৮, ফেব্রুয়ারী, ১৩৩৪-এর মাঘ মাসে মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছিলেন। তখনকার বিবরণ।

২. এই গানটি রচনা সম্বন্ধে নলিনী কান্ত সরকার তাঁর স্মৃতিচারণে অন্যতর তথ্য প্রদান করেছেন।

## ১৯২৮। কাজী মোতাহার হোসেন–

নজরুল ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনেও ঢাকায় এসেছিলেন। আমি তখন বর্ধমান হাউসের হাউস-টিউটর হিসেবে উক্ত ভবনের দোতলায় বাস করতাম। নজরুল ইসলাম সেবার মাসাধিক কাল আমার সঙ্গে ছিলেন। বাসগৃহের সংলগ্ন একটা ছোট কামরায় তিনি থাকতেন।

এবারে বনগাঁর অধিবাসিনী প্রতিভা সোম ওরফে রানু সোম (বর্তমানে বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী) এবং রমনা হাউসের অধিবাসিনী উমা মৈত্র ওরফে নোটন (ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল সুরেন্দ্র মৈত্রের[১] কন্যা) এই দুইজনের সাথে কবির পরিচয় হয়।...নজরুল চেয়েছিলেন রানুকে দিয়ে দিলীপের সাগরেদ রেনুকার[২] চেয়েও উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের রেকর্ড সংগীত গাওয়াবেন। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য। সে হচ্ছে, আমাদের দেশের লোকের মনোবৃত্তি। দিলীপ রায়ের সঙ্গে রেণুকার সম্পর্কের বিকৃত অর্থ করে কলকাতার সাহিত্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা দিলীপ রায়ের নাম দিয়েছিলেন কানুরে!' আর রানুর সঙ্গে নজরুলের সম্পর্কের বিকৃত অর্থ করে সজনীকান্তের শনিবারের চিঠিতে বেরিয়েছিল 'কে বিদেশী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশী (লাঠি) বাজাও বনে'। আর নওজোয়ান হিন্দু ছোকরারা একজন মুসলমান (বা মুসলা) যুবক প্রতিভা গোমকে দিন নেই, রাত নেই, যখন তখন গান শেখাতে আসবে তা সহজ মনে

গ্রহণ করতে পারেনি–হয়ত তাদের কাছে এ ব্যাপারে নিজেদের পৌরুষের উপর আঘাত বা চ্যালেঞ্জের মত মনে হয়েছিল। তাই একদিন রাত দশটা এগারটার মত সময়ে রানুদের ঘর থেকে গান শিখিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় অন্ধকারে পাঁচ সাত জন যুবক নজরুলকে লাঠি সোটা নিয়ে আক্রমণ করে। নজরুলও জওয়ান মর্দ মানুষ, বেতের মুঠোওয়ালা একটা লাঠি কেড়ে নিয়ে, তাদেরকেও দু-এক ঘা কষে লাগিয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসেন বর্ধমান হাউসে। দেখলাম, জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে। হাতে, পিঠে রক্ত আর পিটুনীর দাগ।

–('স্মৃতিপটে নজরুল', 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা', ১৩৭৬, গ্রীষ্ম, পৃ. ৯৮-৯৯ থেকে উদ্ধৃত।)

১. কাজী নজরুল তাঁর 'চক্রবাক' উৎসর্গ করেন–'বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী- প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু'।

২. বিখ্যাত কীর্তন গায়িকা রেনুকা সেন। তৎকালে ঢাকার টিকাটুলিতে বাস করতেন।

### ১৯২৮। প্রতিভা বসু

থাকি ঢাকা শহরে, বয়েস তখন তেরো।...নজরুল ইসলামের বয়েস তখন তিরিশ-বত্রিশ অথবা তারও কিছু বেশী কি না আমি জানি না। যৌবন তাঁর চোখে মুখে সমস্ত শরীরে নদীর স্রোতের মতো বহমান এবং বেগবান। সেই বয়সে তাঁকে যারা দেখেছেন শুধু তাদেরই বোঝানো যাবে কী দুকূল প্লাবী আনন্দধারা দিয়ে গড়া তার চরিত্র।...এই ব্যক্তিটি নানা কারণেই তাই নানা মানুষের কাছে এক কল্পনার নায়ক। বস্তুতই এমন একজন নায়ক কোন দেশে কোন কালেই অবিরল নয়। মস্ত বড়ো বড়ো টানা কালো চোখ, এলোমেলো ঘন চুলের বাবরি, তীক্ষ্ণ নাসিকা, ঘষা তামার মতো রং, লাবণ্য, সহজ সরল অদাম্ভিক ব্যবহার, উদ্দাম হাসি, উচ্ছ্বাস। প্রবণতা–সবটা মিলিয়ে একটা ব্যক্তিত্ব বটে। আর তার ধুয়োয় লুটিয়ে পড়া গেরুয়া চাদর।

–('নজরুল ইসলাম', 'দেশ', ১৯৮০, ২৪শে মে থেকে উদ্ধৃত।)



## কাজী নজরুলের 'চল্ চল্ চল্' গান প্রসঙ্গে

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহে (১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ) কাজী নজরুল ঢাকায় এলেন। তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এসেছেন। তখন এ সাহিত্য সমাজের সম্পাদক ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। উল্লেখ্য, কাজী নজরুল সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনে এসেছিলেন। দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করতে এসে তিনি বেশকিছু দিন বর্ধমান হাউসে কাটান। এ সম্মেলনের উদ্বোধনের জন্যই তিনি নতুনের গান 'চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' রচনা করেছিলেন।

এই গানটি সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা' ২য় বর্ষ; বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'প্রগতি'; সৈয়দ আব্দুর রব সম্পাদিত ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'মোয়াজ্জিন' এবং 'সওগাত' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয় এবং 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গানটি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর মার্চ সংগীতে অন্যান্য সংগীতের সঙ্গে এ গানটিও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

কাজী নজরুলের 'চল্ চল্ চল্' গানটির রচনা নিয়ে রফিকুল ইসলামসহ অনেকেই লিখেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল মিলনায়তনে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন আয়োজকদের অন্যতম ছিলেন কবি আবদুল কাদির। তিনি কাজী নজরুলের সরাসরি স্নেহধন্য ছিলেন। কাজী নজরুলের ওপর তাঁর প্রবন্ধ ১৯২৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। কাজী নজরুল ঢাকায় কবি আবদুল কাদিরের সামনে বসে এই গানটি রচনা করেছিলেন। তিনি এই গানটি গেয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল মিলনায়তনে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এ সম্পর্কে আবদুল কাদির লিখেছেন :

> পরের বছর [১৯২৮] নজরুল 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন তাঁর সুবিখ্যাত "চল্ চল্ চল্" গান গেয়ে। সেটি তিনি রচনা

করেছিলেন মুসলিম হলের তৎকালীন হাউস-টিউটর মরহুম অধ্যাপক আবুল হুসেন সাহেবের বাসায় বসে। সে বছর তিনি ঢাকায় এসে পৌঁছেছিলেন সম্মেলন হবার আগের দিন বিকালে এবং তাঁর থাকবার স্থান করা হয়েছিল আবুল হুসেন সাহেবের বাসার নিচতলার বৈঠকখানায়। পরদিন সকালে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি আমাকে বলেন যে, তাঁর মনে একটা মার্চ সংগীতের সুর এসেছে; সেই সুরে তিনি সম্মেলনের উদ্বোধনী গান রচনা করবেন। তিনি হারমোনিয়ম বাজিয়ে সুরটি ভাঁজতে লাগলেন। এবং আমাকে দরজার বাইরে পাহারায় বসিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন যে, এ সময় কেউ যেন তাঁর কামরায় না ঢোকেন। কিন্তু পনের-বিশ মিনিট না যেতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক এলেন কবির সাথে আলাপ করতে। আমি কবির নিষেধের কথা তাঁদের কাছে নিবেদন করলাম। তাঁরা পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলেন, তারপর হঠাৎ আমার অলক্ষিতে দ্রুতপদে কবির কামরায় ঢুকে গেলেন; তাঁদের দেখে কবি বিব্রত বোধ বা অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না, স্বাভাবিক হাসিমুখেই তাঁদের স্বাগত জানালেন। কিন্তু অধ্যাপকদ্বয় বহুক্ষণ আজেবাজে বিষয়ে বকর বকর করে বিদায় নিয়ে গেলে পর কবি আমাকে ভর্ৎসনা করে বললেন যে, গানটি অর্ধেক মাত্র লেখা হয়েছে কিন্তু তাঁর লেখায় মেজাজ নষ্ট হয়ে গেছে, এখন গানটি সম্পূর্ণ করা খুবই কঠিন। তিনি আমার সকাতর অনুনয়ে আবার হারমোনিয়ম ও কলম নিয়ে বসলেন। প্রায় আধঘণ্টা পর আমাকে বললেন যে, গানটা সম্পূর্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু তার শেষাংশটা বাণীর মাহাত্ম্যে প্রথমাংশের মতো মনোরম, সুঠাম ও অনবদ্য হয়নি। তিনি সম্পূর্ণ গানটি গেয়ে আমাকে শোনালেন, গাইতে গাইতে দু-এক স্থানে একটু কলম বুলালেন; কিন্তু কিছুতেই যেন তাঁর মনের খুঁতখুঁতি গেল না। এজন্যে আমি নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগলাম। আজও আমি কবির সেই মুহূর্তের অসন্তুষ্টমূর্তি ও আমার অপরাধের কথা ভুলতে পারিনি।

[উদ্ধৃতি : নজরুল-জীবনের যৎকিঞ্চিৎ, আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, সম্পা. শাহবুদ্দীন আহমদ) কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৮৯, ঢাকা, ১৮-১৯)



## বাংলা একাডেমি ও কাজী নজরুল

ব্রিটিশ আমলের ১৯২৬, ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুলের আগমন তাঁর জীবনের ঘটনাবহুল অধ্যায়গুলোর অন্যতম। এ সময় অবিভক্ত ভারতের বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। কাজী নজরুলের জীবন ও কর্মের আলোচনায় নানাভাবেই বর্ধমান হাউসের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কবি নজরুলের লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্রে বর্ধমান হাউসের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এসব পত্রে তাঁর দ্রোহী রূপ, ভাবুক মন ও প্রেমিক রূপ ফুটে উঠেছে। এছাড়া 'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থ ও 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে বর্ধমান হাউসে অবস্থানকালীন নানা ঘটনার ছাপ রয়েছে। তাই বর্ধমান হাউসের সঙ্গে কাজী নজরুল জড়িয়ে রয়েছেন গভীর একাত্মতায়।

অপরদিকে বর্ধমান হাউসের সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ইতিহাসের নানা বাঁক পরিবর্তনের একটি পর্যায়ে বর্ধমান হাউসে এদেশের বাংলা ভাষার সর্বোচ্চ গবেষণাগার বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা একাডেমির সঙ্গে কাজী নজরুলের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

১৯০৫ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের আমলে ইতিহাসখ্যাত প্রথম বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হয়। এ সময় অবিভক্ত বাংলা প্রদেশ থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করে এ তিনটি বিভাগের সঙ্গে আসামকে যুক্ত করে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামে নতুন একটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়, তার রাজধানী হয় ঢাকা। এর ফলে নতুন প্রদেশের রাজধানীর জন্য পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, বর্ধমান হাউস, কার্জন হলসহ বেশ কটি সুরম্য অট্টালিকা তৈরি হয়। বাংলা প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯১১ সালে এ আন্দোলনের চাপে বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা রদ করা হয়।

১৯১২ সালের পর ঢাকায় আর রাজধানী শহর থাকে না। দ্বিখণ্ডিত বাংলা আবার অবিভক্ত বাংলারূপে ফিরে যায়। এতে পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হলেন। ইংরেজ সরকার পূর্ব বাংলার জনসাধারণের সান্ত্বনার জন্য ঢাকাকে অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের দ্বিতীয় রাজধানী শহররূপে আখ্যায়িত করে। অবিভক্ত বাংলার গভর্নরের শাসন-পরিষদের ৩ সদস্যের অন্যতম সদস্য ছিলেন বর্ধমানের রাজা স্যার বিজয় চাঁদ মাহতাব। তিনি শীতকালে কিছু দিনের জন্য ঢাকায় এসে বর্ধমান হাউসে সরকারি ভবনে থাকতেন বলে ভবনটি বর্ধমান হাউসরূপে পরিচিতি

লাভ করে। বর্ধমানের রাজা ঢাকায় এলে তাঁর সঙ্গে মন্ত্রীরা এবং কিছু কিছু রাজ-কর্মচারীগণও ঢাকায় অবস্থান করতেন। তাঁরা রদ হওয়া নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকাতে সৃষ্ট বিভিন্ন সুরম্য অট্টালিকায় অবস্থান করেন।

১৯২১ সালের ১লা জুলাই রমনা এলাকার কার্জন হলের সীমানার চারদিকে একটি নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বর্ধমান হাউস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে পড়ে। তখন বর্ধমান হাউস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাসভবন হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ১৯২৬ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন বর্ধমান হাউসে বাস করতেন। সেই সময় কয়েকবার কাজী নজরুল কিছু দিন করে কাজী মোতাহার হোসেনের অতিথি হিসেবে এ ভবনের দোতলার একটি কক্ষে ছিলেন।

১৯৪৭ সালের পূর্বকালে কিছু সময় সরকারের উচ্চ পর্যায়ের অতিথিরা বর্ধমান হাউসে অবস্থান করেন। তখন বর্ধমান হাউস উচ্চ পর্যায়ের অতিথিশালার পাশাপাশি এ ভবনে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার বিভিন্ন কার্যালয় ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে কার্জন হলে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ববাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর (তখন Chief Ministerকে প্রধানমন্ত্রী বলা হতো) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন থেকে বর্ধমান হাউস হয় তাঁর সরকারি বাসভবন। এই ভবনে ১৯৪৮ সালে তাঁর সঙ্গে ভাষা-আন্দোলনের ছাত্রনেতাদের সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়, পরে তিনি এ চুক্তি ভঙ্গ করেন। ১৯৪৮ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর তিনি পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ত্যাগ করে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন।

অতঃপর নুরুল আমিন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর (মুখ্যমন্ত্রীকে তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হতো) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন থেকে বর্ধমান হাউস হয় তার সরকারি বাসভবন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেন এবং তাঁরই সময়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র-জনতার মিছিলের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন শহিদ হন। পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতার দাবি অনুযায়ী ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে যুক্তফ্রন্ট তাঁদের ২১ দফা নির্বাচন প্রতিশ্রুতিতে ১৬ দফায় অঙ্গীকার করেছিলেন যে বর্ধমান হাউসে বাংলা ভাষার গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমির উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন হয়। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর নিকট পরাজিত হলে বর্ধমান হাউস থেকে তিনি চলে যাওয়ার পর ২১ দফা প্রতিশ্রুতির ১৬ দফা অনুযায়ী ছাত্ররা এ ভবনে কিছুকাল থেকেছিলেন।



১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদের আয়োজনে ঢাকায় ২৩-২৬শে এপ্রিল সাহিত্য-সম্মেলন হয়েছিল। এ সম্মেলন উপলক্ষে বর্ধমান হাউসের নিচের তলার পূর্বদিকের তিনটি কক্ষে পুস্তক-প্রদর্শনী আয়োজন করেছিলেন। এটি ছিল পূর্ব বাংলার প্রথম পুস্তক-প্রদর্শনী। ১৯৫৪ সালে ৩০শে মে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দিয়ে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের ৯২ক ধারার বলে গভর্নরের শাসন প্রবর্তিত হয়। সরকার বর্ধমান হাউসের আংশিক আর্ট কাউন্সিলকে দেন। সেই সময় বর্ধমান হাউস পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলের আয়োজনে আন্তর্জাতিক নৃত্য-সম্মেলন হয়। উক্ত নৃত্য-সম্মেলনে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ আমন্ত্রিত হয়ে বর্ধমান হাউসে এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ৮৮ বছর। এ সময় তিনি আর্ট কাউন্সিলের অতিথিরূপে বর্ধমান হাউসে প্রায় ২ মাস অবস্থান করেছিলেন।

১৯৫৫ সালের ২৬শে নভেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হলে পরের মাসে ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার যাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। সুতরাং বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা এক বিশাল ইতিহাস। বলা যায়, বর্ধমান হাউসের ইতিহাস মানে বাংলাদেশের ইতিহাস। এই ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায় কাজী নজরুলের আগমন। ব্রিটিশ আমলে ১৯২৬, ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে কাজী নজরুল বর্ধমান হাউসে কয়েকবার এসেছিলেন। ১৯২৮ সালে একবার এসে তিনি বর্ধমান হাউসে অনেক দিন থেকেছিলেন। কাজী নজরুল ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনের আমন্ত্রণ পেয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। উক্ত সাহিত্য সমাজের প্রথম সম্মেলনও তিনিই উদ্বোধন করেছিলেন। কাজী নজরুল দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন 'চল্ চল্ চল্' গানটি গেয়ে তিনি উদ্বোধন করেন। এ সম্মেলনটি হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাঙ্গণে। মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনও মুসলিম হলের প্রাঙ্গণে হয়েছিল। তখন এই হলটিকে শুধু মুসলিম হল বলা হতো। মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের সম্পাদক ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। তিনি তখন মুসলিম হলের হাউস টিউটর হিসেবে বর্ধমান হাউসে বসবাস করতেন। কাজী নজরুল ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি কবি কাজী নজরুলের থাকার ব্যবস্থা হয় কাজী মোতাহার হোসেনের অতিথি হিসেবে বর্ধমান হাউসে। এ সম্বন্ধে কাজী নজরুলের স্নেহধন্য, বিশিষ্ট কাজী নজরুল গবেষক আবদুল কাদির লিখেছেন :

> ...দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন নজরুল তাঁর 'চল্ চল্ চল' গানটি গেয়ে। ... সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁর থাকার জায়গা করে দেওয়া হয় বর্ধমান হাউসেরই একটি কক্ষে, সেখানে তিনি অনেক দিন অবস্থান করেছিলেন।

[উদ্ধৃতি : নজরুল প্রতিভার স্বরূপ : আবদুল কাদির। শাহাবুদ্দীন আহমদ (সম্পা.) কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, জানুয়ারি ১৯৮৯, ঢাকা, পৃ. ৫০।]

বর্ধমান হাউস থেকে তিনি ঢাকার বিভিন্ন বিদ্বৎজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। বেশ ক'জন গুণীজনের বাসায় সংগীতের আড্ডা দিয়েছেন। তন্মধ্যে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। বর্তমান পুরাতন হাইকোর্ট ভবন ছিল সে সময় ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষের বাসভবন। কাজী নজরুল তাঁর বাসভবনে যেতেন। তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতেন। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের একমাত্র কন্যা উমা মৈত্রকে (নোটন) কাজী নজরুল গান শেখাতেন। কাজী নজরুল প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্যেন বোসের বাসায় যেতেন। তাঁর বাসা ছিল বর্তমান জাতীয় প্রেস ক্লাব। সেখানেও কবি নজরুল গানের আড্ডা দিতেন। সত্যেন বোস সংগীতপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। এছাড়া বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সংগঠক, মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকার সম্পাদক, সমকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল হুসেনের বাসায়ও কাজী নজরুল যেতেন। তখন তাঁর বাসা ছিল বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পুরাতন বিল্ডিং।

কাজী নজরুল বর্ধমান হাউসে অবস্থান করে ওয়ারিতে রানু সোমের (প্রতিভা বসু) বাসায় যেতেন। তাঁকেও গান শেখাতেন। বর্ধমান হাউসে অবস্থানকালে কাজী নজরুলের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে পরিচয় হয়। ফজিলাতুন্নেসা মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের একটি অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। কাজী নজরুল গভীরভাবে ফজিলাতুন্নেসাকে ভালোবাসতেন। তাঁর বাসা দেওয়ান বাজারে যেতেন। তাঁর ছোট বোন শফিকুন্নেসাকে কাজী নজরুল গান শেখাতেন।

বর্ধমান হাউসে অবস্থানকালে কবির জীবনে এক দুঃখজনক ঘটন ঘটে। কাজী নজরুল একদিন বনগাঁয় রানু সোমকে গানের প্রশিক্ষণ শেষে রাতে বর্ধমান হাউসে ফিরছিলেন। পথে একদল গুন্ডা লাঠিসোটা নিয়ে কাজী নজরুলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু কাজী নজরুলও সহজে ছেড়ে দেননি। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর হাবিলদার। তিনি বেতের মুঠোয়ালা একটা লাঠি কেড়ে নিয়ে তাদেরকে দু-এক ঘা কষে লাগিয়ে দৌড়ে আসেন বর্ধমান হাউসে। তখন তাঁর জামা-কাপড় ছেঁড়া, হাতে-পিঠে আহত হওয়ার চিহ্ন ছিল। এ নিয়ে 'সমকালে' সাপ্তাহিক 'সওগা'তে সংবাদ ছাপা হয়েছিল।

নানা ঘটনায়, নানা স্মৃতি নিয়ে কবি ঢাকা থেকে কলকাতায় যান। কলকাতা থেকে বর্ধমান হাউসের ঠিকানায় বেশ কটি পত্র লিখেন। সুতরাং বর্ধমান হাউসের অর্থাৎ বাংলা একাডেমির সঙ্গে কাজী নজরুল জড়িয়ে আছেন গভীর একাত্মতায়। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালেও বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে এসেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন সম্বিৎহারা, তারপরও তাঁর শারীরিক উপস্থিতির ফলে বাংলা একাডেমি ধন্য হয়েছিল।



# বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুলের বই একটি সাধারণ মূল্যায়ন

ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদের চেতনার স্মারক বাংলা একাডেমি। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির গবেষণায় নিয়োজিত এক অনন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং 'বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক'। বাংলা একাডেমির জন্ম ও বিকাশ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত যা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঘটেনি। ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে। বহুভাষাবিদ জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টা।

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে হক-ভাসানী সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত হয় রাজনৈতিক মোর্চা যুক্তফ্রন্ট। এই যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবি সংবলিত নির্বাচনি ইশতেহারের ১৬ দফায় অঙ্গীকার করা হয় বর্ধমান হাউসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগার করা হবে। এরই অনুবৃত্তিক্রমে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫৫ সালে ২৬শে নভেম্বর পূর্ববাংলা সরকার বাংলা একাডেমির আয়োজক সমিতি (প্রিপারেটরি কমিটি) গঠন করে আদেশ জারি করেন। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ একাডেমির স্পেশাল অফিসার (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালে একাডেমির প্রথম পরিচালক হিসেবে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে ৩রা এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে 'দি বেঙ্গলি একাডেমি অ্যাক্ট, ১৯৫৭ পাশ করে এর আইনগত ভিত্তি দেয়া হয়। এই আইনে বাংলা একাডেমিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করা হয় এবং বাংলা একাডেমি 'কাউন্সিল'-এর নাম ও মর্যাদা লাভ করে। অতঃপর ১৯৬০ সালের ২৬শে জুলাই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর 'দি বেঙ্গলি একাডেমি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এতে কাউন্সিল গঠনসহ একাডেমির কর্মকাণ্ড পরিচালনা বিষয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি 'দি বাংলা একাডেমি অর্ডার, ১৯৭২' জারি করেন। এই আদেশ দ্বারা কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমির সাথে সমন্বিত হয়, কাউন্সিলের নাম

পরিবর্তন করে কার্যনির্বাহী পরিষদ করা হয় এবং মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয় বাংলা একাডেমির প্রধান নির্বাহী হিসেবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক নিযুক্ত হন।

১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ১৯৭৮ সালে ৬ই জুন 'দি বাংলা একাডেমি অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮' জারি করা হয় এবং ২২শে সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে উক্ত অর্ডিন্যান্স রহিত পূর্বক সংশোধনসহ উহা পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করে 'বাংলা একাডেমি আইন ২০১৩' জারি করা হয়। বর্তমানে এই আইন দ্বারা বাংলা একাডেমি পরিচালিত হচ্ছে। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জাতীয় চিন্তাচেতনায় প্রভাব রাখছে।

## বাংলা একাডেমির বই

বাংলা ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি ও গবেষণা নিয়োজিত বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলা একাডেমির জাতির প্রতি অঙ্গীকার রয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই একাডেমি অব্যাহতভাবে ভাষা, সাহিত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশনা 'বাংলা একাডেমি পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে। ১৯৫৭ সালে জুন মাসে আহমদ শরীফ-এর সম্পাদনায় দৌলত উজির বাহরাম খাঁ রচিত কাব্য 'লাইলী মজনু' প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা একাডেমির গ্রন্থ প্রকাশনা শুরু। লাইলী-মজনু গ্রন্থটি তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান গভর্মেন্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত একাডেমির মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩১৭।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমির সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (সেন্ট্রাল বোর্ড ফর ডেভেলপমেন্ট অব বেঙ্গলি) সমন্বিত হয়। একীভূত হওয়ার পূর্বে প্রতিষ্ঠান দুটির প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকার সংখ্যা (কোনো কোনো গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ ও সংস্করণসহ) ৪৬৬।

১৯৯১ সাল থেকে একাডেমি প্রকাশিত পুস্তকে আইএসবিএন (ISBN) নম্বর প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত 'বাংলা একাডেমির প্রকাশনা' পুস্তিকায় বলা হয়েছে, পূর্বে প্রকাশিত বইসহ বাংলা একাডেমি থেকে ৩৪টি বিষয়-শিরোনামে ৭৬টি বিষয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সাল পর্যন্ত মোট ৬৪০৫টি গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এ হিসাবের মধ্যে কোনো কোনো গ্রন্থের একাধিক মুদ্রণ ও সংস্করণ ধরা হয়েছে।

একাডেমির এই বিপুল সংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে ২৪ খানা অভিধানগ্রন্থই রয়েছে, যা সর্বমহলে সমাদৃত।



## বাংলা একাডেমির কাজী নজরুলের বই

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবিস্মরণীয় যুগস্রষ্টা। বাংলা একাডেমির সঙ্গে তিনি জড়িয়ে আছেন গভীর একাত্মতায়। কাজী নজরুল একাডেমির বর্ধমান হাউসে বরেণ্য আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে একাধিকবার এসেছিলেন। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ভাষা আন্দোলনের ফসল বাংলা একাডেমির সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অপরদিকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে কাজী নজরুলের ভূমিকা অবিভাজ্য ও অনিবার্য। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে কাজী নজরুলের কবিতা ও গান যুদ্ধাস্ত্রের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। কাজী নজরুলের লেখা 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি', 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর', 'নম নম বাংলাদেশ মম', 'চল্ চল্ চল্' প্রভৃতি গান এবং 'পূর্ববঙ্গ'-সহ অনেক কবিতা এদেশের মুক্তি সংগ্রামসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে বাঙালিকে নবজাগরণের প্রেরণা দিচ্ছে। তাঁর 'পূর্ণ অভিনন্দন' কবিতা থেকে আহরিত 'জয় বাংলা' প্রত্যয়টি ছিল আমাদের মুক্তি সংগ্রামের অবিনাশী স্লোগান।

'বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক' বাংলা একাডেমি কাজী নজরুলের স্মৃতির ধারক ও বাহক। কাজী নজরুলের স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ একাডেমির বর্ধমান হাউসে 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' (২৯.০৮.১৯৭৮) এবং একাডেমির প্রাঙ্গণে 'নজরুল চত্বর (২৫.০৬.২০০৩) ও 'মঞ্চ' (২৫.০৬.২০০৩) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া একাডেমির সম্মুখস্থ সড়কের নাম কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ (১৯৭৬) এবং একাডেমির প্রধান ও একমাত্র কার্যালয় এই সড়কেই অবস্থিত। বাংলা একাডেমি কাজী নজরুলের জন্মদিন ও মৃত্যুবার্ষিকী অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে আসছে। বাংলা একাডেমিতে কাজী নজরুল জয়ন্তী জাতীয়ভাবে পালন করা হয়। বাংলা একাডেমি ১৯৬১-র ২৫শে মে সপ্তাহব্যাপী কাজী নজরুল-জয়ন্তী উৎসব আয়োজন করেছিল। এই আয়োজনে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিদ্রোহী কবির প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ, সম্পাদিত পত্রিকা, এগুলির প্রথম সংস্করণ, নিজের লেখা পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, কবির বিভিন্ন বয়সের আলোকচিত্র, কবি ও তার গ্রন্থ সম্পর্কে লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রদর্শন করা হয়েছিল। সেই থেকে শুরু করে একাডেমিতে প্রতি বছর কাজী নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হয়ে আসছে। কাজী নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কোনো বিশেজ্ঞ বা পণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা কাজী নজরুল-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ করা হয়। এদেশে শতাধিক বছর ধরে নজরুল চর্চা হলেও নজরুল-বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা বিপুল নয়। এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রধান কৃতিত্বের দাবিদার কাজী নজরুলের প্রতিভার প্রকাশ, বিকাশ, সাহিত্য একাডেমি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ও চর্চা এবং

প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে একাডেমি থেকে ১২শ খণ্ডের 'নজরুল-রচনাবলী' নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ছাড়াও নজরুল-সংগীত সংকলন গ্রন্থ, নজরুল-বিষয়ক অনেক গবেষণা-গ্রন্থ, সাহিত্য-সমালোচনামূলক গ্রন্থ, নজরুল-কাব্যের অনুবাদ-গ্রন্থ এমনকি নজরুল-সংগীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। মূলত একাডেমি থেকেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নজরুল-চর্চা ব্যাপকতর রূপে শুরু হয়। এক্ষেত্রে কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) পথিকৃৎ ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (সেন্ট্রাল বোর্ড ফর ডেভেলপমেন্ট অব বেঙ্গলি)-এর উদ্যোগে এবং প্রখ্যাত নজরুল গবেষক আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'নজরুল-রচনাবলী' প্রকাশনার ব্যবস্থা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগগোযোগী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ ছিল। পাকিস্তান আমলে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র ৩টি খণ্ড (১ম খণ্ড, ১৯৬৬; ২য় খণ্ড, ১৯৬৭; ৩য় খণ্ড, ১৯৭০) প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমির সঙ্গে 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয়। আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে ৩টি খণ্ড এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমি থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই নজরুল-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড (১৯৭৭), ৫ম খণ্ড (প্রথমার্ধ, জুন ১৯৮৪), দ্বিতীয়ার্ধ (ডিসেম্বর ১৯৮৪)] মোট এই ৫টি খণ্ড তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই ৫টি খণ্ড প্রকাশিত না হলে নজরুল-চর্চা ও গবেষণার ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতো। মোটকথা এ পাঁচ খণ্ড প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রাথমিকভাবে সমগ্র কাজী নজরুল-রচনা সংকলন সম্পূর্ণ হয়। অতঃপর দীর্ঘ বছর কাজী নজরুলের রচনাবলি মুদ্রিত না হওয়ায় বাংলা একাডেমি পূর্ণাঙ্গভাবে 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে দশ বছর পরে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমি 'নজরুল-রচনাবলী'র নতুন সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে নয় সদস্যের একটি সম্পাদনা-পরিষদকে অর্পণ করেন। ১৯৯৩ সালে তাঁদের সম্পাদনায় 'নজরুল-রচনাবলী'র সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ৪টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই ৪টি খণ্ড একাধিকবার পুনর্মুদ্রণ হয়। পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমি ২০০৫ সালের অক্টোবরে নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ করে। এই উপলক্ষ্যে নজরুল বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ছয় সদস্যের সম্পাদনা-পরিষদ গঠিত হয়। সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি রফিকুল ইসলামের তত্ত্বাবধান ও দিঙ্‌নির্দেশনায় কাজী নজরুলের রচনাবলি এ সংস্করণ ২০০৬ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে বারোটি খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী' প্রকাশিত হয়। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী', বারোটি খণ্ড যা নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ নামে পরিচিত সেটি এখনো চলছে এবং পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে।



নিম্নে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত কিছু নজরুল-বিষয়ক গ্রন্থের নাম সন্নিবেশিত করা হলো। এই তালিকায় কাজী নজরুলের গ্রন্থগুলোর নাম 'বাংলা একাডেমির প্রকাশনা' ২০২৪ এবং কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত 'নজরুল-গ্রন্থপঞ্জি ও নজরুল-বিষয়ক গ্রন্থাবলি' (আগস্ট ১৯৯৪) আহরিত করা হয়েছে। এটি একটি অসম্পূর্ণ তালিকা, তালিকার বাইরেও বাংলা একাডেমি থেকে কাজী নজরুল-বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে।

**নজরুল-গ্রন্থ (১৯৫৬-২০১৯)**

১. নজরুল-রচনাবলী ১ম খণ্ড : আবদুল কাদির, ২৫শে মে, ১৯৬৬, ২য় সংস্করণ ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫

২. নজরুল-রচনাবলী ২য় খণ্ড : আবদুল কাদির, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭, ২য় সংস্করণ : ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪

৩. নজরুল-রচনাবলী ৩য় খণ্ড : আবদুল কাদির, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০, ২য় সংস্করণ : আগস্ট, ১৯৭৬, তৃতীয় সংস্করণ : ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪

৪. নজরুল-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড : আবদুল কাদির, ২৫শে মে, ১৯৭৭, ২য় সংস্করণ : ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪

৫. নজরুল-রচনাবলী ৫ম খণ্ড : আবদুল কাদির, ২৫শে মে, ১৯৮৪

৬. নজরুল-রচনাবলী ৫ম খণ্ড : (দ্বিতীয়ার্ধ) আবদুল কাদির, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪

৭. নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড থেকে ৪র্থ খণ্ড, নতুন সংস্করণ, আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য

৮. নজরুল-রচনাবলী ১ম খণ্ড থেকে ১২শ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য।

**কাজী নজরুল-বিষয়ক গ্রন্থ**

১. নজরুল নির্দেশিকা : রফিকুল ইসলাম, ১৯৬৯

২. নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ : করুণাময় গোস্বামী, ১৯৭৮

৩. বাংলা কাব্যগীতির ধারায় নজরুলের স্থান : করুণাময় গোস্বামী

৪. যুগকবি নজরুল : আবদুল কাদির, ১৯৮৬

৫. নজরুল ইসলাম : কালজ ও কালোত্তর : আবদুল মান্নান সৈয়দ, ১৯৭৯

৬. নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ : বিশ্বজিৎ ঘোষ

৭. নজরুল সাহিত্য দর্শন : শাহাবুদ্দীন আহমদ

৮. যুগস্রষ্টা নজরুল : খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, ১৯৫৭; ২য় সংস্করণ : ১৯৬৮
৯. নজরুল স্বরলিপি : আবদুল কাদির সম্পাদিত
১০. তোরা সব জয়ধ্বনি কর : আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত
১১. গীতি সংকলন : কাজী নজরুল ইসলাম, ১ম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত
১২. গীতি সংকলন : কাজী নজরুল ইসলাম, ২য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত
১৩. গীতি সংকলন : কাজী নজরুল ইসলাম, ৩য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত
১৪. নজরুল-গীতিমালা, প্রথম খণ্ড (স্বরলিপি) : ফিরোজা বেগম
১৫. নজরুল-গীতিমালা, দ্বিতীয় খণ্ড (স্বরলিপি), ফিরোজা বেগম
১৬. নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ : বিশ্বজিৎ ঘোষ
১৭. নজরুল পাণ্ডুলিপি (নজরুলের হস্তাক্ষর)
১৮. নজরুলকে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ
১৯. নজরুল সংগীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, নজরুল ইসলাম, ১৯৮২
২০. নজরুল শব্দকোষ : আবুল কালাম মুস্তফা সংকলিত
২১. নজরুলের পাণ্ডুলিপি : নজরুলের হস্তাক্ষর
২২. নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায় : সুফী জুলফিকার হায়দার
২৩. নজরুল সাহিত্য পুরাণ প্রসঙ্গ, শিমুল মাহমুদ, জুন ২০০৯
২৪. নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা, পারভীন আক্তার জেমী, জুন ২০১০
২৫. নজরুলের নাটক বিষয় ও আঙ্গিক, মোঃ সাইফুল ইসলাম, জুন ২০০৮
২৬. 'নজরুলের সৃষ্টিতে' বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি, ড. আলী হোসেন, জুন ২০১১
২৭. বহুমাত্রিক নজরুল, অনুপম হায়াৎ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭
২৮. নজরুল সংগীত : বাণীর বৈভব, জুন ২০২১।




# ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও কাজী নজরুল একটি বন্ধুত্বের নেপথ্যে

বিশ শতকের বিশ-ত্রিশ দশকের ঢাকা ছিল সংস্কৃতিমান একটি শহর। এই সময়কালে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজের (১৮৪১) ২৪তম অধ্যক্ষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (১৮৭৭-১৯৪৪)। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক ছিলেন। সারা বাংলায় তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর সময় ঢাকা কলেজের খ্যাতি প্রেসিডেন্সি কলেজকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সারা বাংলার এ কলেজ এক নম্বর কলেজ হিসেবে পরিগণিত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের ঢাকা কলেজে অধ্যক্ষকাল ১৯২৭-১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি দাপ্তরিকভাবে নিজের নাম ছাড়াও সুরেশ্বর শর্মা, স্মৃতিশেখরসহ নানা নামে সমকালে পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে লিখতেন। সেই সময় 'সাহিত্যিকা' নামে একটি সাহিত্য সংগঠন ছিল। এর সম্পাদক ছিলেন রথীন্দ্রকান্ত চৌধুরী। এ সংগঠনের মজলিসে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র যেতেন। তিনি মজলিশি ব্যক্তিত্বের পণ্ডিত ছিলেন এবং কবিতা লিখতেন। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভালো বন্ধুত্ব ছিল। ঢাকায় অধ্যক্ষের মেয়াদ শেষে কলকাতায় চলে যান তিনি। উল্লেখ্য, বিশিষ্ট নজরুল সংগীতশিল্পী কাননবালাকে বিয়ে করেন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের ভাই দ্বিজেন মৈত্রের ছেলে অশোক মৈত্র। কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল।

তাঁর 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা' অনুবাদ কবিতা সমকালে বিদগ্ধ সমাজে প্রশংসিত হয়েছিল। গ্রন্থটির সমালোচনা 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশ পেলে সাহিত্যসমাজে আলোড়ন তুলেছিল।সমসাময়িককালের সাময়িকী পত্রপত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের লেখা গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হতো। কাজী নজরুল সম্পাদিত 'ধূমকেতু' এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের পত্নী মিসেস মৈত্রও ছিলেন শিক্ষা-সংগীত-চিত্রকলার অনুরাগী মহিলা। তাঁরা দুজনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট করেছেন এবং উভয়ই পূর্ববাংলা ব্রহ্মাসমাজের দাতা ও কর্মী ছিলেন।

ব্রাহ্মসম্মিলনীর সমাজের সভ্যশ্রেণিভুক্ত হয়ে ঢাকা শহরের নানা কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন তাঁরা। পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের তালিকায় তাঁদের ক্রমিক নং ১১৬ ও ১১৭ ছিল। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের ছাত্রদের মাঝে

বিরাট প্রভাব ছিল। ত্রিশের দশকে ঢাকার এই খ্যাতিমান শিক্ষক এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে কাজী নজরুলের একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সমকালে বিভক্ত ভারতের অবিভক্ত বাংলায় কাজী নজরুলের ছাত্রদের মাঝে অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন। এই জনপ্রিয়তার জন্য বিভক্ত ভারতের অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠনের পক্ষ থেকে কাজী নজরুলকে নিমন্ত্রণ করা হতো। কাজী নজরুল এসবের আমন্ত্রণ রক্ষা করতেন। এরই ধারাবাহিকতায় কাজী নজরুল কয়েকবার বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি বাংলাদেশকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। এদেশের মানুষের ভালোবাসার টানে কাজী নজরুল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়ে ঢাকায় এলে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় হয়।

কাজী নজরুল ও সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র উভয়ই ছিলেন কবি এবং সাহিত্যামোদী। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুরেন্দ্রনাথ নিজের নাম ছাড়াও 'সুরেশ্বরশর্মা' ইত্যাদি নামে লিখতেন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র একজন বিশিষ্ট দাবাড়ু ছিলেন। কাজী নজরুলও দাবা খেলার অনুরাগী ছিলেন। বয়সের ব্যবধান ছাপিয়ে দুজনের মধ্যে এই সহমর্মিতার ফলে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। এই দুজনের বিশেষ পরিচয়ের কথা সমকালীন স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থে অনেকেই লিখেছেন।

এছাড়া সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের প্রতি কাজী নজরুলের বিশেষ প্রীতি লক্ষ করা যায় কাজী নজরুলের 'চক্রবাক' (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রের দীর্ঘ কবিতায়। এই কবিতাটি হলো :

**উৎসর্গ**

বিরাট প্রাণ, কবি, দরদী–
প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
শ্রীচরণারবিন্দেষু
দেখিয়াছি হিমালয়, করিনি প্রণাম,
দেবতা দেখিনি, দেখিয়াছি স্বর্গধাম।...
সেদিন প্রথম যবে দেখিনু তোমারে,
হে বিরাট, মহাপ্রাণ, কেন বারেবারে
মনে হল এতদিনে দেখিনু দেবতা!
চোখে পুরে এল জল, বুক পুরে কথা।
ঠেকিল ললাটে কর আপনি বিস্ময়ে,
নব লোকে দেখা যেন নব পরিচয়ে।
কোথা যেন দেখেছিনু কবে কোন লোকে,



সে স্মৃতি দেখিনু তব অশ্রুসিক্ত চোখে।
চলিতে চলিতে পথে দূর পথচারী
আসিলাম তব দ্বারে, বাহু আগুসারি'
তুমি নিলে বক্ষে টানি, কহ নাই কথা,
না কহিতে বুঝেছিলে ভিখারীর ব্যথা।
মুছায়ে পথের ধূলি অফুরান স্নেহ–
নিন্দা-গ্লানি-কলঙ্কের কাঁটা-ক্ষত দেহে
বুলাইলে ব্যথা-হরা স্নিগ্ধ শান্ত কর,
দেখিনু দেবতা আছে আজো ধরা 'পর!
(২)
নূতন করিয়া ভালো বাসিনু মানবে,
যাহারা দিয়াছে ব্যথা তাহাদেরি স্তবে
ভরিয়া উঠিল বুক, গহি নব গান!
ভুলি নাই, হে উদার, তব সেই দান।
উড়ে এসেছিনু ভগ্নপক্ষ চক্রবাক
তব শুভ্র বালুচরে, আবার নির্ব্বাক
উড়িয়া গিয়াছি কবে, আজো তার স্মৃতি
হয়ত জাগিবে মনে শুনি' মোর গীতি!
শায়ক বিঁধিয়া বুকে উড়িয়া বেড়াই
চর হতে আন-চরে, সেই গান গাই!...
ভালো বেসেছিলে মোরে, মোর কণ্ঠে গান,
সে গান তোমারি পায়ে তাই দিনু দান!

কাজী নজরুল তাঁর 'চক্রবাক' কবিতাগ্রন্থ উৎসর্গ করেন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রকে, অপরদিকে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁর 'অন্তঃসলিল (১৯৩৮) কবিতাগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন কাজী নজরুলকে। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে কাজী নজরুলের পরিচয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে হয়েছিল। ঢাকায় কাজী নজরুলের 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর সম্মেলনে বরেণ্য অতিথি হিসেবে যোগদান প্রসঙ্গে কাজী নজরুলের বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেন স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন :

> এরপর নজরুল ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উক্ত মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনেও ঢাকায় এসেছিলেন। আমি তখন বর্ধমান হাউসের হাউসে টিউটর হিসেবে উক্ত ভবনের দোতলায় বাস করতাম। নজরুল ইসলাম সেবার মাসাধিককাল আমার সঙ্গে ছিলেন।...
>
> এবারে বনগাঁর অধিবাসিনী প্রতিভা সোম ওরফে রানু সোম,–(বর্তমানে বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী) এবং রমনা হাউসের অধিবাসীনী উমা মৈত্র ওরফে নোটন–(ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সুরেন্দ্র মৈত্রের একমাত্র কন্যা) এই দুইজনের সঙ্গে কবির বিশেষ পরিচয় হয়। রানু ও নোটন দুইজনেরই পিতামাতা ও পরিবারবর্গের সঙ্গে আমার ও আমার পরিবারবর্গের সবিশেষ পরিচয় ছিল।...

প্রিন্সিপাল মৈত্রের একমাত্র সন্তান নোটন ছিল অপরূপ সুন্দরী। দিলীপ রায় ঢাকায় এসে প্রধানত প্রফেসর সত্যেন বোসের বাড়িতেই উঠতেন। ইনি সেখানে এবং প্রফেসর বোসের বন্ধুদের বাড়িতেও গানের আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে গান গাইতেন। তাই তিনি আমাদের বাড়িতেও দু একবার এসে গান শুনিয়েছেন; তাছাড়া মৈত্র মশায়ের বাড়িতে, রূপ বাবুর বাড়িতে, ধানকোড়া জমিদার বাড়িতেও এবং অন্যত্রও–কার্জন হল, জগন্নাথ হল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও–গান করতেন। তবে কণ্ঠ-সঙ্গীতে নোটনের তেমন অনুরাগ ছিল না। সে ছিল চিত্রশিল্পী ও সেতারী; বিখ্যাত সেতার-শিল্পী হায়দার আলীর কাছে তার সেতার শিক্ষা বিকশিত হয়। তাই দিলীপ রায়ের বা নজরুলের গানের সঙ্গে নোটন সেতারের সংগীত করতেন। এর বাপ-মা দুজনেই কিছুটা বিলাতী ধরনের ব্রাহ্ম ছিলেন। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, চিত্র প্রভৃতির অনুরাগীরা এঁদের বন্ধু-শ্রেণির অন্তর্গত ছিলেন। তাছাড়া একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন।

[কাজী মোতাহার হোসেন, স্মৃতিচিত্র, উদ্ধৃতি, তোমার সাম্রাজ্যে, যুবরাজ, হায়াৎ মামুদ, জ্যোতিপ্রকাশ (সম্পা.), সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, পৃ. ৯৬-৯৭]

বিশের ত্রিশের দশকে কাজী নজরুল কবি-গায়ক, রাজনৈতিককর্মী হিসেবে নজরুল জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিলেন। তিনি ছিলেন তরুণ যুব সমাজের শিরোমণি। কাজী নজরুলকে নিয়ে মজলিস মানেই গান-কবিতা-বক্তৃতার আড্ডা। তাছাড়া কাজী নজরুল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের অসম্ভব ভক্ত। অনেক রবীন্দ্র সংগীত তার মুখস্থ ছিল। গীতাঞ্জলি গ্রন্থ তার মুখস্থ ছিল।

১৯২৮ সালে ছিল অবিভক্ত বাংলার এক বিক্ষুব্ধ সময়। বিক্ষুব্ধ সময়ে তিনি ঢাকা কলেজে অধ্যক্ষকালে অনেক বিপ্লবী তার ছাত্র ছিল। তারার তার কাছে পিতৃস্নেহ ও বন্ধুসুলভ আচরণ পেয়েছেন। তার সময় ঢাকা কলেজ ছিল আদর্শ স্থানীয়।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে কাজী নজরুলের সম্পর্ক বরাবর সৌহার্দের ও শ্রদ্ধাবোধ বিজড়িত। এর মূলে রয়েছে উভয়ের জীবনাদর্শ। দুজনেই প্রগতিতে বিশ্বাসী। মুক্তবুদ্ধির সাধক বলেই কাজী নজরুল ও সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের মধ্যে মিল ঘটেছে।

১৯৩১ সালের জুন মাসে নাট্যকার মন্মথ রায়, শিল্পী অখিল নিয়োগী, অন্যান্যসহ কাজী নজরুল ইসলাম দার্জিলিং সফরে গিয়েছিলেন। তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দার্জিলিং সফরে ছিলেন। কবি নজরুল তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের পরিবারও তখন দার্জিলিঙে অবস্থান করেছিলেন। প্রফেসর সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের মেয়ে নোটন পাশ্চাত্য সংগীতে বিশেষ দখল ছিল। সে খুব পিয়ানো বাজাতে পারতেন। কাজী নজরুল এই সফরে প্রায়ই নোটনের পিয়ানো শুনতেন। দার্জিলিং সফরে কাজী নজরুলের সঙ্গে জাহানারা বেগম চৌধুরীর পরিচয় হয়েছিল। পূর্বেই উমা মৈত্র ওরফে নোটনের পরিবারের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল। কাজী নজরুল তাঁকে গান শেখাতেন। এই সফরে তাদের



সম্পর্ক আরও গভীর হয়। নোটন ওরফে উমা মৈত্রের শেষ জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। কাজী নজরুলের শিল্পীমনে এই পরিবারের মনোরম ছবি আছে ‘শিউলিমালা’ গল্পে ও ‘চক্রবাক’ কাব্যের কয়েকটি কবিতায়। কাজী নজরুল একটি গানে নোটনকে অমর করে রেখেছেন। এই গানটি হলো :

না-ই পরিলে নোটন-খোঁপায় ঝুমকো জবার ফুল

না-ই পরিলে নোটন-খোঁপায় ঝুমকো জবার ফুল (রানী)
এমনি এসো (ওগো) লুটিয়ে পিঠে আকুল এলোচুল।।
সজ্জা-বিহীন লজ্জা নিয়ে
এমনি তুমি এসো প্রিয়ে
গোলাপ ফুলের রঙ মাখাতে হয় যদি হোক ভুল।।
গৌর দেহে নাই জড়ালে গৌরী চাঁপার শাড়ি
ওগো ভূষণ পরে না-ই বা দিলে রূপের সাথে আড়ি।
যেমন আছ তেমনি এসো
নয়ন তুলে একটু হেসো
সেই খুশিতে উঠবে দুলে আমার হৃদয় কূল।।

নোটন প্রসঙ্গে স্মরণীয় এ গানে কবি তার অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন।

জাহানারা বেগম চৌধুরী (১৯১৩-১৯৮২) লিখেছেন :

একবার কবি দা দার্জিলিং-এ আমাদের সঙ্গে মাস দুয়েক ছিলেন। সেটা ছিল ১৯৩১ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। তখন রবীন্দ্রনাথও দার্জিলিং-দিনেন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, মৈত্রী দেবীসহ সপরিবারে ছিলেন। প্রফেসর সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রও কাছাকাছি থাকতেন। কবি দা আমাদের সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই গুরুদেবের ওখানে যেতেন, দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গেও গান বাজনা এবং কবিতা নিয়ে বিশেষত আরবি-ফারসি কবিতার ছন্দ ও গজল ইত্যাদি গানের সুর সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা হতো। প্রফেসর সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের মেয়ে নোটন মৈত্রের পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশেষ দখল ছিল। নোটন দি খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন। ওঁদের কাছে প্রায় রোজই যেতে হতো, পিয়ানো না শুনিয়ে কবি দার কাছ থেকে নোটনদির রেহাই ছিল না।

নজরুলের কিছু অপ্রকাশিত রচনা প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ উদ্ধৃতি : শতবর্ষে নজরুল, রফিকুল ইসলাম (সম্পা.) কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ৬৮৬

# পরিশিষ্ট ১

[শিখা ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র। আবুল হুসেন ছিলেন শিখা পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদক। শিখা বছরে একবার প্রকাশিত হতো। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল চৈত্র ১৩৩৩ (৮ এপ্রিল ১৯২৭)। পত্রিকাটি মুসলিম সাহিত্য-সমাজের পক্ষে আবদুল কাদির কর্তৃক মুসলিম হল থেকে প্রকাশিত এবং মুন্সি আহমদ আলী কর্তৃক সাত রওজার (ঢাকা) ইসলামিয়া প্রেস থেকে মুদ্রিত। শিখার পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৩৫ (অক্টোবর ১৯২৮) ও ১৩৩৬ (১৯২৯) সাল। চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ও আবুল ফজল। প্রকাশকাল ১৩৩৭ (১৯৩০) ও ১৩৩৮ (১৯৩১) বঙ্গাব্দ। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম সংখ্যা সৈয়দ ইমামুল হোসেন কর্তৃক নবাবপুরের (ঢাকা) মডার্ন লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত।

শিখা ছিল সমকালের অন্যান্য সাময়িকপত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকাটি বুদ্ধিজীবী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিখার প্রতিটি সংখ্যার শিরোদেশে 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব' কথাটি মুদ্রিত থাকত। এটিকে শিখা পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী তাদের মটো বা আদর্শবাণী হিসেবে বিবেচনা করত। মুসলিম সাহিত্য-সমাজ দশ বছর তাদের সাময়িক পত্র ও বার্ষিক অধিবেশনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে পত্রিকার পাঁচটি সংখ্যার পর আর শিখার প্রকাশ সম্ভব হয়নি।

শিখার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আবুল হুসেন। ১৯৩৭ সালে "শিখা" বন্ধ হলেও এই আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ তথা বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এ আন্দোলনের কারণেই বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী বাঙালি মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটেছে। নিম্নের লেখাটি 'শিখা' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে (১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ) অধিবেশনের উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে ছাপা হয়।]

নতুনের গান
কাজী নজরুল ইসলাম

চল্ চল্ চল্।
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,



নিম্নে উতলা ধরণী তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্॥
ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাতে
বাধার বিন্ধ্যাচল।
'তাজা-ব-তাজার' গাহিয়া গান
সজীব করিব গোরস্থান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।
কোরাস
উর্ধ্বে আদেশ হানিছে বাজ
শহিদী ঈদের সেনারা সাজ
দিকে দিকে চলে কুচকাওয়াজ
খোলবে দিন মহল।
চল্‌রে নৌজোয়ান—
শোনরে পাতিয়া কান
নয়া জমানার মিনারে মিনারে
নব ঊষার আজান।
ভাঙরে ভাঙ আগল।
চল্‌রে চল্‌রে চল্
করে সে খেয়ালি বাদশাহী
সেই সে অতীতে আজো চাহি'
যাস মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস অশ্রুজল।
যাক্‌রে তখত তাউস
জাগ্‌রে জাগ্ বেহুঁশ,
ডুরিল'রে দেখ রোম গ্রীক
কত পারশ্য রুষ।
জাগিল পুনঃ সকল।
আমরা রচিব নতুন করিয়া
ধুলায় তাজমহল
চল্‌রে চল্‌রে চল্॥

# পরিশিষ্ট ২

[নিম্নের লেখাটি 'শিখা' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে (১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ) ছাপা হয়।]

## নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ

ফজিলাতুন্নেসা এম.এ.

সুন্দর করে একটি প্রবন্ধ সৃষ্টি করবার জন্য যা কিছুর প্রয়োজন সে চিন্তাশীলতা বা জ্ঞানের গভীরতা আমার নেই। তাই আপনাদের নিকটে আমার অনুরোধ এই যে, একে প্রবন্ধ হিসাবে বিচার না করে শুধু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত সামান্য দুই একটি কথা বলেই গ্রহণ করবেন।

নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদের রূপটি ফুটিয়ে তোলার ভার আপনারা একটি নারীকেই দিয়েছেন, কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত কি বাস্তবিকই কিছু আছে যা বিশ্বজনীন অনুভূতিরই ফল? একই জিনিসকে মানুষ তার প্রবৃত্তি ও প্রবণতা অনুসারে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখে থাকে, এবং তার থেকে যেটুকু রস গ্রহণ করে থাকে তারও স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমিও তাই একান্তভাবে আমারই অনুভূতিলব্ধ কয়েকটি কথা বলব।

আধুনিক শিক্ষা হতে যা কিছু আমি আমার জীবনে পেয়েছি তাতে হয়ত ভুল পাওয়ার পরিমাণই বেশী। বুদ্ধির ত্রুটিতে অনেক জায়গাই আমি বঞ্চিত, এই কথাটি মনে রেখে আজ আপনারা আমার সব কথা গ্রহণ করবেন।

নারী-জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ সম্বন্ধে বলতে হলে আমি বুঝি যে, আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে নারী-জীবন কিছু নূতন উপলব্ধি, নূতন চেতনালাভ করেছে কি না, এবং যদি লাভ করে থাকে, তবে সেই নারীত্বটুকু তার জীবনে কোন রস জাগিয়ে তুলেছে–তারই আলোচনা আরো ব্যাপকভাবে নিলে এ কথাও বলা যায় যে, এই শিক্ষার সাহায্যে আপনাকে জানবার ও বুঝবার জন্য মানব হৃদয়ে যে অনন্ত কামনা তাকে নারী এতটুকুও চরিতার্থ করতে পেরেছে কি না তাই এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

প্রথমেই আমরা দেখতে পাই যে, আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে ভুলত্রুটি যতই থাক না কেন, তবু নারী জীবনে তা মধুরতার স্বাদই এনে দিয়েছে। তার পরিচয়



আমরা নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নবোদ্বুদ্ধ চেতনাতেই পেয়ে থাকি। যদি আমরা অতীত নারী জীবনের সঙ্গে বর্তমান নারী জীবনের তুলনা করে দেখি তবেই মধুরতা এই নূতন আত্মোপলব্ধির চেষ্টার রূপটি পূর্ণ হয়ে আপনি এসে আমাদের চোখে ধরা দেবে। এই আলোচনায় আমরা শুধু এইটুকুই দেখব যে, আধুনিক শিক্ষার প্রচলনের পূর্বে নারী এই সুখ-দুঃখ প্রভৃতি নানারসে ভরা জীবনকে কীভাবে পেয়েছিল এবং এই শিক্ষা আলোকে উদ্ভাসিত নবীন চেতনার সাহায্যেই বা তারা তাদের জীবনকে কীভাবে পাচ্ছে। এখানেই মতান্তরের সৃষ্টি। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদকে দূরে রেখে কিছুক্ষণের জন্য আমরা ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখব।

স্রষ্টা আদমকে সৃষ্টি করলেন, কিন্তু বেহেস্তে আদম নানা সুখে থাকলেও কিসের এক অজানিত অভাবে তিনি ম্রিয়মাণ হয়ে থাকতেন। তখন সেই অভাব পূরণ করা হল যাকে দিয়ে তিনি হলেন আনন্দরূপিনী নারী। এক্ষেত্রে নর-নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসাবে যদি আমি। বলি যে 'নারী ও পুরুষ পরস্পরের Complement একে অন্যের Substitute নয়' তাহলে বোধ হয় আপনারা অস্বীকার করিবেন না।

তারপরই আমাদের যে সবচেয়ে পুরান ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখি যে নরনারী জীবনযাত্রার পথে সৃষ্টির এই মূল উদ্দেশ্যটি ভুলে যায়নি। গৃহের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই নর-নারী পরস্পরের সঙ্গী। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান, চিন্তা ও সৃষ্টির স্রোত পাশাপাশি বয়ে চলেছে। কর্মের ক্ষেত্রেও তাই। প্রয়োজন অনুসারে হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারো দায়িত্ব। বেশি রয়েছে, কিন্তু কোথাও একের জীবন অন্যের জীবনের বিকাশে পরিপন্থী হয়ে উঠছে না। কি এক অপূর্ব চেতনা তাদের জীবনকে রসে, গন্ধে, গানে ভরে দিয়ে পূর্ণ করে সুন্দর করে তুলেছে। কিন্তু এই বিশিষ্ট চেতনার জ্যোতি চিরদিন এমনি উজ্জ্বল রইল না। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে যে শিক্ষা পদ্ধতি তাদের উপলব্ধি এনে দিয়েছিল, সে পদ্ধতি ধীরে ধীরে আবিল হয়ে এল, তাতে আর প্রাণ রইল না–রইল শুধু আচার-বিচারের বাহ্যিক আবরণ। তাই ধীরে ধারে সে চেতনাও ম্লান হতে হতে একেবারেই নিভে গেল। যে শিক্ষার প্রভাবে একটি অপরূপ চেতনা নর-নারীর জীবনকে সুখময় করে তুলেছিল, সে শিক্ষা ও সে চেতনা একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেল।

কিন্তু এই হারিয়ে ফেলার মাঝেও পুরুষ আপনাকে কিছু বাঁচিয়ে রাখল। একান্তভাবেই। আপনাকে হারাল নারী। সে যে মানুষ-জীবনের বৈচিত্র্য থেকে রস গ্রহণ করবার অধিকার যে তারও আছে, এই জ্ঞান তার নিঃশেষেই লোপ পেল, এবং সেই সঙ্গেই তার বেঁচে মরে থাকা শুরু হল। তার জ্ঞান লাভের পথ, প্রতিভার স্ফূর্তির পথ সব নষ্ট হয়ে গেল। কর্তব্যজ্ঞান, আত্মসম্মান জ্ঞান বিলুপ্ত হল। পুরুষের ইচ্ছার কাছে নিজেকে নত করে, আচারের দাসত্বে আপনাকে একান্তভাবে বিকিয়ে দিল। নারীর জীবনে বাকি রইল শুধু ব্যর্থতা আর বেদনার হাহাকার।

আজ সে যুগের অবসান হয়েছে; আজ নবীন ভাবের নব নব বন্যা জগতের মানব হৃদয়ে প্রবাহিত। এই স্রোতের বেগ কোন দেহ একেবারে রুদ্ধ করতে পারেনি। তাই এর আলোড়ন আমাদের এই নিশ্চেষ্ট অসাড় নারী জীবনেও অনুভূত হচ্ছে। এই ভাবের প্রধান বাহন হয়েছে আধুনিক শিক্ষা। এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই আলোড়নের ফলে নারী কি পেয়েছে?

সে কথাটাই আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সকল মতবাদ আলোচনা করে বলতে চাই। আমি বলতে চাই যে, এই শিক্ষা নারীকে পূর্ণতা দিতে না পারলেও, মুক্তি দিতে না পারলেও, পুনর্জন্ম দিয়েছে। সে আপনার প্রাণের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিল, তাকে সেই বেঁচে থাকবার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে। এই তার সার্থকতা। নারী-জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ তাই মধুর হয়েছে। অবশ্য একথা বলবার মত স্পর্ধা আমার নেই যে, আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ লাভে নারী জীবন বর্তমানে সবরকমেই মধুর ও সুষমামণ্ডিত হয়েছে। আমি জানি যে এ শিক্ষার মধ্যে ত্রুটি অনেক আছে, এবং এ শিক্ষার সংস্পর্শে এসে অনেক জীবনই বিপরীত পথে চালিত হয়েছে। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, এ শিক্ষা সর্বজনীনভাবে নারীকে তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেছে। তাকেই এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের রস গ্রহণ করতে শিখিয়েছে, তাই এর আস্বাদ আমাদের কাছে বড় মধুর।

তবে এই শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ বা জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে নারীর ধারণা যে অভ্রান্ত একথা বলতে চাই না, এবং একথাও বলব না যে, তারা আজ যে পথে চলছে তাই ঠিক। আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ নারী জীবনে যে জাগরণের সাড়া এনে দিয়েছে সে জন্যই আমি তাকে বরণীয় বলে, কাম্য বলে আহ্বান করি। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিলে হয়ত আমার বক্তব্য একটু পরিষ্কার হবে।

আত্মনির্ভরশীলতা শিখিয়ে এ শিক্ষা বিধবার ব্যর্থ জীবনে সার্থকতা এনে দিয়েছে। লাঞ্ছনা সহ্য করে, পরের দেওয়া ঘৃণার উচ্ছিষ্টের মায়া ত্যাগ করে আজ সে নিজের উপার্জনে জীবন-যাপনের পথ পেয়েছে। তার কাছে জীবন আজ শুধু শুষ্ক মরুভূমি হয়ে থাকেনি।

জীবনের আদর্শকে বুঝবার একটি চেষ্টা আজ নারীর মধ্যে জেগে উঠেছে। সে প্রয়াস যতই ভুল পথে চালিত হোক না কেন, একথা বোধ হয় সবাই স্বীকার করবেন যে, বুদ্ধিকে বাধা পথে চালিয়ে, জড় করে রেখে, ধ্বংস থেকে রক্ষা করবার চেয়ে, তাকে মুক্তির ভিতর দিয়ে বিধ্বস্ত হতে দেওয়াও শ্রেয়স্কর। জড়তার চেয়ে প্রাণের স্পন্দন সব সময়েই বেশি কাম্য। নারীর জড়তা ঘুচিয়ে আধুনিক শিক্ষা তার মাঝে এ প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে, তাই আজ তার আস্বাদ পাবার জন্য আমাদের এত আগ্রহ। এ যে আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে সংস্কারের বাঁধন ছিন্ন



করে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে শিখিয়েছে। এর সংস্পর্শে এসে, আমরাও যে বেঁচে থাকতে অধিকারী, এ পরম সত্যটির সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাই এর প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, এ শিক্ষা নারীকে অন্তর্মুখী হতে না শিখিয়ে বহির্মুখী করে তুলেছে—নারীর একমাত্র কর্মক্ষেত্র গৃহাভ্যন্তর হতে তাকে বাইরে নিয়ে এসেছে। এতে নারী জীবনের আসল উদ্দেশ্য সফল হতে পারছে না। কিন্তু আমার মনে হয় এ তর্ক এখানে না তুললেও চলে। মানুষকে মনুষ্য পদবাচ্য করতে সাহায্য করাই শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। একথা আমাদের মনে রাখিতে হবে যে, সর্বাঙ্গ সুন্দর কোন রকম সম্পূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি আজ পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি। এবং হয়ত ভবিষ্যতেও পাওয়া সহজ হবে না। কাজেই যে শিক্ষা আংশিক রূপেও সে উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়েছে, সেটা কি নারী কি পুরুষ, সবার জীবনেই সার্থক। তাই যে শিক্ষা নারীকে এত বড় অনুভূতি এনে দিয়েছে তাকে নারী জীবনে নিরর্থক বলে অবহেলা করব কোন সাহসে হয়ত সে শিক্ষা ঠিক পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করে নাই। কিন্তু তবুও সে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে দিয়েছে। প্রাণে যখন সাড়া এসেছে, তখন আজ হোক, দুদিন পরে হোক ঠিক পথ তারা খুঁজে নেবেই। এত বড় দানকে কি অগ্রাহ্য করা যায়?

যত বড় ভুল পথেই অগ্রসর হোক না কেন, নারী ত আজ এই শিক্ষার বলেই জীবনের একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে। আমরা জীবনকে জানব—এই দাবী ত তারা বিশ্ব সম্মুখে আনতে পেরেছে। কিভাবে জানবে, কোন পথে জীবন সম্বন্ধে তাদের সত্য উপলব্ধিটি সহজ হবে তাই নিয়ে মতভেদ করে লাভ কি? কি যে হওয়া উচিত সে বিষয়ে যথার্থ কজন ভাবতে পারে? এক্ষেত্রে নর বা নারীর প্রকৃতি তাকে যে পথে যাত্রা করতে উদ্বুদ্ধ করে, সেই পথেই তাকে যেতে দেওয়া বোধ হয় শ্রেয়। আগেই বলেছি যে নর-নারী সকল ক্ষেত্রেই পরস্পরের Complement। কাজেই তাদের কর্মক্ষেত্র বিশিষ্টরূপে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া যায় না। নারী যদি তার জীবনের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে বহির্মুখিতাকেও প্রয়োজনীয় মনে করে, তাহলে তো তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা চলে না। আর যে শিক্ষা তাকে এই প্রয়োজনটুকুর কথা ভাবতে শিখিয়েছে তাকেও নিরর্থক বলা চলে না। বরং একথা স্বীকার করতেই হয় যে, ভাবতে শিখিয়ে মনুষ্য পদবাচ্য করে তুলেছে বলেই এ শিক্ষার আস্বাদ বর্তমান নারী জীবনে কাম্য হয়েছে।

আজ নারীর মুখে লুপ্ত হাসি ফুটে উঠেছে। বহু বৎসর পর্যন্ত অজ্ঞানতার অতল স্পর্শ গর্ভে থেকে আজ তার উত্থান হয়েছে। বহু বৎসর অন্যায় অত্যাচার স'য়ে নারীর ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে। আজ তাদের লুপ্ত অধিকার ফিরিয়ে নেবার দিন এসেছে।

যে সমাজ নারীকে এতখানি হীন করে রেখেছিল, আজ নব্য শিক্ষার গুণে নারীই আবার জয় গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে বিজয়ী বীরের মতন সেই সমাজের নিকট হতে জয়মাল্য আদায় করে নিচ্ছে। শিক্ষার স্বাদ পেয়ে আজ নারী পুরুষের কাছে নিজের অধিকার দাবী করার সাহস ও শক্তি পেয়েছে।

পূর্বে স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী মাত্র ছিল, এখন সহকর্মিণী। শিক্ষিতা নারী স্বামীর উপর ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে জীবন ভার বাড়িয়ে তোলে না, স্ত্রীই তাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করে তার পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব করে দেয়।

কয়েক শতাব্দী পূর্বে পুরুষ যে নারীকে পদদলিত করে চলে গেলে যন্ত্রণায় তার বুক বিদীর্ণ হলেও তার মুখে ভাষা ফুটত না, আজ সেই মূক নারীর মুখে ভাষা ফুটেছে। নব্য শিক্ষা নারীকে তার নারীত্বের গৌরব, নারীত্বের মর্যাদা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে।

যেখানে স্নেহ নাই, মমতা নাই, সম্মান নাই, আছে কেবল পরাধীনতা, অন্যায় অবিচার, আধুনিক শিক্ষা সেখানে স্বাধীনতা ও পূর্ণ অধিকার জোর করে আদায় করবার সাহস দিয়েছে। নারীকে আজ প্রাণ খুলে বলতে শিখিয়েছে 'স্বাধীনতা চাই, আত্মার মুক্তি চাই'; নারীকে আজ বলতে শিখিয়েছে 'আমরা অজ্ঞতার কালো আবরণে আর ঢাকা থাকব না, আমরা অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী পুরুষের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করব। আমরা জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত হয়ে সেই আলোকে বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত করব, প্রতি গৃহে মঙ্গল দীপ জ্বালিয়ে জগতের মহৎ কল্যাণ সাধন করব। আমরা স্নেহে মমতায়, দয়ায় সেবায় ঘরে ঘরে শান্তিবারি সিঞ্চন করব। আমরা কুসংস্কার পদদলিত করে জগতের মঙ্গলার্থে অগ্রসর হব। নব্য শিক্ষা ভারতের ঘরে ঘরে প্রত্যেক নারীকে জাগাবার ও সমস্বরে স্বাধীনতা চাইবার দীক্ষায় দীক্ষিত করুক এই আমার আন্তরিক কামনা।

আমার বক্তব্য আর বিশেষ কিছু নেই, তবু যেটুকু বলতে চাই, তাকেই পরিষ্কার করে বলতে যেয়ে একই কথা অনেকবার বলে আপনার ধৈর্য ও সময় নষ্ট করেছি। আশা, আকাঙ্খা, দুঃখের বিচিত্রতায় জীবন যে পূর্ণ, এই চেতনা নারী হৃদয়ে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে যে শিক্ষা নারীকে জীবনের পূর্ণ পাত্রের রস আস্বাদনে সাহায্য করেছে, সে শিক্ষাকে আমার জীবনে আমি বড় করে পেয়েছি একথা বলেই আজ আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি।



# পরিশিষ্ট ৩

[নিম্নের লেখাটি 'শিখা' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষে (১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ) ছাপা হয়।]

খোশ আমদেদ

(গান)

কাজী নজরুল ইসলাম

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি।
ও চরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি॥
দখিনের হালকা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতী।
শবেরাত আজ উজালা গো আঙ্গিনায় জ্বলল দীপালি॥
তালিবন ঝুমকি বাজায়; গায় 'মোবারক-বাদ' কোয়েলা।
উলসি উপচে পাল পলাশ অশোক ডালের ঐ ডালি॥
প্রাচীন ঐ বটের ঝুরির দোলনাতে হায় দুলিছে শিশু।
তাঙা ঐ দেউল-চূড়ে উঠল বুঝি নৌ-চাঁদের ফালি।
এল কি অলখ-অকাশ বেয়ে তরুণ হারুণ-আল-রশীদ।
সানাইয়া ভয়রোঁ বাজায় নিদ-মহলায় জাগল শাহ্‌জাদী।
করুনের রূপার পুরে নূপুর-পায়ে আসল রূপ-ওয়ালী॥
খুশির এ বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফরহাদ ও শিরী।
লাল এ লায়লি-লোতে মজনু হর্দম চালায় পেয়ালী॥
বাসি স্কুল কুড়িয়ে মালা না-ই গাঁথিলে, রে ফুল-মালি।
নবীনের আমার পথে উজাড় করে দে ফুল ডালি॥

# পরিশিষ্ট ৪

নিম্নের লেখাটি ‘শিখা’ পত্রিকার চতুর্থ বর্ষে (১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ) ছাপা হয়।

## সাহিত্যে শুচিতা

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ব্রাউনিং তার One word more কবিতাটির একস্থানে বলিয়াছেন যে, চিত্রকর রাফেল, ‘জন্মের মধ্যে কর্ম্ম চৈত্র মাসে রাস’ একবার মাত্র করিয়াছিলেন। অর্থাৎ আজীবন তুলি পেশার পর একটিবার মাত্র একটি সনেট লিখিয়াছিলেন তার প্রিয়ার উদ্দেশে। আমিও আমার পরমপ্রীতিভাজন ওদুদ সাহেবের পাল্লায় পড়িয়া এই প্রথম অনধিকার চর্চায় হাতে খড়ি নিলাম। পুতলো বাজি’র নাচে যে ব্যক্তি সূতা টানে, আসলে সেই নাচে এবং তার সুরেই ‘ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি’ কথা কয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমার ত্রুটি প্রমাদের ‘ওয়ারিশান’ ওদুদ সাহেব।

যে প্রসঙ্গের অবতারণা-অবতারণামাত্র–আজ আপনাদের সম্মুখে করিতে সাহসী হইয়াছি। এ বিষয়ে হাটে ঘাটে সর্বত্রই একটা কাণাঘুষা চলিতেছে। সুতরাং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক কথা কানে আসে এবং কথার পাল্টা জবাব জিহ্বাগ্রে আসিতে চায়, বোঝার সোনালি গাম্ভীর্যের অপেক্ষা বাচালের রূপালী মধুরতা নিকৃষ্ট হইলেও, ‘বিতরিত সময় বিশেষে চিন্তা পঞ্চামৃতামোদং’ অবস্থা বিশেষে মানুষ পঞ্চামৃত ফেলিয়া তেঁতুলের অম্বলের বাটিতে চুমুক দেয়। আমার অদ্যকার আচরণেও হয়ত এইরূপ ধৃষ্টতা লক্ষিত হইবে।

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। মোটের উপর সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ একই কথা, সাহিত্যের প্রাণবস্তু রস, এখন প্রশ্ন এই, রসবস্তুটি কি? যাহার আস্বাদন মধুর তাহাই রসস্বরূপ। প্রাচীন বিশেষজ্ঞরা রসকে নববীজাত্মক বলিয়াছেন। সাহিত্যের এই নয়টির মধ্যে যেটিই বপন করা যাক না কেন, তার ফলে যদি মধুর আস্বাদনটুকু না জাগে, তাহা হইলে সে বীজ নিষ্ফল হইল বলিতে হইবে।

এই মাধুর্যের অনুভূতি লইয়াই মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা। কথায় বলে ‘চাষা কি বুঝবে মদের তার।’ শৈবলিনীর প্রেম লইয়া মরণ পথযাত্রী প্রতাপ ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন, ‘কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী।’ আজ এই অরসিক বৃদ্ধের মুখে রসতত্ত্বের



অবতারণা শুনিয়া হয়ত আমার তরুণ বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ অরুণ আঁখি করিয়া বলিবেন–‘কি বুঝিবে তুমি বৃদ্ধ?’ প্রাচীন কবি মনের দুঃখে চতুরাণকের নিকট আরজি করিয়াছিলেন, ‘অরসিকে রসস্য নিবেদনং, শিরসি মা লিখ মা লিখ। তাহার সেই সময় পাঠান্তর করিয়া ইহাই লিখা উচিত ছিল–‘অরসিষ্যে রহস্য নিবেদনং; শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।’ অরসিকের কাছে রসের নিবেদন অথবা তাহার নিকট হইতে রসতত্ত্বের আবেদন দুইই তুল্যমূল্য, অর্থাৎ বিড়ম্বনা। কিন্তু যে প্রার্থনাই করা যাক না কেন, সব সময় দেবতা প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না, অষ্টকর্ণ হইলেও। সুতরাং দায়ে পড়িয়া অরসিক ব্যক্তির নিকট রসের নিবেদন করিতে হয় এবং অরসিক প্রমুখাৎ রসের অনধিকার চর্চা বরদাস্ত করিতে হয়। “লিখিতমপি ললাটে প্রোজঝিতুং কঃ সমর্মা।” [কপালে যে লিখিত থাকে তাহা খণ্ডিতে কে শক্ত হয়।]

তবে একটা কথা আমার স্বপক্ষে বলিবার আছে, গানের আসরে যখন সংগীতজ্ঞ গুণীর সমাবেশ হয় তখন পাড়ার ‘হরে’, নোরে পরাণের’ দল গিয়াও জোটে, কেবল যে ঝামেলা করিবার জন্য, তাহা বলিলে বেচারীদের উপর বোধ হয় কিঞ্চিৎ অবিচার করা হয়। তাহারা নিশ্চয়ই কিছু আনন্দ পায়। সে আনন্দের মূল্য তাহাদের নিজেদের কাছে সব সময়েই আছে, এবং আজ এই ঘনায়মান বলশেভিক যুগে আপামর সাধারণ আমরা সকলেই যখন শুদ্রতান্ত্রিক শাসনের অনুকূল, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় হোক হইয়া উঠিতেছি, তখন সেই অত্যাধুনিক ডিমক্রেসির দোহাই দিয়া Man in the streets point of view অর্থাৎ পথের লোকের মতামতের প্রতি একটু নেক নজর আকর্ষণ করিয়া আপনাদের ধৈর্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

সুন্দর আমরা অনেক জিনিসকেই বলি এবং সৌন্দর্য্যের তারতম্যের আর অবধি নাই। তবু এই বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে কতকগুলির কপালে যেন একটা চিরন্তন সৌন্দর্যের ফোটা আছে। কুলেশীলে ইহারা সুন্দর কুলের ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে বলে ‘জন্মনা জারতে শূদ্রঃ ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণ। আমি এই বিশিষ্ট অর্থে ব্রাহ্মণ শব্দটি এইখানে ব্যবহার করিতেছি। চিরসুন্দরই রূপব্রহ্ম। যে সৌন্দর্যে নিত্যমাধুরীর একটা আভাস বা ইঙ্গিতমাত্র আছে, তাহার গলায় সাহিত্যোক্ত যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। চির সুন্দর, নিত্যমাধুরী, ব্রহ্ম প্রভৃতি বাক্যগুলি প্রয়োগ করিলাম বলিতে চেষ্টা করিব।

আমরা সকলেই জীবনের অভিজ্ঞতায় জানি, কতকগুলি ক্ষুৎপিপাসা আছে যাহা অন্ন পানের মতো পূর্ণ তৃপ্তিতেই মিটিয়া যায়। তাহাদের দেনা থাকে না। জীবনে ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকিলেও, কাব্যে ও সাহিত্যে ইহাদের স্থান খুঁজিয়া পাই না। আমাদের সকলের ভিতরই সৌন্দর্যবোধ বলিয়া যে জিনিসটি আছে তাহা

আমাদের প্রত্যেকের অন্তঃপ্রকৃতির অনুপাতে। এই লইয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা ও বিরোধ থাকিলেও একটি বিষয়ে বোধ করি সাদৃশ্য আছে। যাহা সুন্দর তাহার মুখে এমন কিছু আছে যাহার জোরে সে অবলীলাক্রমে প্রাণের শীর্ষস্থানটি অধিকার করিয়া বসে, আর সবাইকে পশ্চাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া, জনতার ভিতর একখানি সুন্দর মুখ অন্য মুখগুলিকে নিমেষে নিভাইয়া দেয়। যে মুখখানি আমার ভাল লাগিল সেটা আপনার ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অন্তরের উচ্চাসনখানি সেই প্রিয়দর্শনের জন্য পাতিয়া দেই। এই যে preferential treatment বা তুলনামূলক পক্ষপাতিত্ব। ইহা সৌন্দর্যে রাজস্বের মতই জোর করিয়া আদায় করে এবং সেজন্য মনে Civil disobedience জাগায় না। বরং তাহাকে সমাদর করিয়া প্রণতি জানাইয়া কৃতার্থ হই।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনুভূতির পার্থক্য থাকিলেও আমরা সকলেই অনুভব করি– 'A thing of beauty is a joy for ever' যা সুন্দর তা চির নবীন, চির মধুর। Space-এ বা দেশে সিংহাসন ও time-এ বা কালে চিরন্তনত্ব লাভ করিবার শক্তি সৌন্দর্যের একটি বিশেষ লক্ষণ, সাহিত্য-রচনায় এই দুটি লক্ষণ আমরা খুঁজি এবং ইহাদের আমেজ যদি কোনো লেখায় জাগে তবে তাহাকে সৎ সাহিত্য বলিতে দ্বিধা হয় না। সৌন্দর্যের এই স্বাভাবিক আভিজাত্য বা বিশিষ্টতা আছে। বুঝি এই সৌন্দর্যবোধ সেই অমোঘ অন্ধানুভূতি, যাহা সৃষ্টি শতদলের নব নব দল যুগ-যুগান্তর ধরিয়া উদ্ভিন্ন করিয়া চলিতেছে। বাঁদরকে মানুষ করতেছে, মানুষকে superman বা অতিমানবের পদে উন্নীত করিবার জন্য অতন্দ্রিত চেষ্টা করতেছে।

তৃতীয়তঃ, আর একটি কথা বলিতে চাই। ধরুন বেলফুল। কতটুকু পরিসর তার আকাশে, কতটুকু আয়ু তার কালে? কিন্তু বাস্তবিক বেলফুলটির প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কহে কি কেবল দেশ-কালেই বদ্ধ? যদি তার সৌরভটি চোখে দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে হয়ত দেখিতাম যে, ক্ষুদ্র পাপড়ি সমষ্টির কেন্দ্রবিন্দুটি আশ্রয় করিয়া একটা সৌরভের জ্যোতির্ম্মণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া আছে। যতদূর সে সুগন্ধ ছড়াইয়া যায়, ততদূর পর্যন্ত তাহার। পুষ্প দেহের পরিব্যাপ্তি। কিন্তু এখানেও শেষ কথা বলা হইল না। সেই সুগন্ধের সঙ্গে মনে যে আনন্দের অনুভূতি জাগে এবং সেই আনন্দ চেতনার সঙ্গে পূর্বানুভূতি সুখ স্মৃতির ঝংকার যদি বাজিয়া উঠে, তাহা হইলে দেখুন কি দৃশ্যপটই চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যখন বলিলেন, "ফুল দেখে মনে পড়ে কারে ভালবাসি" তখন সে কবির চোখে ফুলের যে বিরাট বিশ্বরূপ ফুটিয়া উঠে সে ছবি তুলিতে আঁকিতে হইলে চিত্রপটখানি দিকচক্রবাল পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া যায়, সুদূর অতীতকে আপনার চিত্রবন্ধনীর মধ্যে টানিয়া আনে।



ধ্বনি-বিজ্ঞানে বলে যে, প্রত্যেক স্বরটির একটি মৌলিক সুর বা Fundamental note আছে। বেহালার 'সা' বা হারমোনিয়ামের 'সা' মূলত একই সুর। কান বলে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, যাহার দ্বারা কোন যন্ত্র হইতে সুরটি বাহির হইতেছে তাহা ধরিতে কিছুমাত্র মুস্কিল হয় না। কি সে বিশেষত্ব? বিজ্ঞান বলে যে, মূল সুরটিকে ঘেরিয়া অনেকগুলি Harmonics বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষীণ ধ্বনির অনুরণন আছে। তাহারা মূল সুরটিকে বজায় রাখিয়া তাহাকে বিশেষ বিশেষ রঙ্গে যেন অনুরঞ্জিত করে কালো মেয়ের মুখে সায়াহ্নের সোনার আলো যখন পড়ে তখন সে মুখে যেমন ত্রিদিব কান্তি ফুটিয়া উঠে। সাহিত্য সেই অনুরঞ্জনা যাহা বস্তুতান্ত্রিকের স্থূল রূপের উপর একটা অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় আভা মাখাইয়া দেয়। তখন অসুন্দরও সুন্দর হয়, তখন বেহালার ছড়ের মধুনিষ্যন্দিনী সুরধারার সঙ্গে হারমোনিয়ামের কাংস্যনিনাদিনী মধুস্রবার প্রভেদ বুঝিতে আর বেগ পাইতে হয় না। কাগজের ফুলে গোলাপী আতর মাখাইয়া দর্শকের চক্ষু নাসিকায় ক্ষণিকের বিভ্রম উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু তার পাশে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ যদি রাখেন তবে দেখিবেন যে ভ্রমর উড়িয়া গিয়া সেই সাচ্চা গোলাপটির উপরই বসিবে, তা পার্বত্ববর্তিনীর যতই রঙ্গের বাহার ও গন্ধের তীব্রতা থাকুক না কেন!

Realism in Art নিয়ে যে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের আমদানি আজকাল বাজারে দেখা দিয়াছে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলেও একেবারে চোখাচোখি হয় নাই তাহা নয়। তাহাদের দেখিয়া আমার যাহা মনে হইয়াছে তাহা বলিব? আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া যখন আমার হ্যাট কোর্ট পরিহিত ইঙ্গ বঙ্গ মূর্তিটি দেখি তখন যে হাস্যকর চিত্রটি চোখে জাগে, এই সব রচনায় তাহার আদল পাই। এই সকল লেখায় যে Continental Literature-এর দোকান হইতে হ্যাট, কোট, টাই-এর আমদানি সব সময় হয় তা নয়, কিন্তু যে নগ্নতা পশ্চিমী সাহিত্যে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে সেই বে আব্রু রচনার একটা সচেষ্ট নির্লজ্জ অনুকরণ আছে। একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, বেশভূষা সম্বন্ধে যে একটা কলাবিধি Aesthetic convention আছে। তাহা দেশে দেশে কালে কালে বিভিন্ন। কিন্তু মনের উপর প্রতিক্রিয়া হিসাবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নিকট আত্মীয়তা আছে। নারীর নগ্ন পদ আমাদের দৃষ্টিকটু নয়, কিন্তু পাশ্চাত্য রুচির চক্ষুশূল। সেইরূপ যে সব দেশে ও সমাজে স্ত্রী পুরুষের মুক্ত গতিবিধি ও অবাধ মিলনের আনুকূল্য আছে, তাহাদের সে স্বৈরগতি ও অকুণ্ঠিত আচার-ব্যবহারে রুচি ও নীতিকে আঘাত দেয় না এবং সকল স্থলে বিতৃষ্ণা উৎপাদন করে না। দেশ-ভেদে ও পাত্র-পাত্রী ভেদে সেইরূপ আচরণ সঞ্চরণ ন্যক্কারজনক হইতে পারে, নীতিবাগীশের তরফ হইতে এ কথা বলিতেছি না? রূপদক্ষের সমীভূত দৃষ্টিতেও সে দৃশ্য দৃষ্টিকটু ও শ্রুতিতে বেসুরা লাগিতে

পারে, সেই কথাই বলিতে চাই। সাহিত্যে কতটা পরিমাণে আবরণ খসান যাইতে পারে তাহার কোন ধরা বাধা আইন কানুন আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে এ কথা ঠিক যে নিরাবরণ প্রকটতা, যাহা এক স্থলে কোন গ্লানি উৎপাদন করে না, অন্যত্র তাহা বীভৎস হইয়া দাঁড়ায় কেন, বলা শক্ত। তবে মনে হয়, প্রকাশ বা অপ্রকাশ আসল কথা নয়, আসল কথা যে আলোকে যবনিকার উত্থান-পতন হইতেছে সেই আলোকের এমন একটি অনির্বচনীয় শক্তি আছে যাহা অসুন্দরকে সুন্দর এবং সুন্দরকে কুৎসিৎ করিতে পারে, সুরুচি কুরুচির মুণ্ডু বদল করিয়া দেয়। সেইরূপ রূপদক্ষ প্রাণের প্রদীপে যে শিখাটি জ্বালিয়া লন সেই আলোকে কোন ছবিটি কতক্ষণ কীভাবে ধরিবেন তাহাতে বিরক্তি বিতৃষ্ণা বা কলুষের সৃষ্টি করিবে না, তাহা তাহার অভিজ্ঞ দৃষ্টি ও নিপুণ লেখনীর উপর নির্ভর করে। বাইসাইকেলের দুচাকার উপর ভার কেন্দ্রটি ঠিক রাখিয়া, আছাড় না খাইয়া চলিতে পারার প্রধান সহায় গতি। যে লেখকের রচনায় গণ্ডীর ভিতর, বাস্তবের ভিতর, একটা কল্পলোকাভিসারিণী প্রগতি আছে, তিনিই কর্দমাক্ত পথে অচল প্রতিষ্ঠা লাভ না করিয়া সৌন্দর্য্যের অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, আর আমাদের মত অপটু লোকেরা তাহাদের পৃষ্ঠে ভর রাখিয়া চক্রবাহনে বিনা খরচায়, বিনা বিপত্তিতে সাদা কাপড়ে, বাণীমন্দিরের ব্যঞ্জনা, অপূর্ণতার ভিতর পূর্ণতাভিমুখী ইঙ্গিত, জড়ের ভিতর অতীন্দ্রিয়ের ঝংকার যে লেখার ফাঁকে ফাঁকে আছে, সেই রচনাই সাহিত্য পদ বাচ্য।

আমরা দেহী জীব হইলেও, এই রক্তমাংসের বুনিয়াদের উপর আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অনুভূতি দিয়া একটি ইমারত গাথিয়া তুলিতেছি। দেহলোকের উপর দোহাই আমাদের স্বরচিত আধ্যাত্মলোক। এই লোকেই বাণীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের পাষাণ ভিত্তির ফাঁকে যাহারা গর্ত করিয়া, কুরিয়া কুরিয়া মাটি বাহির করে, তাহাদের এই মূষিকবৃত্তিকেই সাহিত্যে কুরুচি বলিতেছি। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, অবিচার-অত্যাচার লইয়া আমাদের সামাজিক জীবন। ইহাদের সকলেরই সৎসাহিত্যে স্থান আছে। কিন্তু সাহিত্যিককে পঙ্ক হইতে পঙ্কজ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, পঙ্কজ হইতে পঙ্কোদ্‌গীরণ করা তাহার ধর্ম্ম নয়।

কাব্যের ও কথাসাহিত্যের একটা প্রধান মৌলিক উপাদান নর-নারীর প্রেম। স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ প্রাণসৃষ্টির মূলে। মানবসভ্যতা বহু যুগব্যাপী সাধনায় ইহাকে চাপে পিষিয়া ছাঁচে ঢালিয়া দাম্পত্য প্রেমের আকার দান করিয়াছে। মানবের এষণা ও চেষ্টায় যাহার সৃষ্টি, তাহা এক হিসাবে কৃত্রিম, সহজিয়া নয়। সামাজিক বিধিনিষেধের ভিতর দিয়া, দেশে দেশে, কালে কালে স্ত্রী-পুরুষের যে আত্মীয়তার ধারা পত্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে তাহা প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে মোটের উপর এক পথ দিয়া চলে নাই। পূর্ব এবং পশ্চিম দুই-ই নর-নারীকে



শৃঙ্খলিত করিয়াছে বটে কিন্তু এই গ্রন্থিবন্ধনের প্রণালীর ভিতর মূলত পার্থক্য আছে। পশ্চিমে পাত্র-পাত্রীর পরস্পর মনোনয়নের পথ আমাদের দেশের তুলনায় অনেকটা অবারিত। আমাদের দেশে সহজিয়া ব্যবস্থা যে একেবারে ছিল না তাহা নয়, তবে আমাদের দেশে সাধারণত প্রাকবৈবাহিক পূর্বরাগের ব্যবস্থা ছিল না, পশ্চিমে আছে, বর্তমানে যুগে পশ্চিমের হাওয়া আমাদের দেশের উপর উত্তরোত্তর প্রবলভাবে বহিতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আটচালায় ভাঙ্গনের মড়মড়ানি স্থানে স্থানে জাগিয়া উঠিতেছে। সেই ঝোড়ো হাওয়া কথাসাহিত্যে লাগিয়াছে। সাহিত্য, সমাজের ভড়ে পালের হাওয়া, সুতরাং উনপঞ্চাশ বায়ুর ফুৎকার এই ভরা পালে লাগিবেই। কিন্তু নোঙর গাড়িয়া, হালে, দাড়ে মাঝি দাড়ি না বসাইয়া যদি কেবল ঝোড়ো হাওয়ায় পাল মেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তীরে বসিয়াই নৌকাডুবির সুব্যবস্থাই করা হয়।

আকাশের মুক্ত বাতাসের মতই সাহিত্যের মুক্ত গতি। তাহার সদর অন্দর নাই। অসূর্য্যম্পশ্যার কাছেও সে অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে। সামাজিক রীতি-নীতির মর্যাদা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া যদি তরুণ কথাসাহিত্য কঞ্চুরীর মত অন্তঃপুর চরোবৃদ্ধের নিরংকুশ গতিবিধি লাভ করে তাহা হইলে ‘যথারণ্য, তথাগৃহ’; এর অবস্থায় সমাজকে পৌঁছিতে বিশেষ গৌণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ, যৌবনবিবাহ, এমনকি স্থল বিশেষে ‘ডাইভোরসে’রও প্রয়োজনীয়তা না হয় মানিয়া লইলাম, কিন্তু এ সকল সমাজ-সংস্কারের ব্যবস্থা যদি এক দল গুণ্ডা ও লম্পটের হাতে দেওয়া যায়, যাহারা গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া Free love বা অবাধ প্রেমের সুসমাচার প্রচার করিবে, এবং পৌরহিত্যের কর্তব্যভার বহন করিবে, তাহা হইলে গ্রামবাসী রমণীদের পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সৎকার করিবেন তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, উক্ত মহোদয়গণ সশরীরে প্রবেশাধিকার আপাতত না পাইলেও সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকারের জন্য সাহিত্যিক পাসপোর্ট বা ছাড়পত্র সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন। এরূপ লেখক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব সম্প্রতি সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। তবে ইহাদের তাড়াইবার ভার বোধ করি পুরুষদের না লইলেও চলে। যাহাদের কল্যাণ হস্তের সম্মার্জনী এখনো বাংলার ঘরে ঘরে গৃহের আবর্জনা কাটাইয়া আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে, তাহারাই ইহাদের সদগতি করিবেন। নীতি জিনিসটা কেবল বিধিনিষেধ নয়–উহা Instinct of self preservation–আত্মরক্ষার অমোঘ অস্ত্র। প্রাণের ধর্ম প্রাণরক্ষা। ভাবী দেশমাতৃহারা দশভূজা হইয়া দশসম্মার্জনী-ধারিণী হইবেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সব সমাজেই গলদ আছে আমরাও সৃষ্টিছাড়া সাধু নাই।

আমাদের সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে এবং সেই জীর্ণ-সংস্কারের প্রধান অস্ত্র সাহিত্য। সে অস্ত্র যেন 'ভালুকের হাতে খোন্তা' না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাহিত্যে শুচিতা পাপীকে বা। পতিতাকে ঘৃণা করিয়া রক্ষিত হয় না, রক্ষিত হয় পাপকে ঘৃণা করিয়া জঘন্যতাকে ঘৃণা করিয়া।

মনে পড়ে, বিলাতে কসাই-এর দোকানে বড়দিনের উৎসব-সজ্জা দেখিয়াছিলাম। শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর একটি ছালছাড়ানো শূকরের মুণ্ড তাহার কানে ও নাকে ফুল গুজিয়া গলায় মালা দিয়া তাহাকে সজ্জায় সাজান হইয়াছে। বর্তমান সাহিত্যে এইরূপ। রক্তমাংসের পূজার আয়োজন আমার চক্ষে পড়িয়াছে। হোরতর মাংসাশীর পক্ষেও এরূপ দৃশ্যে রসভঙ্গ হয়। মাংসের পূজা ফুলে নয়, পেঁয়াজ, রসুন, গরম মসলায়। আর্টের এমন বীভৎস দুর্গতিও মাঝে মাঝে দেখিতে হয়!

উপসংহারে আর একটিমাত্র কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব। উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিকদের ভিতরে এমন সব লেখক দেখা দিয়াছেন–যাহাদের ললাটে নবরবির অনাবিল দীপ্তিচ্ছটা আছে। তাহারা সকলেরই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া যখন নবসৃষ্টির অভ্যুদয় হয় তখন তাহার বিদ্রোহ, প্রমত্ততা, আবেগান্ধতা উদ্দাম হইয়া ওঠে। বিজয়ী সেনাপতি যখন প্রাচীন দুর্গের পর দুর্গ ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া অগ্রসর হন তখন সে জয়যাত্রার ধূলির অন্তরালে সামরিক অরাজকতা বিশৃঙ্খলার সুবিধা লইয়া দুর্বৃত্তের দল নারীনিগ্রহ পরস্বাপহরণ বৈরনির্যাতন ইত্যাদি পাশবিক অত্যাচারের মরশুম পায় এবং 'নলিচার আড়ালে গুড়ুক ফঁকিয়া লয়। ধর্ম্মযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে নৃশংস বর্বরতার বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা আসিয়া পড়ে। বাংলা সাহিত্যে নবযুগ আনিতে যাহারা বদ্ধপরিকর। তাহাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক যে, তাহাদের প্রচেষ্টার আশ্রয়ে এই সাহিত্যকে। দুর্বৃত্তেরা প্রশ্রয় না পায়। উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া যিনি ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ইতিহাস তাহার সাত খুন মাপ করিতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র পাশবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই চরমরূপ ধারণ যাহাতে না করিতে পারে সেজন্য প্রবর্তকবর্গের আত্মসংযমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কারণ পশুরাজ আমাদের সমস্তের ভিতরই বিদ্যমান। দশভূজার বাহনও কেশরী। কিন্তু সোয়ার হুঁশিয়ার না হইলে বিদ্রোহী বাহনের নখদন্তে উচ্চাদর্শের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনায়াসেই নিষ্পন্ন হইতে পারে সত্য বটে, স্রষ্টা প্রাণের আনন্দেই সৃজন করেন, কিন্তু দ্রষ্টাকে একেবারে বাদ দিয়া নয়। কারণ মানুষ আপনার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ করে অপরের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে, বিশ্বের সহিত নিবিড়তম যোগের দ্বারা। সুতরাং সত্যমকে শিবম্ হইতে হইবে। এবং প্রীতির বন্ধন, যিনি সুন্দম্ তিনিই কেবল বাধিতে পারেন। যাহা কদর্য্য অসুন্দর, তাহা



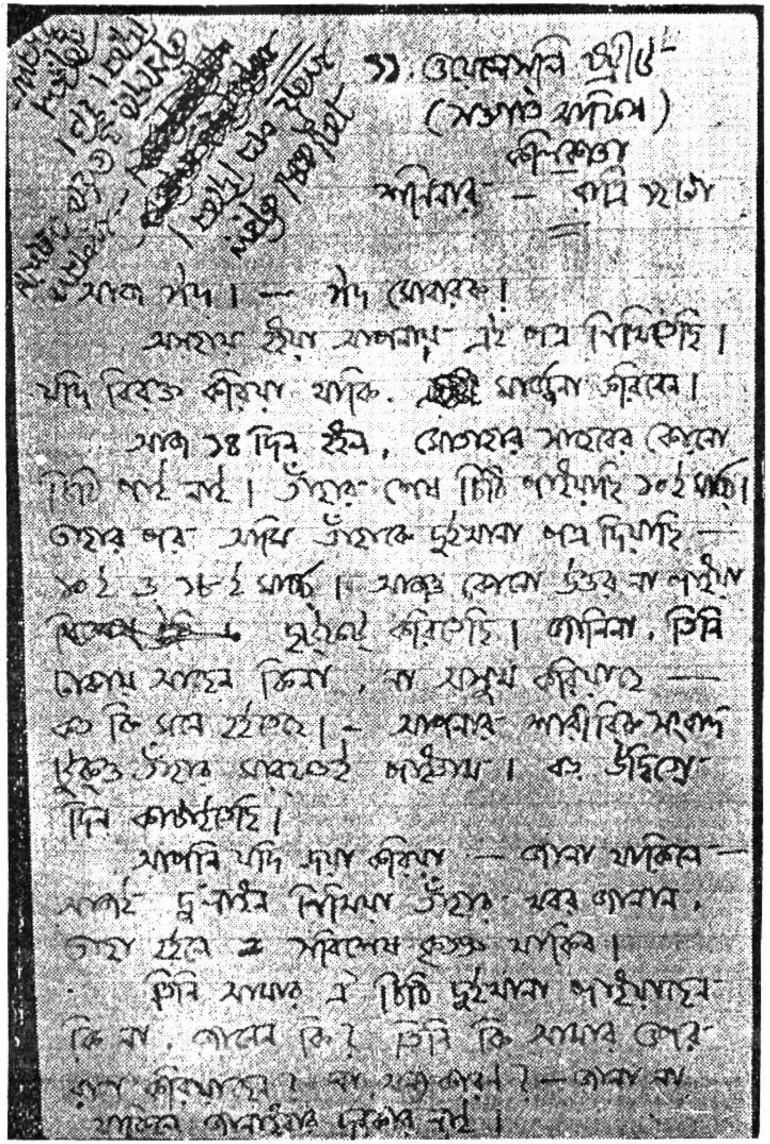
প্রীতিকে, আনন্দকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। মেঘমালার মতই কাব্য সৃষ্টির ঋজু বংকিম রেখাবৃত সুনির্দিষ্ট আকার আয়তন নাই। কিন্তু বায়ুবিজ্ঞানের মত মেঘেরও শ্রেণীবিভাগ আছে, কালাকাল আছে, যাহার সহিত ধরণীর শুভাশুভ নিত্যযুক্ত। মেঘ-রাশি কখনো বা ঊষরক্ষেত্রের, শ্যামলিমার উর্বরতার রসধারা কখনো বা ঝড়ঝঞ্ঝা অশনিসংবলিত মহাপ্রলয়ের বারুদখানা। অন্ধ প্রকৃতির সৃষ্টিলীলায় প্রজননী রক্ষণী ও বিধ্বংসিনী শক্তির বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত। কিন্তু এই চিরবৈচিত্র্য ও বিরুদ্ধতার ভিতর মানবকল্পনা সত্যম শিবম সুন্দরমের একটি মূর্ত্তির ছায়া দেখিতে পাইয়াছে। কারণ এই যে ঐক্যের একটি অখণ্ড তাৎপর্য্য তাহার প্রাণে আছে। মানুষ স্বয়ং যেখানে স্রষ্টা, সাহিত্যের সেই সৃজন ক্ষেত্রে এই harmony বা সুগভীর সমন্বয়ের ঐক্যতানটি তাহার প্রাণে সজাগ রাখিতে হইবে। নতুবা তাহার সার্থকতা লাভ করিবে না। পূর্বেই বলিয়াছি এই দেহই অধ্যাত্মলোকের বুনিয়াদ। এই ইন্দ্রিয়ের তারেই অতীন্দ্রিয় সুর বাজে, বে-তার বীণায় নয়। যে সভ্য নর সমাজের স্রষ্টা, সাহিত্য তাহারই অধ্যাত্ম সৃষ্টি। আজ যাহা চিন্তনে ও ধ্যানে, কাল তাহাই উদ্ভিন্ন হইবে জীবনে, গৃহ পরিবারে, সমাজে, সাহিত্যিক ঋষির ন্যায় মন্ত্রদ্রষ্টাতিনি আজ যাহা চোখে দেখিতেছেন অনাগত ভবিষ্যতে তাহাকেই আমরা সমাজে, রাষ্ট্রে মূর্ত্তিমান দেখিব। সেইজন্য সাহিত্যিককে ঋষির সম্মান দিতে চাই। 'জবাকুসুমশংকা কাশ্যপেয়ং মহদ্যুতিং' তরুণ সাহিত্যিকদের আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিতে চাই। তাই বলি তাঁহারা নমস্য হউন, 'শুদ্ধম-পাপবিদ্ধ' হউন, তাহাদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

# পরিশিষ্ট ৫

ফজিলাতুন্নেসাকে লিখিত পত্র ও

সমকালে কাজী নজরুলের আলোকচিত্র





১১, ওয়েলেসলি স্ট্রীট
(সওগাত অফিস)
কলিকাতা
শনিবার — রাত্রি ১২টা

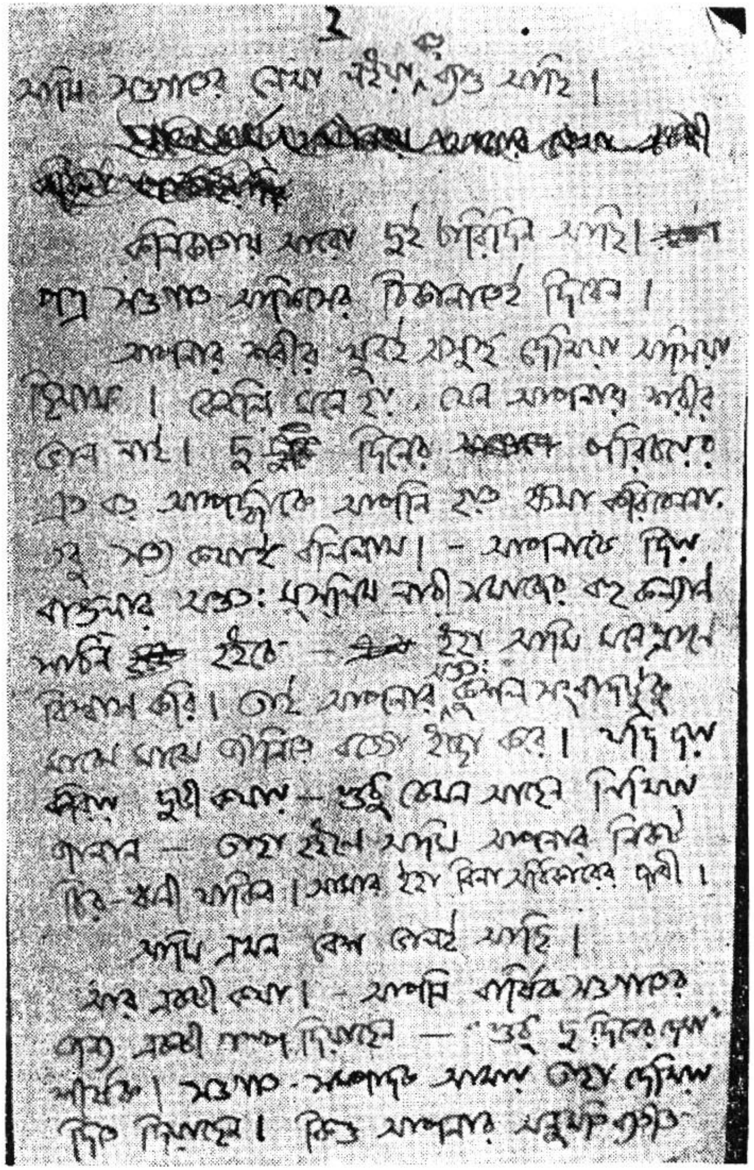
আজ ঈদ। — ঈদ মোবারক!

অসহায় হইয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। যদি বিরক্ত করিয়া থাকি, মার্জনা করিবেন।

আজ ১৪ দিন হইল, মোতাহার সাহেবের কোনো চিঠি পাই নাই। তাঁহার শেষ চিঠি পাইয়াছি ১০ই মার্চ। তাহার পর আমি তাঁহাকে দুইখানা পত্র দিয়াছি — ১০ই ও ১৮ই মার্চ। আজও কোনো উত্তর না পাইয়া দুশ্চিন্তাই করিতেছি। জানিনা, তিনি কোথায় আছেন কিনা, বা অসুখ করিয়াছে — বা কি হইয়াছে। — আপনার শারীরিক সংবাদও তাঁহার মারফতেই পাইতাম। বড় উদ্বেগে দিন কাটাইতেছি।

আপনি যদি দয়া করিয়া — জানা থাকিলে — আমায় দু'লাইন লিখিয়া তাঁহার খবর জানান, তাহা হইলে অশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব।

তিনি আমার এ চিঠি দুইখানা পাইয়াছেন কি না, জানেন কি? তিনি কি আমার উপর রাগ করিয়াছেন? না, [illegible]? — জানা না থাকিলে জানাইবার দরকার নাই।



২

আমি সন্তোষের লেখা লইয়া ব্যস্ত আছি।

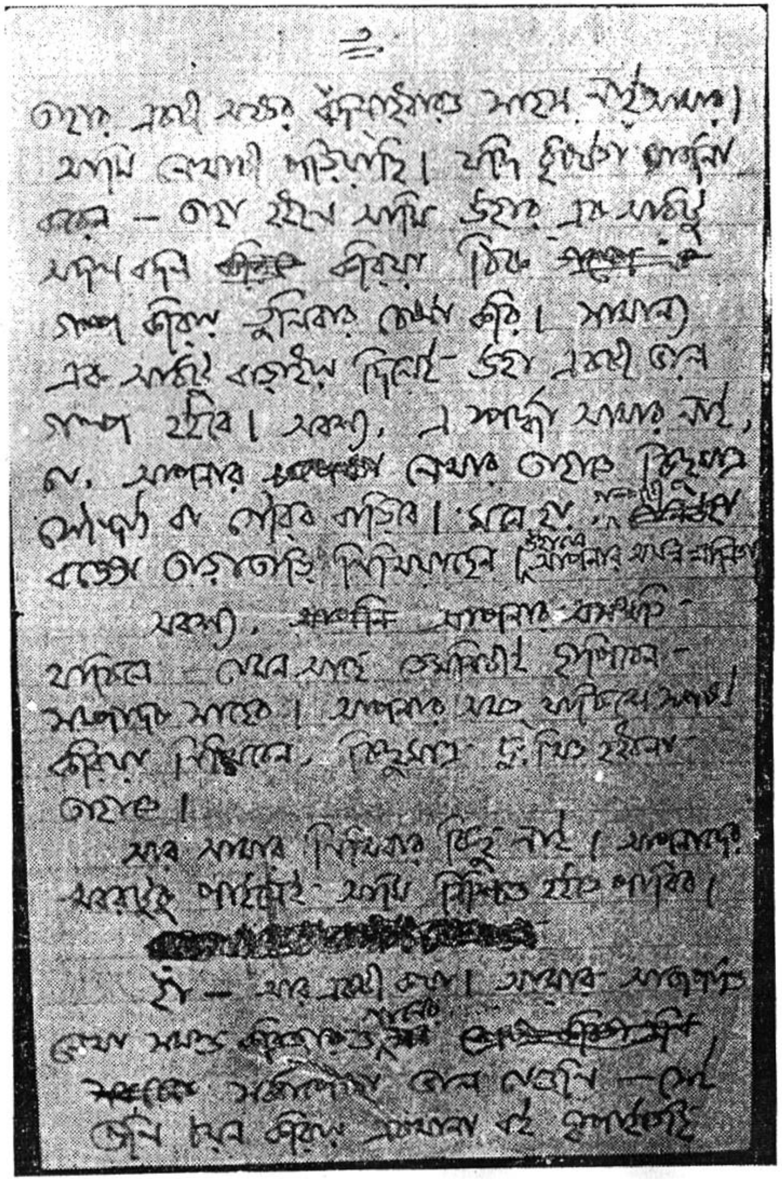
কলিকাতায় আরো দুই চারিদিন আছি। পত্র সওগাত অফিসের ঠিকানাতেই দিবেন।

আপনার শরীর খুবই খারাপ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। কেবলি মনে হয়, যেন আপনার শরীর ভাল নাই। দু একটি দিনের [illegible] পরিচয়ের এত বড় আত্মীয়তাকে আপনি হয়ত ক্ষমা করিবেন, শুধু সত্য কথাই বলিলাম। — আপনাকে দিয়া বাঙলার অন্তত: মুসলিম নারী সমাজের বহু কল্যাণ সাধিত হইবে — ইহা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। তাই আপনার জীবন সংবাদটুকু মাঝে মাঝে পাইতে বড়ই ইচ্ছা করে। যদি দয়া করিয়া দুটি কথা — শুধু কেমন আছেন লিখিয়া জানান — তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চির-ঋণী থাকিব। আমার ইহা বিনা অধিকারের দাবী।

আমি এখন বেশ ভালই আছি।

আর একটী কথা। — আপনি নার্গিস সওগাতের জন্য একটী গল্প দিয়াছিলেন — "শুধু দু দিনের দেখা" নার্গিস। সওগাত-সম্পাদক আমায় তাহা দেখিয়া দিতে দিয়াছেন। কিন্তু আপনার অনুমতি ব্যতীত





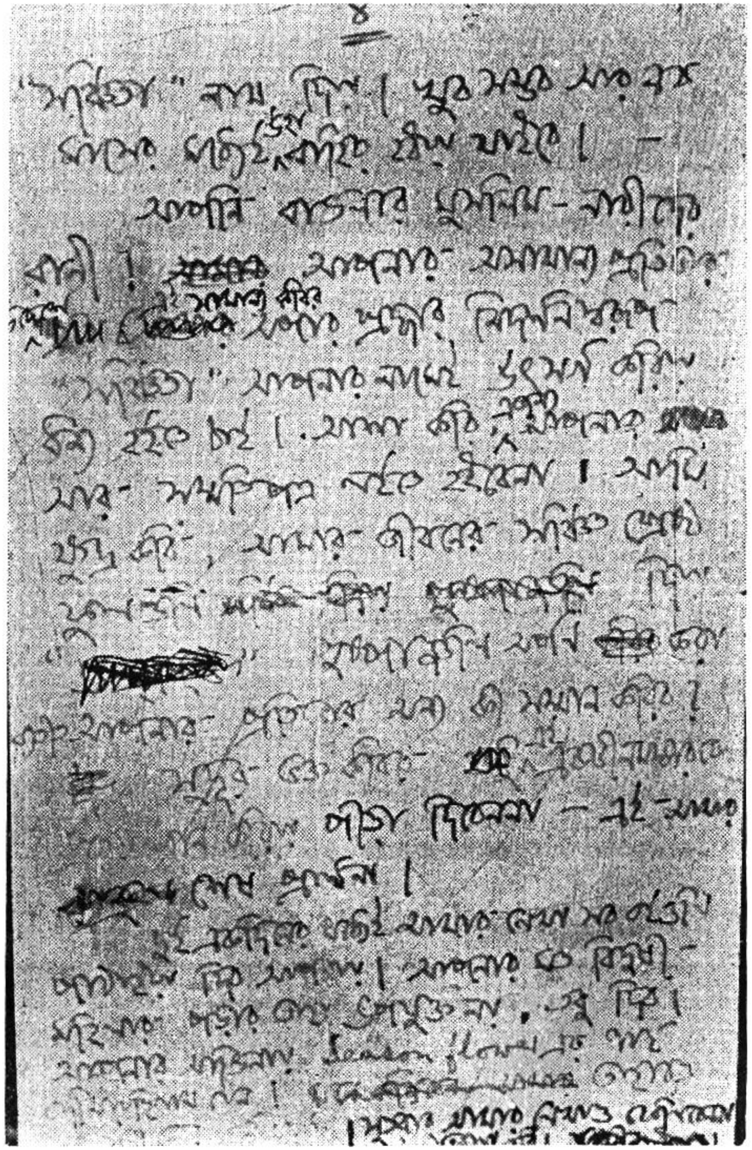
৩

তাহার একটী অক্ষর বদলাইবারও সাহস নাই আমার। আমি লেখাটী পাইয়াছি। যদি ইহাকে অনুমতি করেন — তাহা হইলে আমি উহার এক আধটু অদল বদল করিয়া দিতে [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] করি। আমার এক আধটু বদলাইয়া দিলেই উহা একটী ভাল গল্প হইবে। অবশ্য, এ সাধ্য আমার নাই, যে, আপনার লেখার তাহাতে কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য বা গৌরব বাড়িবে। মনে হয়, [illegible] বড্ডো তাড়াতাড়ি লিখিয়াছেন আপনার খাতিরে।

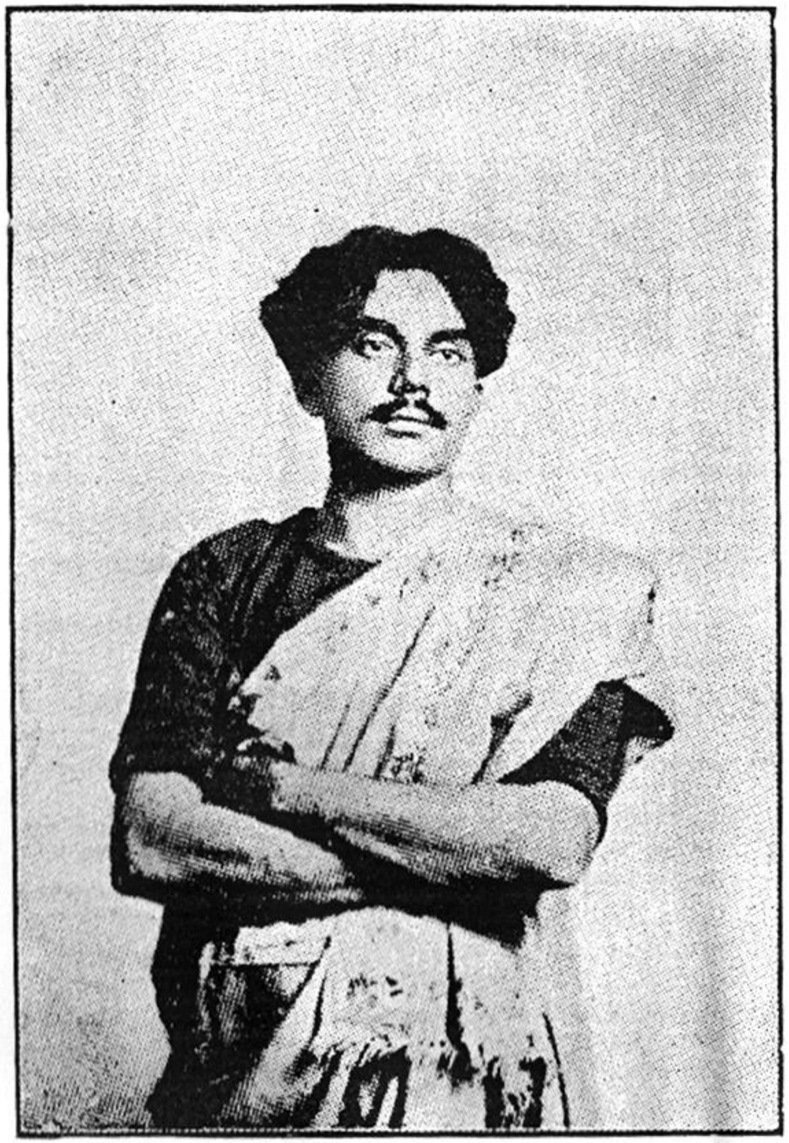
অবশ্য, আপনার অনুমতি [illegible] থাকিলে — তবেই আমি [illegible] সওগাত-সম্পাদক আছে। আপনার মত [illegible] করিয়া লিখিবেন, কিছুমাত্র দুঃখিত হইব না তাহাতে।

আর আমার লিখিবার কিছু নাই। আপনাদের খবরটুকু পাইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।

হাঁ — আর একটী কথা। আমাকে [illegible] যেমন [illegible] সংকোচ [illegible] তেমনি [illegible]







কাজী নজরুল ইস্‌লাম

১৯২৮